আলোর ঠিকানা

[একটি নির্বাচিত সংকলন]

সম্পাদনা :

অসিতাভ দাশ

প্রভা প্রকাশনী

মাঠপাড়া, সোনাচন্দনপুকুর, বারাকপুর,

উত্তর চব্বিশ পরগণা

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩

প্রাপ্তিস্থান :
প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

মুদ্রণ :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

মা ও

আমার জীবনসঙ্গিনী

যুথিকাকে—

যার অনুপ্রেরণা আমার

চলার পথে সঙ্গী

॥ নিবেদন ॥

এই সংকলনটির নাম "আলোর ঠিকানা" হল কেন পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে? প্রতিটি পাঠকের কাছে একটি উত্তম গ্রন্থ যেন আলোর মতশাশ্বত, সহজ ও ভোরের আকাশের মত জীবনের নূতন আশ্বাস বাণী বহন করে আনে। তাই মানুষকে নূতন করে যে বাঁচার আশ্বাস দেয়, হতাশা কাটিয়ে নূতন জীবনদানে যে সক্ষম করে তোলে, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও সংগ্রামের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয় যে, সে হচ্ছে গ্রন্থ, আর তার ঠিকানা হচ্ছে গ্রন্থাগার।

আমাদের হতাশাচ্ছন্ন, উদ্দেশ্যহীন ও দুঃখময় জীবনে একমাত্র বন্ধু গ্রন্থাগার। যাকে অবলম্বন করে নূতন করে গড়ে তুলতে পারি নূতন সমাজ, নূতন পরিবেশ ও নূতন দেশ, আর লাভ করি অনাবিল আনন্দ। এই গ্রন্থের তাই নামকরণ করা হয়েছে "আলোর ঠিকানা"।

ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ফরাসী দেশে অত্যাচারিত মানুষ বিপ্লবের পূর্বে হাতে তুলে নিয়েছিল গ্রন্থ, যা থেকে তাঁরা ফরাসী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কার্ল মার্কস ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (বর্তমান নাম দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী) বসে সারাজীবন অধ্যয়ন করেছিলেন ও রচনা করেছিলেন কালজয়ী যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহ। যে গ্রন্থসমূহ ভেঙ্গেছিল শ্রমিকের শৃঙ্খল আর নূতন মানব সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল সর্বহারা ও সাধারণ মানুষেরা। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চীনের সেই বিখ্যাত সংগ্রাম "Books on the back"-এর কথা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনেও খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল গ্রন্থাগারগুলির। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। দেশপ্রেমিক জনগণের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে গড়ে ওঠে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রেরণা যুগিয়েছে নানাভাবে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কাছে তাই আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে যেভাবে তাল রেখে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে মনীষী ও বিদ্বৎজনেরা গ্রন্থাগার ও তার উপযোগিতা

নিয়ে বহুকাল ধরে তাঁদের শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধের যতদূর সম্ভব আমরা সন্ধান পাই, তা হচ্ছে ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশিত "গ্রাম্য গ্রন্থালয়" প্রবন্ধটি। যে পত্রিকাটি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে সংরক্ষিত। পরবর্ত্তী পর্যায়ে দেখতে পাই ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত "বালক" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রবন্ধটি।

এরপরে ১৩০০ বঙ্গাব্দের পর থেকে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তথ্য ও সন্ধান আমার কাছে অজানা ছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রবন্ধগুলির সন্ধান করি। তারই ফলস্বরূপ এই সংকলন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, মনীষী, দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের জ্যোতিষ্কদের ৪৪টি প্রবন্ধ এবং এই গ্রন্থের সম্পাদকের ১টি প্রবন্ধ অর্থাৎ মোট ৪৫টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলি 'গ্রন্থাগার' ও 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বিষয়ক প্রবন্ধ বক্তৃতা ও সংবাদ যে আগ্রহ সহকারে প্রকাশ ও পরিবেশন করত এবং সে সময়কার উজ্জ্বল ব্যক্তিরা তাঁদের লেখা প্রবন্ধ, চিন্তাভাবনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেন, তার সামান্যতমও আজ আমরা দেখতে পাই না।

যে সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি ও যে সমস্ত পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছি কৃতজ্ঞতারূপ তাদের একটা তালিকা আলাদা করে সংযোজন করা হল। এই গ্রন্থের শেষাংশে লেখক—প্রবন্ধ পরিচিতিতে লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সাথে প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত ও কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থটি সংকলনে ব্যক্তিগতভাবে অনেকের কাছে সাহায্য পেয়েছি। এদের মধ্যে আছেন চন্দননগর সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী শাশ্বতী ঘোষাল ও গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীসনৎ মালিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রীতা চন্দ্র ও গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য এবং পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র মৃণালকান্তি মণ্ডল। সংকলন ও সম্পাদনার সকল স্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে আমার সহধর্মিণী কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের শ্রীমতী যূথিকা দাম। আমার

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে, যার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করি। স্বল্প জীবনে যদি কিছু অর্জন করে থাকি, তার সবটুকুই কৃতিত্ব পরিষদের।

প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। পাঠকদের অনুরোধ, তাঁরা আমার এই আমার্জনীয় বিচ্যুতি সম্ভব হলে উপেক্ষা করবেন, নয়তো বিচ্যুতি বলেই গ্রহণ করবেন।

এই বইয়ের প্রকাশক অসীমকুমার মণ্ডলের নিরবধি প্রচেষ্টা, নিরলস উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্য্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এই গ্রন্থ থেকে যদি কোন প্রশংসা প্রাপ্য হয়ে থাকে, তাহলে অনেকটাই তার প্রাপ্য। এর সঙ্গে ধন্যবাদ প্রাপ্য বাসন্তী প্রেসের কর্মীবৃন্দের, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই বই মুদ্রণের ব্যাপারে। অবশ্য পাঠকরাই প্রকৃত বিচারক, তাঁরাই বিচার করবেন এই সংকলনটির গুণাগুণ। তাঁদের বিচারের মানদণ্ডের নিরিখে যদি এই সংকলনটি উত্তীর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়, তবে "আলোর ঠিকানা", দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের সামনে খুব শীঘ্রই উপস্থাপন করার পরিকল্পনা রইল, যার সংকলনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে আছে।

পরিশেষে শুধু বলি মানুষ থেকে দূরে সরে থেকে যেমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শিল্প-সিদ্ধি অর্জন করা যায় না, তেমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের যাত্রা জয়যাত্রায় রূপান্তরিত হোক এবং সে যাত্রা অব্যাহত হোক, এই কামনা জানাই।

অসিতাভ দাশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি তাদের নাম উল্লেখ করা হল ।)

"অভ্যুদয়" পত্রিকা
এশিয়াটিক সোসাইটি
"উত্তরা" পত্রিকা
"উদয়ন" পত্রিকা
কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার
"গ্রন্থাগার" পত্রিকা
চন্দননগর সরকারী কলেজ গ্রন্থাগার
জাতীয় গ্রন্থাগার
"দেশ" পত্রিকা
"প্রণিধি" পত্রিকা
"প্রবর্ত্তক" পত্রিকা
"প্রবাসী" পত্রিকা,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
"বালক" পত্রিকা
"বিচিত্রা" পত্রিকা
"বিচিন্তা" পত্রিকা
"বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকা
বিবেকানন্দ রচনাবলী
বিশ্বভারতী
"ভারতী" পত্রিকা
"মন্দিরা" পত্রিকা
"মাধবী" পত্রিকা
লেনিন রচনাবলী
"সন্দেশ" পত্রিকা
"সবুজপত্র" পত্রিকা
"সুন্দরম্" পত্রিকা
হাবড়া টাউন লাইব্রেরী স্মারক পত্রিকা
এবং এই গ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দ।

সূচীপত্র

লাইব্রেরি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে. সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও; কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশা-পাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্য ধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চির জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র লিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব জাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব; সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানব আত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্ব সংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডের লাইব্রেরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

আমি গিয়া দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের মনে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং তাহাদের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইযাছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ির পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবস্থা করিতেছে, সেই সঙ্গে এক পাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও কিছু উপার্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্প মূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য।

এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, এক পার্শ্বে দুইটি আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম, পুস্তকগুলি স্বল্প মূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য?

উত্তর। না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরি।

আমি। এ সব পুস্তক কারা লয়?

উত্তর। এই পাড়ায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

আমি। আমি কি বই লইতে পারি?

উত্তর। হাঁ পারেন, এ তো সাধারণের জন্য।

তাহার পর আমি একখানি ৬।০ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ির ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম।

এইরূপ তিন-চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এ ব্যবসা তোমরা কত দিন চালাইতেছ?"

উত্তর। গত ৮।৯ বৎসর।

আমি। মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না?

উত্তর। কিরূপে?

আমি। লণ্ডনের মতে প্রকাণ্ড শহরে মানুষ এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়ে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে যায়, তা হলে বই কি করে পাবে?

এই প্রশ্নে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, 'তা কি করে হতে পারে? এ যে আমাদের বই। তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।

আমি। মনে কর, যদি না দেয়।

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না।"

বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে। ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।……লণ্ডন বাস কালে আমি অনেকদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, সেখানে এত বইয়ের আলমারি আছে যে, একটির পাশে আর একটি দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে, অথচ কাজের কি সুব্যবস্থা! পৃথক একখানি নূতন বই চাহিবামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত। এই লাইব্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকদের বাড়িতে গিয়া দেখিতাম যে, তাঁহাদের পাঠাগারে মেজে হইতে ছাদ পর্যন্ত পুস্তকের আলমারিতে পরিপূর্ণ। পথ ঘাট গলি ঘুচি সর্ব্বত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরেজদের জ্ঞান স্পৃহা কত প্রবল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

গ্রন্থালোচনার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপদেশকর্তা শ্রীবিষ্ণুশর্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেন :

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্টা বল্মিকস্য চ সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়ন কর্মসু ॥

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয়ং এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম ও পাঠদ্বারা দিবসকে সফল করিবেক।" পরন্তু এবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থপাঠ, জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্তির প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা ঋষিগণ জ্ঞান সাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এবং বিষয়ি ব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্ট সাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণের বিধিসকল জানিতে পারেন; বণিক বাণিজ্য ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন। এবং শিল্পকারেরা আপন আপন ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখ মোচনের উপায়, এবং শোকের সময় হৃদ্বোধক বাক্য গ্রন্থ হইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কর্মিজনের সহচর, ধার্মিকের বন্ধু, এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকল মঙ্গলের কামধেনু, এবং সকল সদুপদেশের আধার, অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা কি দরিদ্রের পর্ণ কুটীর সর্বত্র ইহা সমরূপে আদরণীয়; এবং সর্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ গুরুস্বেচ্ছায় এবং উপাসনায় সাপেক্ষপর, উপদেশাকাংক্ষির মানসাধীন নহে। কিন্তু পুস্তক সর্বদা আপন কার্য্যসাধনে প্রস্তুত এবং জিজ্ঞাসামাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে, কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপবেশিক যাহাতে সকলের গৃহে সর্বদা বর্তমান থাকে এমত চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য এবং সে চেষ্টাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে একশত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। এবং সামান্য বিষয়ি ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সংগ্রহ করিলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে, এবং

এতদ্রূপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন ইহাও বোধ হয় না।

যদিচ যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থ পাঠরূপ সুধা পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে একশত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে কিন্তু ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ হইলে তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যয় ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক-পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরপোকারার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং আমাদিগের কর্তব্য যে আপন আপন বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ ব্যবহার-বিষয়ে কাহারও হানি হয়না। এক গ্রামস্থ দশ ব্যক্তি যদি স্যাৎ বিবেচনা পূর্বক গ্রন্থ ক্রয় করেন, তবে একশত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন ; অথচ প্রত্যেকের এক এক শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গল বৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়দ্বারা অভিষ্ট সাধন হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের সার্ব্বকালিক বংশ পরম্পরের উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারোয়ারির অথবা তত্রতা প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সংগ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হাতে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্প-জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকলের দুঃখ মোচনের সুলভ উপায় সত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা করিয়া প্রদান করেন তদানুকুল্যেও তত্তদ্‌গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রবিষয় গ্রামভেটি ও বারোয়ারির ধন, যেহেতু তদ্ধ পার্ব্বনে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অনভিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

আমরা পল্লীগ্রামবাসীজনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইরা দুর্বল পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু তাহাই যে সর্বত্রের রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে। এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে। যে তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন। মিথ্যা সং নির্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল

গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদগ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই নিন্দার কারণ কি? গ্রামস্থ ব্যক্তিব্যুহের সৎকর্মের ব্যয় কুণ্ঠতা? কি অনভিজ্ঞতা? কি বিবেক-হীনতা? তাহা নহে। এতদ্দেশের রীতি এইপ্রকার যে প্রত্যেকেই একাকী অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ হইব এই মানস করেন। সুতরাং তদভিলাষ সিদ্ধার্থে পরম সাত্মাতিক কর্মেও তাঁহারা একত্র হইতে প্রবৃত্ত হয়েন না;—এবং সেই অপ্রবৃত্তিই এতদ্দেশের সংহারিকা অর্থাৎ উৎসন্ন হইবার বিস্তৃত পন্থা হইয়াছে। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পরস্পরের অধীন করিয়াছেন, ইহা কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে স্ব স্ব মনে স্থান দেন না, এবং তন্নিমিত্তেই আমাদিগের জন্মভূমির এমত দুরাবস্থা।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারিশত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতি মাসে সংগ্রহ হয় এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে, অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে এক বিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় নির্মাণ করিয়া দেওয়া দুষ্কর নহে। গ্রাম মধ্যে এমত এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠদ্বারা জগত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠকরত মনকে প্রফুল্ল করণে সক্ষম হয়েন। ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠদ্বারা জ্ঞান-জ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন। আমাদিগের ইংরাজ শাসনকর্তারা সাধারণের বিচারের জন্য মধ্যে মধ্যে ভাবি বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জনগণেরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারেন না। সে সকল স্থানে সংবাদপত্রের প্রচলন হইলে সকলেই ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া তাহার হিতাহিত বিচার করিতে পারেন; এবং পাণ্ডুলেখ্যোক্ত তাঁহাদের অনিষ্টকর লইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে পারেন। ফলতঃ ঐ স্থান সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় হয়, এবং তথায় অনেকে একত্র আসিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ, পরস্পর মিষ্টালাপ, বায়ুসেবন, গ্রন্থালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্তি পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্যদর্শন, চতুরঙ্গ ক্রীড়াদি নানাবিধ প্রেমরসে আর্দ্র হইতে পারেন। অদ্য এ বিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্র লিখিলাম; যদ্যপি পল্লীগ্রামস্থ ভায়েরা আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমরা ইহাতে পুনর্মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে সাধারণ নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা

গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত লাং সাহেব, এবং বীরভূমিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল লাল মিত্র মহাশয়দিগের উৎসাহে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূমি, যশোহরাদি বঙ্গদেশের দ্বাদশ স্থানে এতদ্রূপ গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে। অতএব উক্ত সদাত্মাদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি। এবং ভরসা করি দেশহিতৈষি মহাশয়েরা ইঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র তদ্রূপ মাঙ্গল্য কর্মের সূত্রপাত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

লাইব্রেরি

সুকুমার রায়

লাইব্রেরি মানে পুস্তকাগার বা কেতাবখানা—অর্থাৎ সেখানে বই রাখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে সহরে গ্রামে নানা জায়গায় ছোট বড় নানারকম লাইব্রেরি দেখা দিয়েছে. সুতরাং লাইব্রেরি জিনিসটা যে কিরকম সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই।

পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরির নাম করতে গেলে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির নামটা নিশ্চয় করা উচিত। এই লাইব্রেরিতে সকল দেশের সকল সময়ের এবং সকল রকমের বই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আসিরিয়া বা অসুর দেশের রাজা অসুর-বানি-পালের আড়াই বছরের পুরনো লাইব্রেরি খুঁড়ে সেখান থেকে প্রায় বিশ হাজার ইঁটের পুঁথি এখানে এনে রাখা হয়েছে। তাতে তীরের ফলকের মতো খোঁচা-খোঁচা সব অক্ষর; সেই অক্ষর বুঝবার জন্য কত বড় বড় পণ্ডিতকে কত বছরের পর বছর ভাবতে হয়েছে। তাতে আসিরিয়া দেশের জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস আইন আর ধর্মকর্মের কথা আছে. গল্পের বই কবিতার বই আছে, এমনকি লাইব্রেরির ক্যাটালগ বা বইয়ের ফর্দ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তার চাইতেও অনেক পুরাতন পুঁথি কিছু কিছু আছে, সেগুলি বেবিলনিয়ার ভাষায় লেখা। তার মধ্যে একখানা পুঁথি প্রায় ৬ হাজার বছর আগেকার! পেপিরস গাছের নরম ছালের উপর ছবির অক্ষরে লেখা ইজিপ্টের পুঁথিও সেখানে অনেক আছে।

ভারতবর্ষের নানান ভাষার পুঁথি, যে ভাষা এখন কেউ পড়তে পারে না সেই সব অজানা ভাষার পুঁথি, চীনেদের হিজিবিজি অক্ষরের সেই আদ্যিকালের পুঁথি, আফ্রিকা আমেরিকার অদ্ভুত ভাষার পুঁথি, পাথরে খোদাই করা পুঁথি, তামা লোহা ইঁট কাঠের পুঁথি কাগজ কাপড় রেশম পশম চামড়া বাকলের পুঁথি, হাতের লেখা হাজার হাজাব পুঁথি, আর লক্ষ লক্ষ ছাপান পুঁথি—ঐ এক লাইব্রেরির মধ্যে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে যে বইয়ের ফর্দ রয়েছে সেই ফর্দ লিখবার জন্যই প্রায় দেড়হাজার প্রকাণ্ড বড় বড় খাতার দরকার হয়েছে।

এই লাইব্রেরিতে পড়বার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা পড়বার ঘরে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের দরকারমত বই

বলবামাত্র চট্‌পট্‌ এনে দেবার জন্য দু-তিনশ কেরাণী কর্মচারী সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রায় দুশ বছরের পুরনো। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির বয়স প্রায় পাঁচশ বছর। তার আট লক্ষ ছাপান বই আর একচল্লিশ হাজার হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষত প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্র হয়, সেই সময়কার ছাপান চমৎকার সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পারিসের জাতীয় লাইব্রেরি (Bibliotheque Nationale) কেবল যে বয়সে ৭০০/৮০০ বৎসর তা নয়, তার আয়তনও লণ্ডনের লাইব্রেরির চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ছাপান বই, হাতের লেখা এক লক্ষ পুঁথি, আড়াই লক্ষ মানচিত্র আর দশ লক্ষ ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। পুবদেশীয় প্রাচীন পুঁথির অর্থাৎ এসিয়ার নানা অঞ্চলের পুঁথির নানারকম দৃষ্টান্ত এখানে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন নাই।

কিন্তু লাইব্রেরির চূড়ান্ত কাণ্ড যদি দেখতে হয় তবে আমেরিকায় যাওয়া দরকার। সেখানে ঠিক বৃটিশ মিউজিয়াম বা পারিস্‌ লাইব্রেরির মতো অত বড় লাইব্রেরি না থাকতে পারে কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলিও বড় সামান্য নয়। আর তাদের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে পৃথিবীর আর কোথাও তেমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় না। লাইব্রেরি যত বড়ই হোক, বইয়ের সংখ্যা দশ লাখই হোক কি বিশ লাখই হোক, যে-কোন বই চাইবামাত্র ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে যদি হাজির না হয় তবেই লাইব্রেরির দুর্নামের কারণ হয়। বই পেতে হলে কেবল তার নাম কিংবা নম্বরটি জানাতে হয়; অমনি লাইব্রেরিতে টেলিফোন করে দেয় আর দেখতে দেখতে তারের গাড়ি চড়ে বই এসে পড়বার ঘরে হাজির হয়। আমেরিকা কুবেরের দেশ, লক্ষপতি ক্রোড়পতি মহাজনের দেশ। লাইব্রেরির জন্য সে দেশে টাকার অভাব হয় না। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যেসব বড় বড় লাইব্রেরি আছে তেমন লাইব্রেরি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে লোকে টাকা জমা দিয়ে বই পড়তে নেয়। এইরকমে প্রতিদিন কত বই আসছে যাচ্ছে বই-বিলির খাতায় তার হিসাব থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায় যে এক বৎসরে পনের লক্ষ বার সেখানে বই বিলি করা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে জাঁকাল লাইব্রেরি হচ্ছে আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরির বাড়িটার জন্যই সওয়া দুকোটি টাকা খরচ হয়েছে।

লাইব্রেরিতে চল্লিশ লক্ষ বই রাখার মতো জায়গা রয়েছে। লাইব্রেরির তহবিলের জন্য প্রতি বৎসর দশ বিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঘর বাড়ি আলমারি আসবাবপত্র সব এমনভাবে তৈরি যে আগুনে ভূমিকম্পে ঝড় বিদ্যুতে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এমনকি, বইগুলো যাতে পোকায় না কাটতে পারে তার জন্য মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখা হয়—তাদের কাজ হচ্ছে কেবল পোকা ধ্বংস করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা।

একালের মতো প্রাচীনকালেরও অনেক বড় লাইব্রেরির নাম শোনা যায়। আসুর-বানি-পালের লাইব্রেরি আর বেবিলনিয়ার লাইব্রেরির কথা আগেই বলা হয়েছে। তার চাইতেও আধুনিক সময়ে অর্থাৎ প্রায় দু হাজার বছর আগে গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির নাম খুব শোনা যেত।

এই লাইব্রেরির উপর রাজাদের খুব অনুগ্রহ ছিল. তাঁরা নানারকমে তার সাহায্য করতেন। বিদেশী জাহাজে যদি কখনও পুঁথি পাওয়া যেত. তাহলে সেই পুঁথিগুলো রেখে তার নকল দিয়ে জাহাজকে বিদায় করা হত। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে নানা দেশ থেকে নানারকমের পুঁথি নিয়ে আসা হত। এথেন্সে দুর্ভিক্ষের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শস্য জোগান হয়েছিল এবং তার দাম হিসাবে এথেন্সের ভাল ভাল সরকারী বই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে ভর্তি করা হয়েছিল। গ্রীকদের এই লাইব্রেরিটির সঙ্গে রোমানদের পার্গেমাম লাইব্রেরির ভারি রেষারেষি ছিল। রোমানরা তাদের লাইব্রেরি বাড়াবার জন্য লোকের উপর অত্যাচার করত, জবরদস্তি করে যার তার পুঁথি কেড়ে নিয়ে যেত, এমনকি গ্রীকদের লাইব্রেরি থেকে লোক ভাগিয়ে নেবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করত।

সে সময়ে কাগজের সৃষ্টি হয়নি, খালি পেপিরসের ছালকে পিটিয়ে লম্বা লম্বা 'রোল' বা থান তৈরি হত। সেইগুলোতে লিখে লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে লাইব্রেরিতে বই বলে জমা করা হত। রোমানদের জব্দ করবার জন্য গ্রীকেরা এই পেপিরসের চালান বন্ধ করে দেয়। রোমানরা তখন অনেক চেষ্টা করে চামড়া থেকে একরকম পাতলা কাগজের মতো জিনিস (পার্চমেন্ট) তৈরি করে তাই দিয়ে পুঁথি বানাতে শেখে।

লাইব্রেরী

সরলা দেবী চৌধুরাণী

প্রতি লোকালয়ে যেমন লোকের শরীরধারণের জন্য অন্নভাণ্ডার ও বস্ত্র ভাণ্ডারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ধানের গোলা ও কাপড়ের হাটে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রতি লোকালয়ে লোকের মানস-পুষ্টিসাধনের একটি ভাণ্ডারও খোলা থাকা চাই, নয়ত সেখানকার লোকদের মানসিক খিন্নতার সম্ভাবনা অত্যধিক। পূর্বেই বলিয়াছি মানুষ হওয়ার জন্য শরীরের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মানস-খোরাক চাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা মানবমাত্রের মানুষ হওয়ার উপায় স্বরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞ নামে যে পাঁচটি দৈনন্দিন অবশ্য কর্তব্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন, —স্বাধ্যায়, অর্থাৎ সু-অধ্যায় বা সুন্দর সাহিত্য পাঠ তার অন্যতম ছিল। পাঠ বিনা মনের পুষ্টি হইতে পারে না। সে পুস্তক হস্তলিখিতই হউক বা মুদ্রাঙ্কিত হউক। লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার পাঠের সহায়, ইহারা মানস-বস্তুর ভাণ্ডার বা মানুষ গড়ার কারখানা। ইহারা লোকপালনের মহত্তম অংশ বহন করিতেছে। যাঁহারা ইহার উদ্যোগী তাঁহারা যথার্থ মানবপ্রেমিক। বালিবাসিদিগকে তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার জন্য আমি অভিনন্দন করি।

পৃথিবীর লাইব্রেরীর ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মিলাইয়া দেখিলে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইবেন। আজ মুদ্রিত পুস্তকসংগ্রহকে লাইব্রেরী আখ্যা দেওয়া যাইতেছে একদিন এমন ছিল যখন ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডের সংগ্রহই লাইব্রেরী ছিল। এই পৃথিবীতে এককালে আমাদেরই মত জাগ্রত জীবন্ত একটি জাতি অ্যাসিরিয়া ভূখণ্ডে নিবাস করিত। তাহাদের প্রতাপ, তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও তাহাদের সভ্যতা মহাকালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে - শুধু কতিপয় সহস্র ইষ্টকফলক তাহাদের আংশিক জীবনকাহিনী আজও নিজের গাত্রে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পাঠ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ইষ্টক পুস্তিকাগুলি অ্যাসিরিয়ার অসুর-বনি-পাল নামধেয় গুণগ্রাহী কবিপালক সম্রাটের লাইব্রেরীর অঙ্গ। ইহার দশবিশখানি ইষ্টকে এক একখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ। এইরূপ দশ হাজার গ্রন্থ পাওয়া যায়। সম্রাট অসুর-বনি-পালের লাইব্রেরী তাঁর প্রজাসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

* * কোন স্মরণাতীত কালের কোন স্মরণাতীত জাতির হাতের স্পর্শ এই ইষ্টক

পুস্তকগুলিতে বিদ্যমান। সে হাতগুলি পঞ্চভূতে কতদিন বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে প্রাণশক্তি সেই হাতদের প্রেরণা দিয়াছিল সে শক্তির ধ্বজা ইহাদের গাত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রোথিত—মহাকালও তাঁহাকে উৎপাটিত করেন নাই। তারপর ভূর্জপত্রে বা তদনুরূপ আধারের উপর মানুষের আত্মকাহিনী লিপিকরণে পরিচয় পাওয়া যায়। ভূর্জপত্রে লিখিত গ্রন্থসমূহের লাইব্রেরী মন্দিরে মন্দিরে বসিত হইত। পুরাকালে মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন প্রভৃতি সকল সভ্যদেশেই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য একটি শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই পাণ্ডিত্যশ্রেণীর লোকেই মন্দিরের পৌরহিত্য করিতেন। তাই অতীতে লাইব্রেরীসমূহ দেব-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছিল। এবং প্রত্যেক মন্দিরে লিপিকার সংখ্যাও কম ছিল না। কোন কোন পণ্ডিত স্বগৃহেও পুস্তক সঞ্চয় করিতেন—তাঁহাদের লাইব্রেরীও প্রসিদ্ধ লাভ করিত।

পৃথিবীর ব্রাহ্মণেও পৃথিবীর রেষারেষি আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে—কি আধ্যাত্মিকতায় কি বিদ্যানুরাগিতায়। তাই আমরা এক সময় হইতে দেখিতে পাই দরিদ্র বিদ্যামাত্রধনী ব্রাহ্মণের আশ্রয় ছাড়িয়া সরস্বতী সম্রাট ও সৈনিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজার আদেশে মিশরের প্রাচীন সম্রাটগণের সমাধিভবন সরস্বতীর নিবাসগ্রামরূপে নির্দিষ্ট হইল। সম্রাট ওসিমান্দিয়ামের সমাধিগৃহের পুস্তকাগারের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল "আত্মার চিকিৎসালয়।"

আলেকজান্দ্রিয়ার ভুবনবিখ্যাত লাইব্রেরী মিশরের টলেমীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট পরম্পরায় ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইউয়ের্গেতিস সম্রাটের রাজত্ব-কালে যে কোন বিদেশী মিশরে আসিতেন - তাঁহার নিকট পুস্তক থাকিলে মূল পুস্তক রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া আলেক্জান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে স্থান পাইত। এবং বিদেশীকে তার পুস্তকের একখানি নকল মাত্র দেওয়া হইত। রাজগণের পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতাও চলিত। সুবিধা পাইলেই একজন আর একজনের লাইব্রেরী লুঠ করিয়া নিজের রাজ্যের গৌরব বাড়াইতেন।··· ··· সীজর যখন আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে নিজের নৌবাহিনীতে আগুন ধরাইয়া দেন সেই আগুনের একটি লেলিহান শিখা আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমিগণের দুই ভাগে বিভক্ত লাইব্রেরীর একটি ভাগকে দৈবাৎ জ্বালিয়া দেয়। মিশর সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রার প্রণয়মুগ্ধ সীজর সেনাপতি অ্যাণ্টনি রাজ্ঞীর হৃদয় হইতে হুতাশনের কবলিত পুস্তকাগারের শোক বিমোচনের জন্য শত্রুরাজ্য পার্গেমাস হইতে তাদের সুবিখ্যাত লাইব্রেরী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তাঁর গরীয়সী প্রণয়িণীর দৌর্মনস্য বিদূরিত করেন।

প্রতীচ্য লাইব্রেরী ইতিহাসে আর একটি নারীর নাম পাওয়া যায়। রোমের সম্রাট অগাষ্টাস যে দুইটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী স্থাপনা করেন তাহার একটি তাঁহার বিদুষী ভগিনীর নামে প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্বান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দানকৃপণ মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে মুক্তি পাইয়া দেবী সরস্বতী ঐশ্বর্য্যবান ক্ষত্রিয়ের মুক্তহস্ততায় প্রজাসাধারণের সুলভ হইলেন। রাজ-পুস্তকালয় সমূহ সর্বলোকের নিমিত্ত উন্মুক্ত করা হইতে লাগিল, এবং অপর এক লাভ হইল। লুটপাটে ছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সংগৃহীত পুস্তকের লিপিসংখ্যা বাড়াইয়া পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান চলিতে লাগিল।

এইরূপে প্রাচ্যের বহু পুস্তক প্রতীচ্যের লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপিরূপে সংগৃহীত থাকিল। ভারতবর্ষ, আরব ও গ্রীসের মানসিক কুটুম্বিতা এইরূপে বজায় রহিল। বোগদাদ ও ত্রিপলির খলিফারা এবং স্পেনের মুরেরাও একদিন বিদ্যানুরাগিতায় এবং লাইব্রেরী প্রতিস্থাপন বিষয়ে মানবজাতির অগ্রণী ছিলেন। ইঁহাদের নিযুক্ত বহু লিপিকারগণের প্রাসাদে আজ ভারতবর্ষের অনেক লুপ্ত সাহিত্য বিদেশ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়।

রাজাদের দেখাদেখি বড় মানুষদের মধ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা ক্রমে অতীত-কালে একটা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। আজকালও তা লক্ষিত হয়—মানুষের স্বভাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ হইয়া একইভাবে চলিতেছে। চিনিবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় চিনির স্বাদে ভাগী ইহারা অনেকেই নহেন, শুধু বোঝা বহনের অধিকারী। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সুবিপুল লাইব্রেরী অতি অল্প গ্রন্থই ইঁহারা স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া লাভবান হন, অথচ অন্যকেও ব্যবহার করিতে না দিয়া যাঁহারা শুধু সংগ্রহ সুখ ভোগ করিতে চান তাঁরা কৃপাপাত্র। কিন্তু লাইব্রেরীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—বিদ্যালোলুপ হইয়া শুধু সংগ্রহ গৌরব—লোলুপ হইলেও তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের লাইব্রেরীর দ্বার বিদ্বৎগণের জন্য অবারিত রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে সকল লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করিতেন তাঁহারা প্রায়শই বড় বড় কবি, বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ।

প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জাগ্রতি সব দেশেই প্রবল হইয়া উঠিল। গুটি-কতক উচ্চস্তরের মানবে অধিষ্ঠিত পারমার্থিক রসের পাশাপাশি সার্বজনীন অনুভূতি—রস আত্মবিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল। সামান্যকে কল্পনা ও কলায় সজ্জিত করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জনহৃদয় সমুদ্রে উদ্বেল হইল। তারই ফলে আজ শত সহস্র পুস্তকাগারে লক্ষ লক্ষ সাহিত্য-গ্রন্থ। কিন্তু

প্রকৃতিতে দেখা যায় কুঁড়িমাত্রই পূর্ণসুষমাসম্পন্ন পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, এবং শত শত পুষ্পের মধ্যে একটি ফলবান হয়। যতগুলি প্রাণ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়, সকলেরই ভাষায় আত্মপ্রকাশ যে সাহিত্য পদবাচ্য তাহা নহে, তুলিধারী মাত্রেই চিত্রকর নহে, গায়ক মাত্রই গুণী নহে। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লেখকের আত্মপ্রকাশের সুলভতায় আধুনিক লাইব্রেরীগুলি যে ধানের বদলে খোসার কলেবর ভরিতে না পারে এমন নহে। সুতরাং আধুনিক লাইব্রেরীয়ানের দায়িত্ব প্রাচীন লাইব্রেরীয়ানের তুলনায় অত্যধিক নির্বাচনশক্তি গ্রহণ ও বর্জনশক্তির যথোচিত প্রয়োগক্ষমতা না থাকিলে, আধুনিক লাইব্রেরীয়ান মানসিক উন্নতির স্থলে মানসিক অবনতি বিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন। য়ুরোপের এক একটি বড় পুস্তকাগারের লাইব্রেরীয়ানের পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, রসগ্রাহিতাও তদনুরূপ তীক্ষ্ণ, সুন্দর অসুন্দরের বিচারশক্তিও অপূর্ব ধারাল। আমাদের দেশের ছোট বড় সকল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানদের নিজেকে এই ভাবে গুণী করিয়া তোলা কর্তব্য।

প্রত্যেক লাইব্রেরীর পাঠক-পাঠিকা সংখ্যার তালিকার অনুপাতে যে জনপদে সে লাইব্রেরী স্থাপিত সেই জনপদবাসীদের। আত্মোন্নতি কামনার বা সভ্যতার মাত্রার পরিমাণ করা যাইতে পারে। য়ুরোপের মধ্যে জার্মানীর লাইব্রেরীগুলির পাঠক সংখ্যা সর্বোচ্চ। রাশিয়ারও কম নহে। প্রাচ্য দেশের মধ্যে জাপানে পাঠক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। আপনাদের এই লাইব্রেরীটির পাঠক-পাঠিকা সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই আপনাদের এই জনপদটি মানুষ হওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে জানিবেন।

কিন্তু মিষ্টি খাইয়া শরীর বাড়ে না সকলেই জানেন, কিছু কটা কষায় লবণাক্ত জিনিসও প্রতিদিন দেহে যাওয়া চাই, নতুবা পাকযন্ত্রের জারক রসের মাত্রা পূর্ণ হয় না, এবং জীবনীশক্তিতেই খাঁকতি পরিয়া যায়। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আহার্য্য-তত্ত্বে বঙ্গগৃহিনীরা এ বিষয়ে তাঁদের অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন—কিঞ্চিৎ কটু সুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এর বিধি বাঁধাই আছে। অতএব সুধী পাঠকমণ্ডলী লাইব্রেরীয়ানকে সাহায্য করিবেন, নিজেদের হিতকল্পেই আপনাদের লাইব্রেরীটিকে শুধু রসিকগণের রসভাণ্ডার করিবেন না, ইহাতে জ্ঞানী-গণের জ্ঞানরত্নের মণিপ্রসাদ ও ভাবুকগণের চিন্তাসম্পদের শ্রীনিকেতনও গাঁথিয়া তুলিবেন।

প্রমথ চৌধুরী

এই কনফারেন্সের উদ্যোগকর্তারা আমাকে বঙ্গদেশের লাইব্রেরীর হিতকল্পে আহূত এই মন্ত্রণাসভার মন্ত্রণা-সভাপতির আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন, এর জন্য আমি অবশ্য নিজেকে যথোচিত ধন্য মনে করছি। তবে এ পদ লাভ করবার আমার কি দলিল আছে তা আমার নিকট অবিদিত।

আমি বই ভালবাসি—পড়তেও, সংগ্রহ করতেও। সম্ভবতঃ সেই কারণে আপনারা আমাকে এ আসন অধিকার করবার যোগ্যপাত্র স্থির করেছেন। কিন্তু বই পড়তে ভালবাসা, বই সংগ্রহ করতে ভালবাসা, এ দুই এক প্রবৃত্তি নয়, যদিও এ উভয় মনোভাবের ভিতর নাড়ীর যোগ আছে। এ দুই ভালবাসা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে তার প্রমাণ অনেকে বই পড়তে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে বই সংগ্রহ করতে ভালবাসেন না। অপর পক্ষে এ শ্রেণীর লোকেও বিরল নয়, যাঁরা বই সংগ্রহ করেন কিন্তু পড়েন না। অবশ্য এই দ্বিবিধ মনোভাবের যোগাযোগ থেকেই লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি নিজে বই পড়তে ভালবাসে,—তার পক্ষে পুস্তকসংগ্রহ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। যদি তার অর্থে ও সামর্থে কুলোয় তাহলে সে প্রায়ই একটি নিজস্ব লাইব্রেরীতে প্রতিষ্ঠা করে। এ জাতীয় লাইব্রেরীকে ইংরাজীতে Private Library আখ্যা দেওয়া হয়। বাঙলায় একে খাস লাইব্রেরী বলা যেতে পারে। আমি হচ্ছি সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন যার ঘরে উক্ত শ্রেণীর একটি খাস্ লাইব্রেরী আছে; এবং সেই সূত্রে আমি লাইব্রেরীর যোগক্ষম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বলা বাহুল্য যে, এ অভিজ্ঞতা Public Library-র গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে মতামত দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি নিজের টাকা সুদে খাটায় সে অবশ্য ব্যাঙ্কের গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয়।

সভামাত্রেরই সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি লম্বা বক্তৃতা করা। সে বক্তৃতা যে কতদূর লম্বা হওয়া উচিত তার পরিচয় এই সভার অনুষ্ঠান পত্রেই পাওয়া যায়। যাঁরা এ সভার অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেছেন, তাঁরা সভাপতির বক্তৃতার কাল বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন পুরো এক ঘণ্টা। একথা তাঁরা

ভাবেন নি যে, ব্যক্তি মাত্রেরই এত কথা বলবার নেই যা এক ঘণ্টার কম ব'লে শেষ করা যায় না। তারপর এক ঘণ্টা ধ'রে অনর্গল ব'কে যাবার শক্তি যাঁর দেহে আছে তাঁর বক্তৃতা ধৈর্য্য ধ'রে শোনবার শক্তি সকলের মনে নেই। মনে রাখবেন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় বাচালতার যতটা অবসর আছে বাঙলা ভাষায় ততটা নেই। আর আমি হচ্ছি একজন পুরোদস্তুর বাঙলা-নবীশ।

আজকের সভার উদ্দেশ্য যদি হ'ত লাইব্রেরীর আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বাগবিস্তার করা তাহলে এক ঘণ্টা কেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে সে বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করা যেতে পারত। কারণ সে সূত্রে নানারূপ সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করবার সুযোগ পাওয়া যেত; এবং এর প্রতি বিষয়েই এমন তর্কের সূত্রপাত করা যেত যে-তর্কের আর শেষ নেই। কিন্তু আপনারা এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; কি ক'রে বাঙলা দেশে লাইব্রেরীর প্রচার বৃদ্ধি করা যায় তাই হচ্ছে আপনাদের যথার্থ আলোচনার বিষয়। দেশে যে লাইব্রেরীর আবশ্যকতা আছে ও দেশময় লাইব্রেরী স্থাপন করতে পারলে যে দেশবাসীর উপকার করা হবে এ বিষয়ে আপনারা সকলেই একমত। শুধু কি উপায়ে সারা দেশে লাইব্রেরীর চাষ করা যায় সেই বিষয়েই আপনারা এস্থলে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। এর জন্য চাই, কিঞ্চিৎ কাজ,—বহু কথা নয়। Public Libraryর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং আপনাদের আলোচনায় রীতিমত যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি যার সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত সে হচ্ছে আমার ঘরাও লাইব্রেরী—সে কারণ আমি আপনাদের কাছে Private Library-র গুণাগুণ সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌তে চাই। আশা করি সে আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখবেন এই ঘরাও লাইব্রেরীই হচ্ছে লাইব্রেরীর আদি বিগ্রহ—যা কালক্রমে সামাজিক লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। এ দুই মূর্ত্তির ভিতর যথেষ্ট প্রভেদ আছে, তাই আমার সময়ে সময়ে মনে হয় পৃথিবীর এমন দিন হয়ত কখনো আসবে না যখন কারও ঘরে ঘরাও লাইব্রেরী আর থাকবে না। অর্থাৎ যে কালে সরস্বতী আর কারও গৃহদেবতা থাকবেন না, সকলের পুরদেবতা হবেন।

ইউরোপে দেখে এসেছি যে সে দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জ্জা আছে এবং সেই সঙ্গে অনেক বাড়ীতে private chapel আছে। দেশের লোকের মনের উপর যখন ধর্ম্মভাবের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তখন মানুষ স্বভাবতই ধর্ম্মসাধনার এই

উভয়বিধ ব্যবস্থা করে। লাইব্রেরী যে সর্বসাধারণ হওয়া উচিত, এই ডিমোক্রাটিক যুগে সে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বিরোধী নই এবং যদি কেউ নিজের মনোমত একটি নিজস্ব লাইব্রেরী সংগ্রহ করতে উদ্যত হন, তাহলে—তাঁকে নিরুদ্যম করা আমি কোন হিসেবেই সঙ্গত মনে করি নে। বরং ঘরে ঘরে ছোটখাটো লাইব্রেরীর দর্শন পেলে আমি উৎফুল্ল হই। Private Library একটি ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের হাতে ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে। ও শ্রেণীর লাইব্রেরী রাতারাতি আকাশ থেকেও পড়ে না, ভুঁই ফুড়েও ওঠে না। ও জাতীয় লাইব্রেরীর একটি প্রধান গুণ এই যে ওর ভিতর একটি বিশেষ ব্যক্তির আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকের মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য অবশ্য অধিকাংশ লোক মোটেই ব্যস্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোকও অনেক জন্মগ্রহণ করে যাদের মানসিক ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জানতে আমাদের মনে কৌতূহল আছে; এবং এ কৌতূহল চরিতার্থ করবার অন্যতম উপায় হচ্ছে তিনি কোন্ বই পড়্তেন ও কোন্ বই ভালবাস্তেন তার সন্ধান নেওয়া। ও জাতীয় কোন ঘরাও লাইব্রেরীর সাক্ষাৎ যদি আমরা পাই, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ হয়। যাঁরা ইউরোপ সাহিত্যিক ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাদের বিদ্যার দৌড় ও সাহিত্যরুচির সম্যক পরিচয় লাভের জন্য সে দেশেও বহু সাহিত্যিক আজকাল তাঁদের লাইব্রেরী তদন্ত করছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক নিট্‌সের মন ও মত কি ক'রে কার প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল তার তথ্য আমরা আজ আবিষ্কার করেছি তাঁর লাইব্রেরীর দৌলতে।

বলা বাহুল্য কোনও লোকের লেখা থেকে তাঁর পড়ার পরিচয় সব সময়েই পাওয়া যায় না। কারণ সাহিত্য জগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, লেখক তাঁর গ্রন্থে অপর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেন—সে সব গ্রন্থের তিনি শুধু নাম শুনেছেন মাত্র, কখনো চোখে দেখেন নি। যে বিদ্যে আমাদের নেই, সে বিদ্যে দেখাবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

বই অবশ্য লোকে কেনে পড়বার জন্য,—কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পুস্তকপ্রীতি ব'লেও একরকম বিশেষ প্রীতি আছে যা সাহিত্যপ্রীতি হতে স্বতন্ত্র। যিনি একবার পুস্তকসংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁর মনে কালক্রমে এই পুস্তকপ্রীতি নিজের অলক্ষিতে জন্মলাভ করে। এক কথায়, তিনি পুস্তকের শুধু গুণের নয়, তার রূপেরও পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। তখন পুস্তকের আকার, বর্ণ—

এমন কি গন্ধও তাঁকে আনন্দ দেয়। বইয়েরও যে একপ্রকার সুবাস আছে তা পুস্তকভক্ত লোক মাত্রেই জানেন। সে গন্ধের বর্ণনা ভাষায় করা কঠিন, কারণ তা কতক অংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর কতক অংশে অন্তরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সে যাই হোক, পুস্তকের যে অংশটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা যে সর্বজনপ্রিয়, তার প্রমাণ নিত্য পাওয়া যায় বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনদাতারা যে ভাবে যে ভাষায় নূতন বইয়ের বর্ণনা করেন তা প'ড়ে হঠাৎ বোঝা যায় না যে—সেই অপূর্ব পদার্থটি বই না ছবি। এই সার্বজনীন মনোভাব পূর্ণ মাত্রায় ফুটে ওঠে সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনে যাঁরা পুস্তকপ্রীতি একটা আর্টে পরিণত করেছেন। বইয়ের ছাপা কাগজ বাঁধাই সম্বন্ধে আশা করি আপনারা কেউ উদাসীন নন্। আর পুস্তকের বাহারও দিন দিন যে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করছে সেও প্রধানতঃ পুস্তক বাতিকগ্রস্ত লোকের প্রসাদে। বলাবাহুল্য এ জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ সেই শ্রেণীর মধ্যে মেলে যাঁরা Private Library সংগ্রহ করেন। অপর পক্ষে Public Libraryর স্রষ্টা মাত্রেই Utilitarian, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকহিত-সাধন। বইয়ের রূপের দিকে তাঁরা বড় একটা নজর দিতে পারেন না। অথচ বিদ্যা ও সুন্দরের চিরবিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নয়। পুস্তকপ্রণয়ী লোকদের, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাঁদের বলে bibliophile তাঁদের মধ্যে অপর একটি বিশেষ প্রবৃত্তির পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়। Rare books অর্থাৎ দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করবার দিকে এঁদের একটা আন্তরিক ঝোঁক থাকে; এর ফলে এঁরা অনেক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন ও সযত্নে রক্ষা করেন যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের অগোচর। এই প্রবৃত্তির ফলে তাঁরা অনেক গ্রন্থ লৌকিক বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন—যাতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অপ্রাপ্য থাকাতে সাহিত্যের কিম্বা সমাজের কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু মাঝে মাঝে এই rare books-এর মধ্যে আমরা অমূল্য রত্নের সাক্ষাৎ পাই। দু-একটি উদাহরণ দিই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও ভাসের নাটকের নাম আমরা বহুকাল থেকে শুনে আসছি কিন্তু চাণক্য ও ভাসের বই এহেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল যে, আমরা ও সব গ্রন্থের অস্তিত্ব কিম্বদন্তির কোঠায় ফেলে দিয়েছিলুম। পরে সেদিন যখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হল—তখন আমরা দেখ্‌তে পেলুম যে রাজনীতি সম্বন্ধে এর তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আর নেই। আর ভাসের নাটকের চাইতে উঁচুদরের নাটক এক কালিদাসের শকুন্তলা ব্যতীত সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে মেলা ভার। নাটক হিসেবে মৃচ্ছকটিকের স্থান

অবশ্য খুব উচ্চে। কিন্তু ভাস আবিষ্কৃত হবার পর আমরা এও আবিষ্কার করেছি যে মৃচ্ছকটিক ভাসের রচিত "দরিদ্র চারুদত্তের" চোরাই সংস্করণ মাত্র। অপরের বই নিজের বেনামিতে চালানোর অভ্যাস সেকালের লোকেরও ছিল।

প্রাইভেট লাইব্রেরীর আর এক মহাগুণ এই যে এ জাতীয় লাইব্রেরীর অঙ্গে যে বৈচিত্র্য থাকে পাব্লিক লাইব্রেরীর দেহে সে বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। কারণ যাঁরা নিজের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করেন না, করেন শুধু লোকহিতার্থে, কোন্-জাতীয় পুস্তকের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা মনস্থির করতে বাধ্য। যুগধর্ম্ম অনুসারে লোকে নানারূপ বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের অনুরক্ত হয়,—এবং এর ফলে প্রতি দেশে প্রতি যুগে পাবলিক লাইব্রেরীগুলি সমধর্ম্মী অর্থাৎ একধর্ম্মী হতে বাধ্য।

যে যুগে সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াটাই পরোপকারী ব্যক্তিরা তাঁদের সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন, সে যুগে লাইব্রেরীতে ধর্ম্মকর্ম্মের পাঁজিপুঁথি সংগ্রহ করাই পুস্তক সংগ্রহীতাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সে যুগের লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানের বইয়ের সাক্ষাৎ লাভ করা দুর্ঘট। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আদর অবশ্য কোন দেশেই কোন যুগেই সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় করে না। কারণ এ জাতীয় গ্রন্থের অর্থগ্রহণ ও রসগ্রহণ করতে পারেন শুধু পণ্ডিতের দল। তবে যেকালে ধর্ম্ম সামাজিক মনের উপর আধিপত্য করত, সেকালে পলিটিক্সের বইয়েরও কোনও আদর ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে এদেশে হাজারখানেক বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, তার একমাত্র কারণ সে গ্রন্থ অনেক ব্রাহ্মণসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে ছিল।

এযুগে পৃথিবীর লোক পলিটিক্স্-প্রাণ হয়ে উঠেছে। পলিটিক্স্ হচ্ছে একালের লৌকিক ধর্ম্ম। সুতরাং একালে যদি কেউ লোকহিতার্থে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের স্থাপনা করতে চান, তাহলে তিনি যে মোহমুদ্গর বাদ দিয়ে কৌটিল্যের গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর গীতা সে লাইব্রেরীতে স্থান পাবে, প্রধানতঃ তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বলে।

এ অবস্থায় সকল জাতীয় সাহিত্যের সংগ্রহ তাঁদের পক্ষে করাই অসম্ভব যাঁদের ব্যক্তিগত রুচি সাধারণ রুচির সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। এ কারণেও যত বেশি লোক নিজের রুচি অনুসারে পুস্তক সংগ্রহ করেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সামাজিক মনের সংকীর্ণ হবার দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সে মনকে যুগে যুগে উদার করবার ভার সেই সকল ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত থাকে,

যাদের মন সামাজিক মতামতের গণ্ডিবদ্ধ নয়। আমি প্রাইভেট লাইব্রেরীর লাইব্রেরীর সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি, সুতরাং এখন এ শ্রেণীর লাইব্রেরীর ব্যর্থতা কোথায় সে কথাটাও বলা আবশ্যক।

প্রাইভেট লাইব্রেরীর প্রধান দোষ এই যে তার পরমায়ু স্বল্প। এ জাতীয় লাইব্রেরীর রচয়িতার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের স্বহস্তরচিত লাইব্রেরীও তিরোহিত হয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে পুস্তকপ্রণয়ী লোকদের উত্তরাধিকারী লাইব্রেরী জিনিষটিকে আবর্জ্জনা হিসেবে দেখেন এবং যত শীঘ্র পারেন যে আবর্জ্জনাকে তাঁরা ঝেঁটিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দেন। তখন বহুকষ্টে বহুযত্নে একত্রে গ্রথিত সে লাইব্রেরী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং বহু বহুমূল্য পুস্তক পুরোনো কাগজের দরে বাজারে কাটে। আর যাঁর কুল-তিলকরা দশ টাকা দামের পুস্তক একটাকায় বিক্রী করতে প্রস্তুত নন তাঁদের লাইব্রেরী পোকায় কাটে।

এজন্য প্রাইভেট লাইব্রেরীর মালিকদের এ পরামর্শ নিঃ-সঙ্কোচে দেওয়া যায় যে তাঁদের লাইব্রেরীর উত্তরাধিকার কোনও না কোনও পাবলিক লাইব্রেরীকে দেওয়াই একান্ত শ্রেয়। শাখানদীর চরম সার্থকতা মহানদীর দেহে লীন হওয়ায়। আমার জীবনেই আমি একাধিক প্রাইভেট লাইব্রেরীর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় নিজে চক্ষে দেখেছি। মালিকের অবর্তমানে আমার পরিচিত যে কটি লাইব্রেরীর সদগতি হয়েছে সে কটিই কোন না কোনও পাবলিক লাইব্রেরীর অঙ্গে লীন হয়েছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী এখন বোলপুর শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর অন্তর্ভূত। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর দু-পুরুষের লাইব্রেরী এখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা লাইব্রেরী স্বরূপে বিরাজ করছে, এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরী সাহিত্য পরিষদে শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বলা বাহুল্য যে, এ সকল লাইব্রেরীর এহেন সদগতি না হলে তারা দুদিনেই ধূলোয় মিশিয়ে যেত। আমি প্রাইভেট লাইব্রেরীর যে সকল সার্থকতার কথা বলেছি সে সকল কথার কোনই অর্থ থাকে না যদি না তা ভবিষ্যতে কোনও সাধারণ লাইব্রেরীর অঙ্গীভূত হয়। যা আদিতে ছিল প্রাইভেট তা অন্তে পাবলিক হয়েই জীবনধারণ করতে পারে।

বাঙলা দেশে নানাস্থানে যে আজকের দিনে নানা ছোট বড় লাইব্রেরীর জন্ম হচ্ছে, এ ঘটনা আমি বাঙালী জাতির পক্ষে নিতান্ত গৌরবের বিষয় মনে করি। কারণ এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বস্তু মানুষের শুধু মনের বস্তু তা বাঙালী জাতির অতি প্রিয়। মনের চর্চ্চার অর্থ যে ধনের চর্চ্চা নয়, বাঙালী যে মাড়োয়ারী

নয় এ ব'লে অনেককে আক্ষেপ করতে শুনেছি। আমাদের পক্ষে মনের চর্চ্চা ত্যাগ করে একান্ত মনে ধনের চর্চ্চা করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমি মন স্থির করতে পারি নি। কারণ এ যুগে মন বাদ দিয়ে ধনের সৃষ্টি করা যায় কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ যুগে ধনের সৃষ্টি হয় কলে, আর কল চলে এঞ্জিনের ঠেলায়, আর এঞ্জিন চলে কিসে? চর্মচক্ষে আমরা দেখতে পাই তেলে ও জলে, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখতে গেলেই দেখা যায় যে এঞ্জিনের যথার্থ চালক মানুষের মন—কোনও ভৌতিক পদার্থ নয়। আর যে মন এই ভৌতিক জগৎকে দিয়ে এই ভূতের বেগার খাটিয়ে নিচ্চে, সে মন বিদ্যা বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ। কোনও কল যখনই আমার চোখে পড়ে, তখনই দেখতে পাই যে, তার অন্তরে রয়েছে এক-খানা বই। সংস্কৃত সাহিত্যে দু প্রকার যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, এক নির্জীব যন্ত্র আর সজীব যন্ত্র। এ যুগের যত যন্ত্র সবই সজীব যন্ত্র। আর যন্ত্রকে সজীব করে মানুষের সজীব মন। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে মনের চর্চ্চা ক'রে কোন জাতিই দরিদ্র হয় না। জাতীয় মূর্খতা কস্মিনকালেও জাতীয় ধনাগমের উপায় ছিলনা—কস্মিনকালেও হবে না। বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির অধীন হয়েই উন্নতিলাভ করে। সুতরাং যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতির মনের চর্চ্চার অনুকূল যথা, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ইত্যাদি সে সকলকেই আমি শ্রদ্ধা করি। সুতরাং যাঁরা বঙ্গদেশে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও উন্নতির জন্য চিন্তান্বিত হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে লাইব্রেরী গঠনের সদুপায় অনুসন্ধান করছেন আমার মতে এদেশে তাঁরা যথার্থ জাতি গঠন কার্য্যে আপনাদের নিয়োজিত করেছেন। কি উপায় অবলম্বন করলে আপনাদের চেষ্টা ফলবতী হবে সে বিষয়ে আমার এমন কোনও কথা বলবার নেই যা অপরের শোনবার মত। কারণ এ বিষয়ে আমার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট। আমি নিজে কখনও কোনও Public Library-র administration-র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিনি, সুতরাং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হতে হলে কি কি বাধা অতিক্রম করতে হয়, সে বিষয়ে আমার কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রাইভেট লাইব্রেরী ব্যক্তি বিশেষের হাতে গড়ে ওঠে কিন্তু Public Library গড়ে তুলতে হয়। একটির প্রকৃতি হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে organic, অপরটি organise করতে হয়।

কোন জিনিষকেই organise করার কৌশল আমার আয়ত্ত নয়। তবে মনে হয় যে, এ দেশে লাইব্রেরী organise করবার সহজ সঠিক উপায় অপর দেশে বা অপর কালে অনুসন্ধান করে সে উপায় আপনাদের উদ্ভাবন করতে হবে। কেননা

দেশ কালের বিভিন্নতার ফলে সে উপায়ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। অপর দেশের লোকেরা কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা অবশ্য আমাদের জানা কর্তব্য। এ-বিষয়ে অপরের অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের উপায় উদ্ভাবনের সাহায্য করবে। অতএব সে সাহায্যে বঞ্চিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

আমি আপনাদের কাছে বার বার Public Library-র নাম উল্লেখ করেছি। এখন এই Public Liabraryর অর্থ কি, সে বিষয়ে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। এ জাতীয় লাইব্রেরী নিতান্ত আধুনিক, এবং এর জন্মস্থান হচ্ছে ইউরোপ। লাইব্রেরী পুরাকালেও ছিল এবং সম্ভবত বিপুল আয়তন-সম্বলিত ছিল। সেকালের একটি লাইব্রেরীর অর্থাৎ Alexandria লাইব্রেরীর নাম আমরা সকলেই শুনেছি। মিশরের মুসলমান বিজেতারা তার অগ্নিসৎকার করে সে লাইব্রেরীকে অমর করে গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস এদেশেও পুরাকালে হিন্দু রাজারা সাগ্রহে পুস্তক সংগ্রহ করতেন। কারণ অদ্যাবধি অনেক হিন্দুরাজার রাজপ্রাসাদে অতিকায় লাইব্রেরীর সাক্ষাৎ মেলে। এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ যা আমরা ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই—সে সব হিন্দু রাজার পুস্তকালয় থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সব লাইব্রেরীরই ছিল আসলে Private Library.

কি উদ্দেশ্যে হিন্দুরাজারা এই পুস্তক সংগ্রহ করতেন তা বলা কঠিন। হিন্দুরাজারা ছিলেন সব ক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণ নন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা তাঁদের জাতিধর্ম্ম কিম্বা কুলধর্ম্ম ছিল না। সুতরাং তাঁরা আর যে কারণেই পুস্তক সংগ্রহ করুন পড়বার জন্য যে তা করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। অবশ্য এই রাজারাজড়ার মধ্যে কেউ কেউ কাব্যানুরাগী ছিলেন, কিন্তু পুস্তক সকলেই সংগ্রহ করতেন।

সে কালে লোকের পুস্তকের প্রতি অনুরাগ না থাক্ পুঁথির উপর ভক্তি ছিল। পুঁথি সংগ্রহ করা খুব সম্ভবতঃ সে কালে একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হত। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যা যে শক্তি, এ জ্ঞান মানুষের প্রাচীন যুগেও ছিল। সুতরাং সে যুগে রাজারাজড়ার দল পুস্তক সংগ্রহ করতেন বোধহয় যুগপৎ পুণ্য অর্জন ও শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য। সে যাই হোক সে কালের এজাতীয় লাইব্রেরীকে কিছুতেই একালের Imperial Libaray বলা যেতে পারে না, কারণ সে সকল লাইব্রেরী জনসাধারণের ব্যবহারে আসত না। সেকালে সরস্বতী মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার কেবলমাত্র দু'চারজন উপবীতধারীর ছিল।

আর লাইব্রেরী ছিল মঠেবিহারে। ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করবার জন্যই এসব

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সে কালে গৃহস্থদের দল এই সকল শাস্ত্রীদের মুখে ধর্ম্মকথা শুনতেন, কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় যোগ দেবার অধিকার বা শক্তি বোধ হয় তাঁদের ছিল না!

আর এ জাতীয় পুস্তক সংগ্রহের উপায় রাজাদের ছিল লুট ও ভিক্ষুদের ছিল ভিক্ষা।

শুধু আমাদের দেশে নয় ইউরোপেও সে কালের সব লাইব্রেরীর মালিক ছিল হয় রাজা নয় monastery। এবং ইউরোপের রাজারাজড়াও পরস্পরের লাইব্রেরী লুটে নিয়ে যেতেন। এমন কি Napolean সেদিন অর্দ্ধেক ইউরোপ লুটে ফ্রান্সের পুস্তকাগার ও চিত্রশালার দেহ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। আর ধর্ম্মসঙ্ঘ মাত্রেরই ধর্ম্ম হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারী করা; তা সে সঙ্ঘ খৃষ্টসঙ্ঘেরই হোক আর বৌদ্ধসঙ্ঘই হোক্। একালে কিন্তু লাইব্রেরী স্থাপন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। কারণ বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের মনে এখন যুগান্তর ঘটেছে। একালে বিদ্যার কোনরূপ দুর্গ প্রস্তুত করবার প্রবৃত্তি আমাদের মনের কোনও কোণে নেই এবং তা করবার জন্য সেকালে মামুলি উপায় সকল অবলম্বন করবার শক্তিও নেই; একালে আমরা মনোজগতে জাতিভেদ মানি নে, সুতরাং কোনও শ্রেণীবিশেষের জন্য পুস্তক রচনা করা ও সংগ্রহ করা আমাদের মনঃপুত নয়।

আমাদের দেশে আজও বেশির ভাগ লোক অবশ্য নিরক্ষর কিন্তু এই বিরাট অজ্ঞতা আমরা প্রসন্ন মনে বিধির নিয়ম বলে গ্রাহ্য করতে পারিনে। কাউকে জীবনে নিঃস্ব দেখলে আমরা মনে ব্যথা পাই, অপর পক্ষে কাউকে মনে নিঃস্ব দেখলে আমরা মনে সোয়াস্তি বোধ করিনে। ফলে দেশে যাতে আর নিরক্ষর লোক না থাকে সে বিষয়ে আজ বহুলোকে সচেষ্ট। এমনকি আমরা নিম্নশ্রেণীর বালকদের জোর করে লেখাপড়া শেখানোরও পক্ষপাতী।

যে মনোভাব থেকে আমরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের প্রয়াস পাই, সেই মনোভাব থেকেই আমরা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপনের প্রয়াস পাই। সুতরাং এযুগে বহু লাইব্রেরীর প্রয়োজন আছে এবং এসব লাইব্রেরী আমাদের শিক্ষা ও সামর্থ্য অনুসারে গড়ে তোলা আমাদের কর্ত্তব্য। বর্তমানে অবশ্য popular লাইব্রেরীর বিশেষ কোনও অবসর নেই—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আজকের দিনে দেশে যার বিশেষ প্রয়োজন তা

উচ্চশিক্ষার লাইব্রেরী নয়, নিম্নশিক্ষার লাইব্রেরী নয়, কিন্তু এ দুয়ের মাঝামাঝি গোছের লাইব্রেরী অর্থাৎ সেই জাতীয় পুস্তকসভ্য যা সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকার-বহির্ভূত নয়। এসব লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য স্বজাতিকে পণ্ডিত করা নয় মানুষ করা। এজাতীয় লাইব্রেরীর আর একটি বিশেষ কারণে বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজকালকার স্কুলের শিক্ষার আমরা তাদৃশ সন্তুষ্ট নই। কেন যে নই সেকথা বলতে হলে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিচার করতে হয়। এক্ষেত্রে তার অবসর নেই। আমি শুধু আপনাদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যে স্কুল কলেজের বর্তমান অবস্থায় আমাদের নিজের শিক্ষার জন্য নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে। এক কথায় এযুগে আমাদের self culture এর নিতান্ত প্রয়োজন। দেশময় যদি আমরা লাইব্রেরী ছড়িয়ে দিতে পারিত আমরা স্বজাতির এই self culture-এর সহায় হব।

আমি স্কুল কলেজ বন্ধ করবার বা ভঙ্গ করবার মোটেই পক্ষপাতী নই। নেই মামার চাইতে কানা মামা ভাল, এই যুক্তি অনুসারেই আমি বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অনুমোদন করি। আমাদের দেশের শিক্ষায়তন সব অন্ধ বলে আমি তাদের পঙ্গু করবার পক্ষপাতী নই, কারণ আমি আশা করি ভবিষ্যতে তাদের চোখ ফুটবে। কিন্তু বর্তমান স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা যাতে নিজ চেষ্টায় সুশিক্ষিত হতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই কারণেই আমি এই লাইব্রেরী movement-এর সর্বান্তঃ-করণে মঙ্গল কামনা করি। লোকশিক্ষার ভার এক হিসেবে সংবাদপত্র হাতে নিয়েছে। সংবাদপত্র কিন্তু সাহিত্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকের মন তৈরী করা, আর সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য মত তৈরী করা। মন আর মত যে এক জিনিষ নয়, তার প্রমাণ মনের অভাব থেকেই অনেক ক্ষেত্রে মত জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরমত স্বমত হয়ে ওঠে। সুতরাং লাইব্রেরীর অভাব সংবাদপত্র পূরণ করতে পারে না। এযুগে আমরা যখন বিদ্যা চর্চ্চটা লোকসামান্য করতে চাই এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এই প্রচারকার্য্যের অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করি তখন এযুগের লাইব্রেরীর সার্থকতা হচ্ছে তা সর্ব্বসাধারণ হওয়ায়; অর্থাৎ পাবলিক পাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের প্রতিই আমাদের বিশেষ করে মনোনিবেশ করতে হবে।

পুরাকালে লোকে পুস্তকসংগ্রহ করত, হয়ত কৃপণের ধনের মত তা স্বগৃহে জমিয়ে রাখবার জন্য, কিন্তু একালের লাইব্রেরী গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পুস্তক

অপরকে ধার দেওয়া। এ অবস্থায় পুস্তক সংগ্রহ করার চাইতে পুস্তক distribute করার কৌশল আয়ত্ত করা কিছু কম প্রয়োজনীয় নয়।

পাবলিক লাইব্রেরীও আবার দুজাতির হয়—এক স্থাবর লাইব্রেরী আর জঙ্গম লাইব্রেরী। কলিকাতার Imperial Library হচ্ছে স্থাবর লাইব্রেরীর একটি প্রকাণ্ড উদাহরণ। পাঠককেও লাইব্রেরীর দ্বারস্থ হতে হয়' ও লাইব্রেরীর কোন পুস্তক নিজের গৃহস্থ করবার জো নেই।

অধ্যয়ন প্রবৃত্তি আমাদের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এতটা প্রবল নয় যে তারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও জাতীয় লাইব্রেরীর সাধনা করবেন। ওরকম লাইব্রেরীতে যাওয়া একরকম স্কুলে যাওয়া। অথচ এ স্কুলে পাঠ করবার ফলে কোনও উপাধি পাওয়া যায় না। কেউ যদি চাকরির দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি Imperial Library-তে অধ্যয়ন করেছেন সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হতে বাধ্য। এই কারণে আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের লাইব্রেরী সকল প্রধানতঃ জঙ্গম লাইব্রেরী হওয়া কর্তব্য। বইয়ের পিছনে যখন পাঠক ছুটবে না তখন পাঠকের পিছনে বইয়ের ছোটা কর্তব্য। কিন্তু এর ভিতর একটা মহা বিপদ আছে। সংস্কৃত ভাষার একটি উদ্ভট শ্লোক বলে যে

লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতা গতা
কদাচিৎ পুনরায়াতা ভ্রষ্টা চ চুম্বিতা"

লেখনী ও রামা সম্বন্ধে যাই হোক পুস্তক পরহস্তে গেলে যে প্রায়ই ফিরে আসে না—আর যদি বা আসে ত ভ্রষ্ট ও মৃষ্ট অবস্থাতেই আসে তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি চির জীবন পেয়ে এসেছি। সামাজিক লোকের বই জিনিষটের উপর মায়া বাড়ানো ছাড়া এ রোগের অপর কোনও ঔষধ নেই। কোন জিনিষ ছড়িয়ে দিতে হলে পূর্বে তা জড় করতে হয়। লাইব্রেরীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বই জড় করা। পুস্তক সংগ্রহ নিজের জন্যই করি আর পরের জন্যই করি আমাদের সকলকেই পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে। যিনি যে উদ্দেশ্যেই লাইব্রেরী করুন না কেন তাঁকে বই কিনতে হবে। ইংরাজীতে বলে beg, borrow or steal। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত সব সহজ উপায় আমরা অবলম্বন করতে পারিনে। সুতরাং লাইব্রেরীর পিছনে একটা মস্ত অর্থ-সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যার মীমাংসা প্রতি ব্যক্তিকে নিজে করতে হবে। যেখানে জনসাধারণের উপকারার্থ লাইব্রেরীর সৃষ্টি করা হয় সেক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছ থেকেই তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা

যে কর্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কি উপায়ে কি কৌশলে তা করা যায় তা আমার অবিদিত। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি পুস্তক সংগ্রহের মূল ধর্মের কথা উল্লেখ করতে চাই।

যাঁরা পুস্তক সংগ্রহ করেন তাঁরা যে সকলের ধনী ব্যক্তি তা মোটেই নয় বরং তাঁদের ভিতর অনেকেই সামান্য অবস্থার লোক। আমি এই কলিকাতা সহরে একটি প্রাইভেট লাইব্রেরী জানি যা পুস্তকের ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়। অথচ যিনি এই গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অর্থের সচ্ছলতা ছিল না। এর থেকে আমি অনুমান করছি পুস্তকের প্রতি পরাপ্রীতিই হচ্ছে পুস্তক সংগ্রহের প্রধান উপায়। যে প্রীতি ও যে উৎসাহের বলে ব্যক্তি-বিশেষ প্রাইভেট লাইব্রেরী গড়ে তোলে সেই প্রীতি ও সেই উৎসাহের বলেই লোকে পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তুলবে। অর্থাৎ লাইব্রেরী মাত্রেরই পিছনে এমন লোক চাই যিনি পুস্তক সংগ্রহকে জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ জাতীয় মন যার আছে তাঁর হাতে অর্থ সমস্যার মীমাংসা সহজেই হয়ে যাবে। সর্বশেষে আমি একটি কথা বলতে চাই যে কথাকে সকলেই আমার মনের কথা বলে গ্রাহ্য করবেন। আমি বই লিখি সুতরাং যে উপায় অবলম্বন করলে দেশে বইয়ের প্রচার ও প্রচলন বাড়বে সে উপায়ের পক্ষপাতী হওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। লাইব্রেরীর তুল্য বইয়ের ব্যবসার দ্বিতীয় সহায় নেই। সুতরাং আপনাদের বর্তমান প্রচেষ্টার আমি যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি সে ত ধরা কথা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ অত্যুক্তি করে থাকি ত তা আপনারা উপেক্ষা করবেন এই কথা মনে রেখে যে বইয়ের হয়ে ওকালতি করা আমার জাতি ব্যবসা।

পাঠাগারের ব্যবহার

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা ভাল বটে, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পড়া।

আগেকার দিনে পড়িয়া ও পড়াইয়া পণ্ডিতেরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল।

আজকাল আর লেখাপড়া শিখবার জন্য, জ্ঞান-অর্জন করবার জন্য, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হ'লে কিছু হবে না, একথা বলা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন—প্রতিভায় উজ্জ্বল—তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি!

মেকলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আস্‌বার পথে জাহাকে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুয়েজ খালের পথে ভারতে আস্‌বার রাস্তা হয় নি। বিলেত থেকে ভারতে আস্‌তে হতো 'কেপ-অব্‌-গুড-হোপ' ঘুরে। তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত।

গিবন্‌ অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত জ্ঞানী কয় জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে ব'সে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন—'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস'—এক অতি অপূর্ব জিনিস।

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন্‌ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দুবেলা তাঁর আহার জুটত

না। একদিন তিনি তাঁর পুস্তক-প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন,—নীচে সই করেছিলেন—'খাদ্যহীন'। এই জন্‌সন লাইব্রেরীতে প'ড়ে প'ড়ে জ্ঞানবান্ হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার তাঁর সঙ্গতি ছিল না।

মহাপণ্ডিত কার্লাইলের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর পিতা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। অতি দরিদ্র ছিলেন এঁরা। কার্লাইল বলতেন—'রক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হ'য়ে জন্মাইনি, তাই মানুষ হয়েছি'।

তাঁর পিতা তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্বাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে এসে তিনি বল্লেন—'একমাত্র গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নাই।' তবুও যে তিনি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালিয়ান, ফেন্চ ও জার্মান ভাষা শিখেছিলেন।

ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জন ক'রে পণ্ডিত হননি। এঁদের কারও নামের পিছনে ক্যাণ্টাব, অক্‌সন্ নেই। এঁরা ভারতে থেকেই লেখাপড়া ক'রে পণ্ডিত হয়েছেন।

অনেক জাপানী লণ্ডনে যায়, বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে আনতে। তাঁদের কারুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লণ্ডনের ডক্টর (Doctor) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন আমাদের দেশের ডক্টরেট কি কিছু নয় যে, আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব?

আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিষ হচ্ছে জ্ঞান-স্পৃহা।

পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার Imperial Library ও University Library থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোট করি—যেন রাত পোহালে আমার এম. এ এগ্‌জামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান বই খুব কম লোকই পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটা প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখতে কি সময় নষ্ট!

কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে আগে জার্মান শিখে তারপর সেই ভাষার মারফত অপর যা কিছু শিখতে হবে, তবে সে ঐ কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে' ভাব্‌বে। অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব শেখা যায়।

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারে, পরের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি, মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে, পড়া দরকার। যাকে বলে 'well-informed', তাই হওয়া দরকার। 'well-informed' না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই।

পাঠাগার

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দেশভরা এত যোগ্য লোক থাকিতে আপনারা কেন যে আমার মত একজন অক্ষমকে আপনাদের এই পাঠাগার-সভার পৌরোহিত্যভার গ্রহণের আমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন, তাহা বাস্তবিকই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। আবার যেমন-তেমন আমন্ত্রণ নয়, এমনতর আগ্রহ ও আন্তরিকতার ডাক আমার ভাগ্যে বড় বেশী ঘটে নাই। আমি কবিমাত্র। কোণে বসিয়া কখনো কখনো কবিতা রচনা করিয়া থাকি, এই পর্য্যন্ত। সুধীমণ্ডলীসমক্ষে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠের স্পর্দ্ধা আমার নাই; তবে, আমি কেন যে এ ভার গ্রহণ করিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিতে অবশ্য আমি বাধ্য এবং সেজন্য স্বপক্ষে এইমাত্র বলিতে পারি যে, অযোগ্য ও অকৃতী হইলেও আপনাদের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া উঠিবার উপযোগী সৎসাহস আমার নাই; তাই আমার অক্ষমতাকে অপরাধ বলিয়া আপনারা গ্রহণ করিবেন না। যাই হোক্, যে কারণেই হোক্, আপনারা যে সম্মান আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

'দেশবন্ধু-পাঠাগারের মত' সার্থকনামা প্রতিষ্ঠান জঙ্গীপুরের ন্যায় সুদূর পল্লীতে ইতিপূর্বে বড় একটা আমার চোখে পড়ে নাই। দেশবন্ধুর পুণ্য নামে যদি ইহার নামকরণ হইয়া থাকে, তবে তার চেয়ে ভালো নাম আর হইতে পারে না। দেশ-বন্ধুর উদারতা, তাঁহার মহাপ্রাণতা, তাঁহার বিপুল শক্তি ও স্বার্থত্যাগ, দেশের কাছে তাঁহার যে পরিচয় দীপ্যমান রাখিয়াছে, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানও সেইরূপ সার্থকতা ও মহিমার উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, প্রার্থনা করি। আর যদি 'দেশবন্ধু' শব্দটি বিশেষণরূপে ধরা যায়, তবে তদপেক্ষা পাঠাগারের উপযুক্ত বিশেষণও আমি কল্পনা করিতে পারি না। কেন না, পাঠাগারের মত' দেশের বন্ধু যে আর কেহ বা কিছু হইতে পারে না, তাহা কাহারও বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থের ন্যায় উদার ও নিঃস্বার্থ সাহায্য-সহচর মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। জীবনের যে কোনো কার্য্যে বা চেষ্টায়, জ্ঞানের যে কোনো পথে গ্রন্থের মত বন্ধু আমার কল্পনায় আসে না। কি কার্য্যকরী শক্তি, কি মনোরঞ্জিনী বিদ্যা, কি জ্ঞানান্বেষিণী বুদ্ধি—যাবতীয় চিত্তবৃত্তির অনুশীলন ও উন্মেষকল্পে

গ্রন্থাগারই সর্বাপেক্ষা সহজ, সুলভ ও সুখদ সহায়ক। সে শরণ্যের সেবাকল্পে কৈতববাদের প্রয়োজন নাই, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া মিথ্যার আরাধনা করিতে হয় না। পরিবার প্রতিপালনের মত ইহার আহার পরিচ্ছদের ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। অথচ সস্নেহ কৃতজ্ঞতার অন্যথা নাই। সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং পরিপালনং। সাধারণ বন্ধুর মত ইহার পরিপালন দুষ্কর নহে। কথায় কথায় ইহারা মুখভার করে না, বৈরাচরণ করে না। আবার প্রজাপালনের বা ছাত্রপালনের মত ইহার পরিচর্য্যা সুকঠিন নহে। নিন্দা বিদ্বেষ বা বিদ্রোহ ইহার ইচ্ছাতীত ও সাধ্যাতীত। যেখানে যখন যেমন ভাবে রাখ, তেম্‌নি পড়িয়া থাকে, চিৎকার করিয়া উৎপাত করে না ; অবসর মত' যখনই কোলে তুলিয়া লও, তখনি নিরভিমানচিত্তে হাসিয়া আনন্দের পসরা খুলিয়া বসে। এমন বন্ধু আর কোথায় মিলিবে ?

যে যে-কোনো বিষয়ে জগতে অনুশীলন আকাঙ্ক্ষা করে, সেই সম্বন্ধেই প্রধান সাহায্য এই পুস্তক হইতে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আনন্দে উৎসবে, এমন কি ব্যসনে পর্য্যন্ত ইহার অকপট ও অকুন্ঠিত সাহায্য। How to peel potatos and oranges হইতে Guide to Auctin Bridge শ্রেণীর পুস্তকেরও অসদ্ভাব নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ নাই করিলাম। এই সমাজনীতির প্রসঙ্গে আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নতির অবদান সোভিয়েট রাশিয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল। সেখানে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্মচেষ্টায় বিশেষতঃ পাঠাগারের সাহায্যে যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, আমাদের মত বিদেশী শাসিত অনভিজ্ঞ দেশে তাহা কল্পনাতীত। ইংরেজ ১৭০ বৎসর কাল ভারত শাসন করিয়া যে নামসহি করিবার মত শিক্ষাদানকেও শতকরা ছয়জনের উর্দ্ধে তুলিতে পারেন নাই, সেখান মাত্র পনেরো বৎসরের অনধিককাল মধ্যে তাহাই শতকরা ৭৮এ দাঁড়াইয়াছে, শুনিয়াছি। এমন পল্লীও তথায় আছে, যেখানে নিরক্ষর নাই। এই আত্মোৎকর্ষ ও উন্নতির মূল হইতেছে আত্মবোধ এবং ইহার প্রধান উপায় পাঠাগার। তথাকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের অপূর্ব প্রচেষ্টা দেখিলে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় নির্বাক্ হইতে হয়। যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ লেনিনের পত্নী তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে শিক্ষা বিস্তারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। লেনিনের মৃত্যুর পর Congress of Soviets-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, Do not pay external respect to Lenin's personality Do not build statues in his memory.

He cared for none of these things in his life. Remember there is much poverty and ruin in this country. If you want to honour the name of Lenin, build Children's homes, Kindergartens Schools, Libraries & Colleges. তাঁহার নির্দেশ মত' মস্কো নগরে লেনিনের নামে বিরাট পাঠাগার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে ১৮ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি আশি লক্ষ পুস্তক ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ পাঠাগারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

তথাকার অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা আমাদের দেশেরই মত' ছিল, হয়ত বা বেশীই ছিল কিন্তু নব-প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ও অকাতর অর্থ ব্যয়ে অতি অল্পকাল মধ্যেই যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। ঐ অর্থ ব্যয়ের যে তালিকা দিতেছি তাহা হইতেই এই উন্নতির প্রচেষ্টার পরিচয় পাইবেন। য়ুক্রেন প্রদেশের জন্য একশত কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, অতি-ককেশীয় প্রদেশের জন্য সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকা, উজবেকিস্থানে প্রায় চব্বিশ কোটি টাকা, তুর্কমেনিস্থানে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আর আমাদের বাংলার মত এত বড় দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকল্পে মোটে দুই কোটি টাকাও মিলে না! তথাকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপকরণই হইতেছে পাঠাগার। উচ্চশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কোনও তুচ্ছ ব্যবসায় বা বিষয় নাই, যাহার সম্বন্ধে শিক্ষিতব্য পুস্তক ঐ সকল পাঠাগারে নাই! স্থায়ী পাঠাগার ভিন্ন গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞান বিস্তারের জন্য চলন্ত পাঠাগারের সংখ্যাও এক্ষণে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছিয়াছে। আত্মবোধ ও আত্মনির্ভরতাই এই সকল অনুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা। গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া এই সকল গুরুভার আমাদেরই মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। তাই আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। আপনারা ঠিক পথই ধরিয়াছেন।

পাঠাগার সেই বিপুল জ্ঞানায়তন, যেখান হইতে মানুষ অতি সহজে তাহার দেহ-মন-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারে। বিদ্যালয়ে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে জ্ঞান অনাবশ্যক আড়ম্বরের সহিত চিৎকার করিয়া ও অপরিমিত ব্যয় বাহুল্য করাইয়া দান করিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র, অতি অল্প আয়াসে ও ব্যয়ে পাঠাগারে সেই জ্ঞান অধিকতর সফলতা ও সার্থকতার সহিত প্রাপ্ত হইবার সুযোগ আছে। কারলাইলের ভাষায় বলিতে পারি 'A true University in these days is a collection of books'. H. G. Wells এর মত' চিন্তাশীল মনীষীর

ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—Now that the frank recognition of books, not lectures, as the basis of Education opens up a new and vast possibility in matters of Education, there need not now be any servitude to place or time. উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য it is no longer necessary to go to a particular room at a particular hour to hear a particular professor,—এ কথা আর আজকাল বড় মিথ্যা বলিতে পারি না, কারণ শিক্ষালাভের জন্য প্রাচীনকালের গুরুগৃহাচরিত সেই নিষ্ঠা, চারিত্রশিক্ষা ও আদর্শানুসরণ যখন আজ অন্তর্হিত, পরস্পরের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে অপগত, ত্যাগের কৃচ্ছসাধন, ভূমার অনুপ্রেরণা ও ধর্মের আনন্দময় অনুশাসন যখন অবমানিত, তখন শিক্ষালয়ের আধুনিক শিক্ষা অর্থব্যয়সাধ্য নিরর্থকতারই নামান্তর বলিয়া মনে হয়।

বস্তুতঃ সত্যকার জ্ঞান-তৃষ্ণা যাহার অন্তরগত, শিক্ষালয়ের শিক্ষার অপেক্ষা করা এ যুগে তাহার আর তত আবশ্যক নাই। পাঠাগারেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য সে পাঠাগারের গুরুত্ব, সৌষ্ঠব, শৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার মত শ্রী থাকা প্রয়োজন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকৃতিত্ব দেখিয়া ঐ শিক্ষা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, বিভিন্ন চিত্রের প্রতি চক্ষু সন্নিবেশ করিলে, তাঁহাদের সে ধারণা নিরাকৃত হইতে পারে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অল্পকাল মাত্র শিক্ষালয়ের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি ৭ নম্বরের জন্য বি এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া 'গ্রেসে' পাশ হইয়াছিলেন; তাঁহার বেশীর ভাগ পাঠ পাঠাগার হইতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও দেশ-বিশ্রুত সাহিত্যশিল্পী শরৎচন্দ্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন মাড়ান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অথচ তাঁহাদের মত তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা নিচয়ের সমালোচনা, চরিত্রবিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্ব বিচার লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম ডিগ্রিধারিদিগের মধ্যে Thesis লিখিবার কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের বা অমৃতলালের মত বিখ্যাত নাট্যকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন; তাঁহাদের শিক্ষাও পাঠাগার হইতে। পাঠাগারের ছাত্র অমৃতলালকে বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। আর গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধ্যায় পদেরই সৃষ্টি হইয়াছে। গিরীশচন্দ্রের প্রফুল্ল ও দীনবন্ধুর নীলদর্পণ এম-এর পাঠ্য এবং গিরীশচন্দ্রের উপর Thesis লিখিয়া উচ্চতর ডিগ্রীলাভও সম্ভব হইয়াছে।

কেবল সাহিত্য বিভাগ কেন, অন্যান্য বড় বড় বিভাগের দিক্‌পাল যাঁরা, তাঁহার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ধার ধারিতেন না। কেহ কেহ নাকি দ্বারস্থ পর্য্যন্ত হন নাই। ধর্ম্মপ্রচার ও বাগ্মিতা বিষয়ে কেশব সেন ও প্রতাপ মজুমদারের মত মনীষী, সাংবাদিক সাহিত্যে হরিশ মুখুজ্যে, কৃষ্ণদাস পাল, শিশির ঘোষ ও মতিলাল প্রভৃতি মনস্বী সুধীগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী নহেন।

এদেশের কথা, ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, 'জনসনের' মত বিরাট বিশ্বপণ্ডিত, গিবনের মত দিক্‌বিজয়ী ঐতিহাসিক, মনীষী কারলাইলের মত জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিও পাঠাগারের সাহায্যেই তাহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পূর্ণ করিয়া জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। Wells সত্যই বলিয়াছেন—The young man who reads in luxurious rooms at 11 P .M. in Cambridge does not necessarily know more than the young man who reads in a garret of Glassgow, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী Ramsay Mackdonald-এর শিক্ষাও স্কুল কলেজ হইতে প্রাপ্ত নয়।

এই সকল উদাহরণ হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় যে, বিদ্যালয়ই বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র উপায় নহে। পূর্ব্বে যে সকল প্রথম শ্রেণীর মণীষীর নাম করিয়াছি, তাঁহারা কেবলমাত্র প্রতিভার অধিকারী নহেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরও অধিকারী এবং পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও গবেষণা তাঁহারা পাঠাগারের সাহায্যে অর্জন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে কারালাইলের ভাষায় পুনরায় বলিতে ইচ্ছা করে—The true University in these days is a collection of books. বরং এই প্রসঙ্গে আমার এমন কথাও মনে হয়, যাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। তাহা এই যে, বিদ্যালয়ের অপেক্ষা পাঠাগারই যেন মানবের জ্ঞানার্থিনী শিক্ষা ও চিত্তবিকাশের পক্ষে সমধিক উপযোগী। শিক্ষালয়ের শিক্ষার পশ্চাতে যে ব্যক্তি থাকে, অনেক সময় দেখা যায়, সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মনোবৃত্তির স্বাধীন পরিস্ফুরণ ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মত আসিয়া সত্য বিচারের পথ অবরোধ করে; মানুষ আসিয়া দৃষ্টি ও কল্পনার প্রসার রুদ্ধ করিয়া দেয়। এবং যেক্ষেত্রে তাহা ঘটে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা সেখানে সহজ উদারতার পথ এমনি করিয়া অর্গলবদ্ধ করে যে, পরবর্ত্তী জীবনে শত চেষ্টাতেও তাহা মুক্ত হয় না। First impression lasts longest.—বলিয়া তরলমতি শিক্ষার্থীর পক্ষে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের বাধা অনতিক্রমণীয় অন্তরায় স্বরূপ বিচারবুদ্ধির ভবিষ্যৎ

নষ্ট করিয়া দেয়। অপর পক্ষে উন্মুক্ত আব্‌হাওয়া ও পারিপার্শ্বিক উদার অসাম্প্রদায়িকতা স্বাধীন সতেজ চিত্ত-বিকাশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল। অবশ্য সব সময়েই যে ইহা ঘটে, তাহা বলি না। কোনো কোনো স্থলে সমুদায় ব্যক্তিত্বের সহায়তায় শিক্ষার্থীর পন্থা সুগম ও সম্প্রসারিত হয়। এই সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে বলিয়া রাখিতে চাই যে, বিষয় নির্ব্বাচন ও গ্রন্থনির্ণয় পাঠাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও প্রধান দ্রষ্টব্য। পাঠাগারের পরিচালনমণ্ডলী সেজন্য স্থির লক্ষ্য সুসংযত ও দায়িত্ববান না হইলে চলিবে না। সন্তানের মঙ্গলকল্পে বিবেচনাশীল অভিভাবকের দৃষ্টি যে প্রকার প্রখর ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, এক্ষেত্রেও তেমনি। শিক্ষার সহিত আনন্দবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই কিন্তু সে আনন্দ উদার ও বিশুদ্ধ রসের আনন্দ। ঐ রস পরিবেশনে তুচ্ছতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা আপাতমধুর উৎপাতের উপকরণ আসিয়া না জুটে। যে শ্রেণীর নরনারী পাঠাগার হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করেন, তাঁহাদের জীবন সংগ্রাম দিন দিন সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রাম আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে, পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতা যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা একেবারে বিধ্বস্ত ও নির্ম্মূল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সংগ্রাম মাত্রেই যোদ্ধার পক্ষে আত্মসংযম এবং আত্মশাসনের প্রয়োজন। ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে বাঙ্গলাদেশে আজকাল এমন এক শ্রেণীর উৎকট সাহিত্যের সরবরাহ হইতেছে, যাহা পূর্বতন রীতির শাসন সংযমের একেবারে বিরোধী। এই জাতীয় দুঃসময়ের দিনে এই দুষ্ট সাহিত্য বর্জন না করিলে বিশদ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইবে। আরো বিপদ এই যে, এই সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া নারীপ্রগতির যে ধুয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইতে হয়। কবিরাজী গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে, দুর্ব্বলে সবলা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।' রলয়োরভেদঃ বা রড়য়োরভেদঃ সূত্র মানিতে হইলে, এই সর্বপ্রকারে দুর্বল বাঙ্গালীজাতির পক্ষে পক্ষে হয়ত সা নারী প্রাণঘাতিকা হইতেও পারে। অন্ততঃ দেশে সেই প্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গৃহস্থ সংসারে যৎকিঞ্চিৎ যে সুখশান্তি অবশিষ্ট ছিল, চারিদিক হইতে তাহারই ধ্বংসের আয়োজন চলিতেছে!

দেশবন্ধু পাঠাগারে অবশ্যই ইংরেজী পুস্তকও রক্ষিত হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধে সমগ্র মানব সমাজের যে ভিত্তি ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহারি সংস্কারকল্পে ইউরোপে রাষ্ট্র এবং সমাজ পুনর্গঠিত করিবার নানাপ্রকার পরীক্ষা (Experiment) চলিতেছে। সংবাদ পত্রে নিত্যই দেখিতে পাইতেছেন—

রাশিয়ায়, ইটালিতে, জার্ম্মানীতে এবং অন্যান্য দেশে কিরূপ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। এসিয়া খণ্ডেও তুর্কীতে, পারস্তে, আরবে, চীনে কম Experiment চলিতেছে না। যে সাহিত্যে এই সকল Experiment-এর বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার অনুশীলন এক্ষণে অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। এই Experiment আমাদের দেশেও চলিতেছে। কিন্তু দেশের লোকের ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব না বুঝিয়া Experiment করিতে গেলে, তাহা যে শুধু বিফল হইবে, তাহা নয়, তাহা কুফল উৎপাদন করিতেও পারে। সুতরাং সর্ব্বাদৌ দেশের লোকের ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে রসতত্ত্বের আলোচনা পরেও হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমি অল্পাধিক সম্পর্কিত হইলেও এই পাঠাগারই আমার আন্তরিক স্নেহশ্রদ্ধার পরম কাম্য বস্তু। উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় আর কয় স্থানে স্থাপিত হইতে পারে? কিন্তু পাঠাগার ও তাহার সুনিয়ন্ত্রিত সম্প্রসার সুদূর পল্লীতেও অসম্ভব নহে। কেবল কয়েকটি উৎসাহশীল প্রাণবান ছাত্রের প্রয়োজন মাত্র। এই পাঠাগারের কল্পনা আমার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রৌঢ়ত্বের সাধনা। গৃহসজ্জা হিসাবেও টেবিল চেয়ার আয়না কৌচ কার্পেট, যতই ভাল হউক, আমাকে কদাপি তত মুগ্ধ করেনা, গৃহসন্নিবিষ্ট ভদ্র একটি পাঠাগার যত। কত দেশদেশান্তরের কত যুগযুগান্তরের বার্তা, চিরন্তন মানব-মনের কত কীর্ত্তি কত কল্পনাই না ঐ স্বল্প পরিসরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া বাঙ্ময়ী বাণীপ্রতিমা রূপে তথায় মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে! ভালো একটি পাঠাগারের কল্পনাতেও কি আনন্দ! ঐ যে শুভ্রশীর্ষ ব্যাসবাল্মীকি একাসনে পাশাপাশি বসিয়া পক্ককেশ ভার্জিল হোমারের সহিত পরমানন্দে এই পাঠাগার মধ্যে বাক্যালাপ করিতেছেন, দেখিতেছি। তাহারি অদূরে Shakespeare কালিদাসের একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চিত্র ও চরিত্র লইয়া তন্ময়চিত্তে আলোচনায় ব্যস্ত! কোনো-দিকে চাহিবার অবকাশ নাই! তাহারি অদূরে পৃথগাসনে বসিয়া মহর্ষি গৌতম বৃদ্ধ কোমতের একেবারে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছেন! ব্রহ্মবিদ্যাবলে বিধর্ম্মীসংস্পর্শে জাতি যাইবার ভয় করিতেছেন না! Aristotle পতঞ্জলির করমর্দ্দন করিতেছেন! সবই বিচিত্র এখানে! রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রসালাপ চলিতেছে! ওধারে বঙ্কিমের সহিত Victor Hugoর নমস্কার প্রতি নমস্কার চলিতেছে! কক্ষে Ronsseauর সহিত Karl marx! Lenin-এর সঙ্গে অথর্ব্ব বেদের মন্ত্রদ্রষ্টার কি গোপন পরামর্শ চলিতেছে? ওদিকে Byron ও ওমর খৈয়মে হাসাহাসি

করিতেছেন! ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, খ্রীষ্টের পাশে বুদ্ধ চৈতন্য মানবের দুঃখের দিকে তাকাইয়া নীরবে অশ্রু গোপন করিতেছেন!—নিম্নে আবার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক আধুনিকের দল! কত দেশবিদেশ হইতে সমাগত হইয়া এই পাঠাগার কক্ষমধ্যে মিলিত হইয়াছেন। কি বিচিত্র তাঁদের প্রতিভা, কি বিচিত্র তাঁদের দৃষ্টি! এই যে মিলন—এই যে অপূর্ব অপরূপ শুভ-সম্মিলন, ইহা আর কোথায় সম্ভব হইতে পারে, ঐ পাঠাগার ছাড়া? বিশ্ববরেণ্য প্রতিভার এই যে বৈঠক জগতের কোন্ মহামহিম সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তী কবে কোথায় বসাইতে পারিয়াছেন? ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত পুণ্যপ্রয়াগ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ এই পবিত্র তীর্থসঙ্গম এই পাঠাগার ভিন্ন কে কবে কোথায় দেখিয়া জীবনমন সার্থক করিতে পারিয়াছে? একমাত্র পাঠাগারই সেই বিশ্ববৈঠক, পাঠাগারই সেই মহাতীর্থ-সম্মিলনী। শুনিয়াছি, উত্তর দক্ষিণের মুখ দেখেনা, পূর্ব্ব পশ্চিমে কখনো মিলতে পারিবে না! শুনিয়াছি, অতীতের বর্ত্তমানের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সমুদ্র, কেহ কাহারো সাক্ষাৎ পায়না! কিন্তু পাঠাগারেই সেতুবন্ধ হইয়াছে এবং সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে!

সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি অখিল জ্ঞান-ভাণ্ডার এই পাঠাগারের মধ্যে। জ্ঞানান্বেষী, কর্ম্মান্বেষী! সাবধানে শ্রদ্ধানত অন্তঃকরণে উহারই সাহায্যে মানবজন্ম সার্থক কর এবং সকল জ্ঞানের সকল কর্ম্মের সকল বিশ্বের যিনি পরমেশ্বর, তোমার অসীম পাঠাগারের কেন্দ্রে বসিয়া সেই অসীমের সহিত শুভসমন্বয় স্থাপন কর। দেখিবে, দেহমনের সকল সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে, ভৌগোলিক সীমারেখার কথা ভুলিয়া গিয়াছ, আত্মপরের বেড়া ডিঙাইয়া আত্মার আলোকে অনুভূতির সাহায্যে যে লোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, সেখানে "তিনি আর তুমি, মাঝে কেহ নাই, বাধা দিতে বাধা পেতে!"

গ্রন্থাগারের সংস্কার

মুনীন্দ্র দেব রায়

● অতীত ও বর্ত্তমান

অতীত কালের গ্রন্থাগারের সঙ্গে বর্তমান যুগের গ্রন্থাগারের পার্থক্য অনেক। সেকালে পুস্তকের সংখ্যা অধিক ছিল না, পাঠকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। নানা কারণে সেকালে সকলকে পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার দেওয়া হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন ছাপাখানার দৌলতে যে কোনও দেশেই পুস্তকের সংখ্যা অপরিমিত—পুস্তক পাঠে আজ কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। বরং অধিকতর সংখ্যক লোককে যাহাতে পুস্তক পাঠ করিতে প্ররোচিত করা যায়, গ্রন্থাগার সমূহ যাহাতে ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে তাহাই এখন প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।

সুতরাং আজ গ্রন্থাগারকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধারণের সেবা করিতে না পারিলে কোনও প্রতিষ্ঠানই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেবা করিবার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বুদ্ধি। নিজের যাহা নাই তাহা অপরকে দেওয়া যায় না। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দাতা ও গ্রহীতার তুলনা চলিতে পারে। এখানে গ্রহীতা পাঠক, দাতা গ্রন্থাগারিকের দেয় গ্রন্থ। দিবার জন্য গ্রন্থাগারিকের যদি গ্রন্থই না থাকে তবে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইতে পারে না। তবে এ সম্বন্ধে অসুবিধা অনেক। বর্ত্তমানে পুস্তকের সংখ্যা অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিক সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা কোনও গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই সম্ভব নহে।

● গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

পুস্তকের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উহাদের ঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা এবং পাঠকের মধ্যে উহার বিতরণ করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করা, উহা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা, শ্রেণী বিভাগ করা ইত্যাদি কার্য্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন করা সহজ নহে। অন্যান্য যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের মতই ইহাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

এইরূপ দুরবস্থা ও অব্যবস্থার জন্যই এ দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন তেমন প্রসার

লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আর শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। এই আন্দোলনের প্রচার ও সাফল্যের জন্য সকলেরই এখন অবহিত হওয়া কর্তব্য। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এ দেশের সর্বত্র সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ যদি সকল সহর ও গ্রামেই এক একটি করিয়া গ্রন্থাগার বা পাঠকেন্দ্র স্থাপন করেন, তবে তাহার দ্বারা সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। বস্তুতঃ দেশের সর্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কালে এই সমস্ত গ্রন্থাগার সংস্কৃতির এক একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে। ইহারা পল্লী ও সহরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবকদিগকে প্রত্যহ একত্র মিলিত হইবার সুবিধা, জাতি গঠনের সহায়তা করিবে এবং ইহাদেরই প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার হইতে থাকিবে। আমি আশা করি যে, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ আমার এই কথা কয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

● দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য

কেমন করিয়া আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে, তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহার প্রসারের পথে যে সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এ আন্দোলনের প্রধান বিঘ্ন—দেশবাসীর অজ্ঞতা ; এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য, জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য আমাদিগকে দেশব্যাপী প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

● অতি সতর্কতার কুফল

আর এক বাধা গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের অতীব সতর্কতা। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে পুস্তক হারাইয়া যাইবার আশঙ্কায় কাহাকেও উহা বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। অনেক গ্রন্থাগারে কোনও কোনও পুস্তক কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হয় না, এইরূপ অতিরিক্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার ফলে পাঠকগণ গ্রন্থাগারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন এবং অনেক পুস্তকই আলমারীর মধ্যে অব্যবহৃত ও অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাতে গ্রন্থাগারের যাহা প্রধান

উদ্দেশ্য তাহাই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে কর্মকর্তাদিগকে এইরূপ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে, গ্রন্থাগার স্থাপনা করিবার সময়ে অনেকেই তৎপ্রতি উৎসাহী থাকিলেও কালক্রমে একে একে প্রায় সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া যান এবং একা সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিকের উপরই সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইহাও আন্দোলনের উন্নতির পরিপন্থী; ইহার ফলে গ্রন্থাগার সমূহ জন সমাজের সংশ্রবহীন নিষ্প্রাণ পুস্তক-সংগ্রহ হইয়া উঠে। এ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে সকলকেই ইহার উন্নতি সম্বন্ধে সর্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

● আইনের আবশ্যকতা

অন্যান্য বিষয়ের মত গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও আইন প্রণয়ণের প্রয়োজন আছে বাঙ্গলায়। আমি এইরূপ একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু সরকারের সম্মতি না পাওয়ায় উহা ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক সুখের কথা এই যে, বাঙ্গলায় আমরা স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন সমূহের পরিবর্তন সাধন করিয়া ঐ জাতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রন্থাগার সমূহকে অর্থ-সাহায্য করা আইনসঙ্গত করিতে পারিয়াছি।

● ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

দুঃখের বিষয়, ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এই আন্দোলনের প্রসারকল্পে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি যদি পরস্পরকে পুস্তক ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রন্থাগার উপকৃত হয়। আশা করি যে, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষগণ অচিরে অবহিত হইবেন। গ্রন্থাগার সমূহের আর একটি কর্তব্য শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া রাখা।

* * *

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের উপরই দেশের শিক্ষা বিস্তার বহুল পরিমানে নির্ভর করে। আমি গ্রন্থাগারকে সত্য সত্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া

মনে করি। গ্রন্থাগার উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে এখানেই ছোটবড়, ধনী-নির্ধন সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় সাধন করিতে পারে এবং উহার সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়াই আমাদের দেশের অজ্ঞতা দূর হইবে। সকল শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হইবে। জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

এই উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র ; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আপনারা সমবেতভাবে চেষ্টা করিবেন—ইহাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

হরিহর শেঠ

মানুষের জ্ঞানার্জ্জন, বিদ্যা সাধনা, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির দ্বারা উৎকর্ষ লাভের জন্য যে কয়টী মার্গ আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহার মধ্যে গ্রন্থই সর্বপ্রধান। পৃথিবীর আদিকাল হইতে না হউক, মানব সভ্যতার বিকাশের পর যখন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষা ও অক্ষরের প্রবর্তন হয় নাই, ছবি আঁকিয়া মানুষ যখন মনোভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে যদি ভাষা আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বহু প্রাচীন কাল হইতেই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে গ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায় আদিমকালে অবশ্য ঠিক তাহা ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও ভাষা ও অক্ষরের একটা বাঁধা অবস্থা না থাকিলেও, মনোভাব প্রকাশের জন্য পাথর অথবা মৃত্তিকা টালির উপর জীবজন্তু বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছবি আঁকিয়া গ্রন্থরচনার পদ্ধতি তখনকার যুগেও ছিল। এবং এইরূপ প্রস্তর ও মৃত্তিকা অঙ্কিত টালিগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সেকালে পাথুরে গ্রন্থাগার সৃজিত হইত। লেখার জন্য তালপাতা ও ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার তাহার অনেক পরে প্রচলিত হয়। তখনকার রাজারা উক্ত গ্রন্থাগার সমূহের পৃষ্ঠপোষক থাকিলেও সাধারণতঃ পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণই উহার রক্ষক ছিলেন এবং উহার সহায়তায় নিজের জ্ঞানার্জ্জনের সহিত লোকশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও আয়াসের ফলে প্রাচীনকালের এইরূপ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেয়ার্ড (Layard) নামক এক ব্যক্তি নিনিভা নগর খনন করিতে মৃত্তিকা নিম্নে একটী প্রকাণ্ড কক্ষ মধ্যে প্রায় দশ হাজার খানি এক ইঞ্চি হইতে এক ফুট আকারের পাথরে অঙ্কিত টালি প্রাপ্ত হন। তৎকালে বিশেষজ্ঞ-গণ অনুমান করিয়াছিলেন, তথায় আরও বিশ হাজার খানি ঐরূপ লিখিত প্রস্তর মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত থাকিতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন উহা এসিরিয়ার অস্থুর-বাণী-পাল্ (assar-bani-pal) রাজার সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এসিরিয়ার অপেক্ষাও পুরাতন লাইব্রেরী ছিল ব্যাবিলনে। মিশরেও অতি প্রাচীনকালে যখন সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড্‌গুলি পৃথিবীর আশ্চর্য্যরূপে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ চিত্রাক্ষর লিপিপূর্ণ পাথুরে লাইব্রেরীর অস্তিত্বের নিদর্শন আছে। সে অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। মিশরে শুধু মন্দিরে নয় রাজাদের কবর স্থানেও গ্রন্থ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্বচতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ওসিম্যাণ্ডাস্ (Osymandyas) নামক রাজার রাজত্ব কালে তথায় সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। এ সব গ্রন্থ কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ পাই নাই। ভূমধ্য সাগরের উত্তর দিকস্থ দেশ সমূহেই প্রথম কথ্যভাষা অক্ষরে লিখিয়া প্রকাশের প্রবর্ত্তন হয়। কথিত আছে তথাকার চ্যালডিয়ন্ ভাষাই প্রথম লিখন পঠনের ভাষা। উহা চিত্রাক্ষরলিপির যুগের কত পরে তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ।

প্রাচীন গ্রীসেও বড় বড় পুস্তকাগারের কথা জানা যায়। কথিত আছে পিসিস্‌ট্রেটস্ (Pisistratus) নামক এক ব্যক্তি কথায় প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটো, এরিসটল্, ইউক্লিডেরও পুস্তকাগার ছিল। রোমের সমৃদ্ধিকালে সেখানেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। তথায় সাধারণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরী অনেকগুলি ছিল। কথিত আছে আগষ্টস্ সর্ব্ব প্রথম সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার স্থাপিত করেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের গৌরব-ময় যুগে তথায় কতিপয় বড় পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে কোন কোনটিতে লক্ষাধিক পুঁথি সংগ্রহ ছিল। রোম সাম্রাজ্য পতনের পরও পোপেরাও বড় বড় লাইব্রেরী করিয়াছিলেন। তখন তথাকার বৃহৎ বৃহৎ মঠে কতিপয় বিরাট গ্রন্থশালার কথা জানা যায়। পুস্তকাগার হইতে বাড়ীতে বই লইয়া যাইবার ব্যবস্থা তথায় সেই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। এলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রাচীন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে প্রধান পুস্তকাগারটিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রন্থের সমাবেশ ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সেনাপতি টলেসিই ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় "টেপিরাস্" নামক এক প্রকার বৃক্ষের ত্বকে লেখা হইত।

প্রাচ্যদেশ সমূহের মধ্যে চীন দেশে গ্রন্থের আদর খুব বেশী ছিল। সেখানে পাঠের তীব্র অনুরাগই শুধু তাহার কারণ নহে। পুস্তক সংগ্রহ ও রক্ষণের সহিত সেখানে ধর্ম্মের সম্পর্ক বিবেচিত হইত, এজন্য অনেক নিরক্ষর লোককেও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে দেখা যাইত। তদ্ভিন্ন চীনবাসীরা কাব্য সাহিত্যেরও আদর জানিত।

অতি প্রাচীনকালে সেখানে সাধারণ পুস্তকাগার বোধ হয় ছিল না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক রাজা ও সমৃদ্ধিশালী লোকেদের নিজস্ব গ্রন্থালয় ছিল। চীনেরাও দেবমন্দিরে পর্ব্বত গুহায় গ্রন্থ রক্ষা করিত। শত্রু ভয়ে তাহারা গুহামুখ পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত।

চীনরা শুধু তাহাদের দেশীয় ভাষাতেই যে অনুরাগী ছিল তাহা নহে, তাহারা সাগ্রহে হিন্দুদের সাহিত্য শিক্ষা করিত। সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য উৎসুক ছিল। সেখানে লোয়াভনামক স্থানের বিহারেই এই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হান্‌দের রাজত্বকালেই চীনে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখনও চীন দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় হিন্দুধর্মের যে সকল পুঁথি আছে, সম্ভবতঃ সে সমস্তই হান্ রাজাদের রাজত্বকালে হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদে চীনভাষা যে বিশেষ রূপে রচনা হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীনে রাজধানী "কিয়েন্ রে" নামক স্থানটি তৎকালে হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। কথিত আছে ধর্মকল নামক এক হিন্দু হিন্দুস্থান হইতে হান্‌দের সময়ে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া চীনে লইয়া যান।

চীনে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিলে প্রায় এক শত ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনুবাদকদিগের মধ্যে "চা-চিয়েন্" নামক একজন জৈন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎপ্রণীত "অবদান শতেক "মাতঙ্গীসূত্র" "সুখাবতী" বা "অমিতায়ু" নামক পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কুমারজীব নামক যে কোন একজন অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় তিনি হিন্দু সন্তান ছিলেন। বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রিত্ব করাই তাঁহাদের পেশা ছিল। তিনিই অনুবাদকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং এখনও চীন দেশে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

অতি পুরাকালের গ্রন্থালয় সমূহের বিস্তৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সহজ নহে। পণ্ডিতেরা এ বিষয় গবেষণা দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়া গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। তাঁহাদের লেখা হইতে জানা যায় যে অতি আদিম যুগ হইতেই গ্রন্থাগারের আদর ছিল। যখন শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থিত কোন বিদ্যায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না, তখন তদানিন্তন কালের উপযোগী গ্রন্থ প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই বিদ্যমান ছিল এবং উহাই তখন শিক্ষা

বিস্তারের অন্যতম প্রধান পথ ছিল। সুতরাং গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও স্থান বিদ্যালয়ের পূর্বে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থের সঙ্গে পাঠক সাধারণের নিবিড়ভাবে পরিচয় ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে মহিমামণ্ডিত হওয়ার অন্য সহজ পথ আর নাই। এই পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়াই পুস্তকাগারে প্রধান কাজ। ব্যবসায় জগতে নূতন পণ্য প্রচলনের জন্য যেমন উহার বাজার অর্থাৎ চাহিদা সৃষ্টি করার দরকার হয়, ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কোন পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ পুস্তকাগারের দ্বারা পাঠককে খুশি করা যায়, সাধারণের পাঠেচ্ছা উদ্দীপিত করা যায়। এ সবের জন্য পুস্তকাগারের গ্রন্থরক্ষক বা লাইব্রেরিয়ানের যোগ্যতাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাঁহার কর্তব্য তাঁহার দায়িত্ব খুব বেশী। তাঁহাকে একথা স্পষ্ট করিয়া মনে রাখিতে হইবে, যে পুস্তকাগার মাত্র একটি গ্রন্থ-প্রদর্শনী নয়, যেখানে শুধু নানাদেশের নানা ভাষার গ্রন্থকারদের বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থরাজি সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত ভাবে থাকিলেই চলিতে পারে। শুধু গ্রন্থরক্ষণ ও গ্রাহকদিগের প্রার্থনা মত উহা বিতরণ করিলেই তাঁহার কাজ শেষ হয় না। কোন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন পুস্তকাগার লোকান্তরিত গ্রন্থকারদের কবরস্থানও নহে। ইহার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ পুস্তকাগার কর্তৃপক্ষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ। আবশ্যকীয় এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল পাঠের স্পৃহা যাহাতে পাঠকদের চিত্তে আনিয়া দিতে পারা যায়, সে বিষয় গ্রন্থরক্ষকের সর্ব্বদা যত্নবান থাকা উচিত এবং ইহা তাঁহার কর্ত্তব্যের অন্যতম প্রধান কার্য্য তাহা মনে রাখতে হইবে।

আমাদের এ গরীব দেশে বড় লাইব্রেরি খুবই কম। সরকারি তত্ত্বাবধানে যে কয়টী বড় সাধারণ লাইব্রেরি দেখা যায়, সেখানে অবশ্য উচ্চবেতনে যোগ্য লাইব্রেরিয়ান্ নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের নগর ও পল্লীগুলির মধ্যে অধুনা পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠার একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে কয়েকটী সাধারণ পুস্তকাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় কতিপয় যুবকের দ্বারা গঠিত এক একটী অবৈতনিক সমিতি সাহায্যে এই সকল পরিচালিত হইয়া থাকে। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি এই শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই উহারা সৃষ্ট হইলেও, সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থাভাব বশতঃ আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা, যে সকল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লাইব্রেরি আছে, দেখা যায় তন্মধ্যেও অনেকগুলিতে বাহ্যিক আড়ম্বর, এমন কি পুস্তক সংগ্রহ গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত প্রভৃতিতেও যত্ন আছে, ধুমধামের

সহিত বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কি করিলে পাঠক সাধারণের যথার্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়, তাহাদের যথার্থ জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ হয় সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব।

যোগ্য লাইব্রেরিয়ান্ খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়, এই কার্য্যের ভার প্রায় সাধারণতঃ কর্মহীন কোন একটী যুবকের অপর অবৈতনিকভাবে ন্যস্ত থাকে। তিনি যথা সময়ে পুস্তকাগারে আসেন, সন্ধ্যার সময় গ্রাহকগণ আসেন; উপন্যাস, নাটক, ডিটেক্টিভের গল্প, যে যাহা চায় থাকে ত দেয়, না থাকিলে অন্য একখানি ঐরূপ যাহা সম্মুখে পায় তাহা দিয়া তাহাকে বিদায় দেয়। ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মাত্রা। ইহার অধিক কিছু করিবার আছে এ শিক্ষা তাঁহারা কোনদিনই পান না। একাজের শিখিবার যে বিশেষ কিছু আছে ইহা তাহাদের ধারণার অতীত।

লাইব্রেরিয়ানের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ আদৌ মনোযোগী নন। হয়ত শিক্ষিত সভ্যদের নিজেদের মধ্য হইতে যোগ্যতা দেখিয়া একজনকে বাছিয়া লইয়া এ কার্য্যের ভার দিলে কতকটা ঠিকমত কার্য্য হওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু সে বিষয় তাঁহারা উদাসীন। আর পাশ্চাত্য দেশ সমূহে-লাইব্রেরীর কাজের জন্য রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন বিবেচিত হয়। ইহা তথাকার একটী শিক্ষনীয় বিষয়, এজন্য একটা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও আবশ্যক হয়। যেখানে সাধারণের শিক্ষার সম্পর্ক আছে সেখানে তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অবহিত থাকেন। সে সব দেশে সাধারণ লাইব্রেরী সংক্রান্ত কোন কোন আইনও আছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ইওয়ার্ট্ (Mr. Ewart) ইংলণ্ডে হাউস্ অব্ কমনস্এ প্রথম সাধারণ লাইব্রেরি আইন উপস্থাপিত করেন।

পুস্তকাগারের তালিকা-পুস্তক প্রণয়ন, উহার সংখ্যা করা, র‍্যাকে পুস্তক সজ্জিত করিবার ধারা, পুস্তক রক্ষা করিবার প্রণালী এসবও শিক্ষা সাপেক্ষ। এ সকল কথা আলোচনায় আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না। গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পুস্তকাগার সম্বন্ধে আলোচনা অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেবরায় বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতায় আপনারা এ বিষয় বহুজ্ঞাতব্য কথা শুনিয়াছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কতিপয় গ্রন্থাগারের কথার সহিত আমি এই প্রসঙ্গে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বিদ্যালয়ের সহিত পুস্তকাগারের সম্পর্ক অতি নিকট, সুতরাং প্রত্যেক

বিদ্যালয়ের সহিত তদোপযোগী একটী করিয়া পুস্তকাগার অঙ্গীভূত থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ বিদ্যলেয়ে যে শিক্ষার আরম্ভ, পুস্তকাগারে তাহার পরিসমাপ্তি একথা বলিতে না পারিলেও, এইখানেই তাহার উৎকর্ষময় পরিণতি লাভ হইতে পারে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের জন্য পুস্তকাগারের আবশ্যকতা অনিবার্য্য। এই জন্য প্রথম হইতেই কিশোর কিশোরীদের গ্রন্থাগারের সহিত পরিচয় সাধন করাইয়া দিবার জন্য শিক্ষক-মহাশয়দিগের যত্নবান হওয়া উচিত। দেশের সাহিত্যকে ছাড়িয়া দেশকে উন্নত করা যাইতে পারে না। সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে সাহিত্য-মন্দিরের উন্নতি করিতে হইবে। গ্রন্থাগার অগ্রে বিদ্যালয় পরে। যখন বিদ্যালয় এভাবে সৃষ্ট হয় নাই তখন এদেশে ব্রাহ্মণেরা শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্য সভ্য দেশসমূহেও মন্দিরের পুরোহিতদের উপর সে কার্য্যের ভার ছিল।

বিদ্যালয়ের সহিত পুস্তকাগারের প্রয়োজনীয়তা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই যে শুধু উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা নহে। পূর্ব্বেও মনীষীগণ তাহা বুঝিতেন, কারণ দেখা যায় প্রায় সকল প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্গত বড় বড় পুস্তকাগার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তখন অবশ্য ঠিক তাহা ছিল না। তখন স্থানে স্থানে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তাহাদের কথাই বলিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিই আশি নব্বই বৎসর পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে পরিষদ বলিতে যাহা বুঝাইত তাহাই কতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিত।

সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশীলা শিক্ষাকেন্দ্রের নাম সকলেই অবগত আছেন, তথায় এক বিরাট পুঁথিশালা বা গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। কথিত আছে এই স্থান হইতেই বৈয়াকরণ পানিনী এবং চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী পণ্ডিত চাণক্য বিদ্যার্জ্জনপূর্বক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। মগধের অন্তর্গত নালন্দা বিহার—যাহা তদানিন্তন যুগে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার সহিত যে গ্রন্থাগার ছিল তাহা প্রাচীন ভারতের গৌরব। তথাকার রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক নামক প্রধান প্রাসাদগুলির মধ্যে রত্নদধি নামক প্রধান প্রাসাদগুলির মধ্যে রত্নদধি নামক নয়তলা বিরাট ভবনটিতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন উহাই ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থালয় ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েনসাঙ অষ্টম শতাব্দীতে ভারত পর্যটনে আসিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তখন ধর্মপালের চেলা শীলাভদ্র তথাকার মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীধান্য কণ্ডক, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, শাক্য প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সহিতও বড় বড় পুঁথিশালা ছিল। তখন বৌদ্ধদের বিহারে বিহারে ও জৈনদের উপাশ্রয়গুলিতেই প্রায় পুঁথিশালা ছিল। মুসলমান অত্যাচারে কতিপয় বড় বড় গ্রন্থশালা বিনষ্ট হইয়াছিল। গোপাল বা লোকপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য যুগের ও বৌদ্ধ গ্রন্থে পরিপূর্ণ তদন্তপুরী বিহারের বিপুল পুস্তকাগারটি বক্তিয়ার ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা গোপালের পুত্র ধর্ম্মপালের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদিগের কেন্দ্র বিক্রমশীলা তাহার গৌরবের উচ্চ সীমায় উঠিয়া চারিশত বৎসরের পর মুসলমান বিজয়ের সহিত বিলুপ্ত হয়। বৈদিক হিন্দুদের পুনরুদ্বোধন কালে উত্তর ভারতের কনোজ ও কাশী প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কাশীতে এক সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন পুঁথিশালা ছিল। সেন রাজাদের সময়ে প্রথম মিথিলা ও পরে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই শেষোক্ত স্থানটি মুসলমান অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় এবং পরবর্তী কালে এই স্থান হইতেই রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যের মত মহাপণ্ডিত-গণের উদ্ভব হয়। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গেও গ্রন্থশালা ছিল। রাজা বল্লালসেনেরও পুস্তকাগার ছিল। বাঙ্গলার গৌরব জগদ্দল বিহারও কথিত আছে যবন উপদ্রবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নেপালের নিবার রাজারা দীর্ঘকাল হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেখানে মুসলমানদের দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত না হইলেও, যখন গোর্খারা নেপাল দখল করেন তখন তাহারা সংগৃহীত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিগুলি লুট করেন। এখনও সেখানে দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন পুঁথি পাওয়া যায় এবং বহুসংখ্যক তালপত্রে লিখিত পুঁথি সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদের রাজত্বকালে গুজরাট, তাঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানার রাজাদের ও ভারতের অন্যান্য প্রায় সকল রাজদরবারেই একটি করিয়া পুঁথিখানা ছিল এবং এখনও আছে। জয়পুরের প্রাচীন পুঁথিখানা একটি দ্রষ্টব্য সামগ্রী এবং বরোদার বর্তমান গ্রন্থশালা আধুনিক প্রাচ্যদেশের গ্রন্থালয়গুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষে অনেক হিন্দু গ্রন্থাগার বিধ্বস্ত হইলেও মুসলমান বাদসাহদের অনেকের গ্রন্থপ্রীতি ছিল এবং পুস্তকাগার রাখিতেন। দিল্লীর ইন্দ্র-প্রস্থস্থিত পুরাতন কেল্লাভ্যন্তরে বাদসাহ হুমায়ুনের গ্রন্থাগার আজিও জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সম্রাট প্রবরের গ্রন্থাগার প্রীতির পরিচয় দিতেছে। মুসলমান

বাদসাহেরা যে শুধু আরবী ও পারসী বই-ই রাখিতেন তাহা নহে হিন্দুদের বইও তাঁহারা সংগ্রহ করিতেন।

প্রতীচীর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহুদিন হইতেই একটি করিয়া সুবৃহৎ গ্রন্থশালা আছে। কেম্ব্রীজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালা পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ বড্লিয়েন্ লাইব্রেরি যদিও স্যার টমাস্ বড্লের (Sir Thomas Bodley) ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রথম সৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও বহুদিন হইতেই উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। আয়ারল্যাণ্ডের ট্রিনিটি কলেজ্ লাইব্রেরিও বড্লিয়েনের সমসাময়িক। ডেনমার্ক, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। নরওয়ে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই তথাকার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থাগার। অন্যান্য বিশিষ্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির মধ্যে ডার্টমাউথ্ কলেজ, কর্ণেল্, ইউনিভার্সিটি, আম্‌হার্ষ্ট কলেজ প্রভৃতির পুস্তকাগারগুলি প্রসিদ্ধ। আমেরিকায় এক যুক্তপ্রদেশেই স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কেবলমাত্র কলেজ্ লাইব্রেরির সংখ্যাই পঞ্চাশ ষাইট বৎসরের পূর্ব্বে তিন শতাধিক ছিল। অধুনা বোধ হয় উল্লেখযোগ্য এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই যাহার সহিত এক একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাগার না আছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এখন ভাল ভাল পুস্তকাগার আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে শিক্ষালয়ের সহিত পুস্তকাগার অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কিত। আমাদের বিদ্যালয় সমূহের সংশ্লিষ্ট পুস্তকাগারগুলির অবস্থা অধিকাংশ স্থানেই শোচনীয়। ইহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠাগারের সাহায্যে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ-স্পৃহা জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ছাড়াও নিয়মিত ভাবে যাহাতে পুস্তকাগার হইতে পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে সেজন্য বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীগুলিতে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনটা ঘণ্টা লাইব্রেরি ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় বলিয়া মনে করি। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারকে ছেলেমেয়েরা যাহাতে অবসর সাথী মনে করিতে পারে তাহাকে সেই ভাবে চিত্তাকর্ষক করিয়া গঠিত করা এবং যাহাতে অবাধে তথা হইতে পুস্তকাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাধারণ পুস্তকাগার বা পাঠাগারের সহিত বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের যে পার্থক্য থাকা উচিৎ তাহার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা একান্ত

আবশ্যক। শেষোক্ত পুস্তকাগারের বিশেষত্ব নষ্ট হইতে দিলে চলিবে না। এখানেও সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানাদির সহিত কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি স্থান পাইবে, কিন্তু যাহার স্থান পাওয়া উচিৎ সেইগুলি মাত্র। আমার মনে হয় পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য যেমন একটি কমিটি থাকে, সেইরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের অপাঠ্য পুস্তকের একটি তালিকা করিবার জন্য বা বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের উপযোগী অসবর পাঠ্য-পুস্তকের একটি তালিকা করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি হইলে মন্দ হয় না।

গল্প উপন্যাস বা নাটক মাত্রই অপাঠ্য নহে বরং উহা পাঠেই যখন সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়, তখন যে গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়া নীতি, ইতিহাস, ধর্ম্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি শিক্ষা পাইতে পারে, দেশ-বিদেশের কথা জানিতে পারে এমন সব পুস্তক পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়াই প্রয়োজন। এসব বিষয় আপনাদের কাছে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

স্নেহাস্পদ ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দকে আমি এই মাত্র বলিতে চাই—তোমরা এখন হইতে লাইব্রেরিকে ভালবাসিতে শিখ। জ্ঞান পিপাসা মিটাইবার জন্য পুস্তকাগারের সহায়তা অনিবার্য্য। পুস্তকাগার যত সহজে যে মহামূল্য সামগ্রী দিতে পারে তেমন আর কেহই পারে না। উত্তরকালে সংসারে এমন বন্ধু আর দ্বিতীয় পাইবে না। পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন সংসার-বিষের জ্বালা নিবারণের জন্য দুইটি মাত্র অমৃতের মধ্যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ একটি। পুস্তকাগারেই ইহা লভ্য হইয়া থাকে। পুস্তকাগার পবিত্র নির্ম্মল, বিদ্যামন্দির মধ্যেও সময় সময় স্থল বিশেষে যে সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, অর্থপূজারূপ অনাবিলতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এখানে তাহা নাই। এখানে হিন্দুর গীতা, মুসলমানের কোরাণ অথবা খৃষ্টানের বাইবেলের জন্য স্বতন্ত্র স্থান-নির্দ্দেশ নাই। এমন উদারতা অন্যত্র দুর্লভ। গ্রন্থাগার হইতে অমৃতঃপানের জন্য যুবা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্র দীন ধনাঢ্য সকলের পথ সমান ভাবে উন্মুক্ত। পুস্তকাগার সন্তপ্ত আর্ত্ত ও রুগ্নের বন্ধু, ইহার সঙ্গে যিনি জীবনে একবার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কখন সে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে ভাবে পুস্তকাগারের সহিত তোমাদের সম্পর্কিত হইতে বলিতেছি আমি নিজে তেমন ভাবে কখন পারি নাই। জ্ঞানাহরণের জন্য সে আয়াস কখন করিতে পারি নাই তথাপি আমাদের পুস্তকাগার আমার কাছে দেবতার মন্দির। পুস্তকাগারের সংস্রবে দীর্ঘকাল থাকিলেও, শিক্ষালাভের সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করিয়াছি; কিন্তু অলক্ষ্যে আমার দীক্ষা এইখানেই লাভ হইয়াছে। আমার যদি কিছু থাকে, যতদিন বাঁচিব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব তাহা দিয়াছে আমাদের চন্দননগরের পুস্তকাগার।

লাইব্রেরী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হুগলী জিলার লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন কিরূপ ভাবে হয়, তাহাই আজ আলোচ্য বিষয়। লাইব্রেরীর আদর্শ কি তাহাই যদি সংক্ষেপে বলি, তবেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আপনাদের পাঠাগারের উন্নতি করিবার কি কি এখনো বাকি আছে।

এককালে লাইব্রেরীর আদর্শ ছিল দেশের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা। পণ্ডিত-গণ সেখানে গিয়া নিজ নিজ বিষয়ের গ্রন্থ লইয়া অধ্যয়ন করিতেন। তখন লাইব্রেরী যথার্থ 'পুস্তকাগার' মাত্র ছিল, পুঁথি পত্র রচিত হইবার একটা নিরাপদ স্থান মাত্র। কিন্তু যেদিন হইতে জন-শিক্ষার কথা দেশে উঠিল, যেদিন নিদ্রিত জন-সিংহ জাগিয়া উঠিয়া জ্ঞানের জন্য ব্যগ্র হইল, সেইদিন হইতে লাইব্রেরীর কাজের রূপান্তর হইয়াছে—তাহার কর্ত্তব্য নূতন হইয়াছে। লাইব্রেরী এতদিন Passive প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল, এখন লাইব্রেরী active force হইল। আমার বক্তব্যের মূল কথা হইতেছে, Library-র এই activity, বই কেনা, কাটালগ করা, বই দেওয়া, ফেরত লওয়া প্রভৃতি কাজ ত আছেই; ইহার উপর বর্ত্তমানে লাইব্রেরীয়ান ভার লইয়াছে—লোকশিক্ষার। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, এমন কি ভারতের কোন কোন স্থানেও লাইব্রেরী actively জন-শিক্ষায় সহায়তা করিতেছে। কিন্তু জন-শিক্ষার আদর্শ লইয়া গোটা দুই কথা বলিতে চাই। কথাটি একটু অবাস্তব হইলেও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বের একটা বড় জায়গায় অমিল আছে; সেটা racial; বলিতে পারা যায় Semetic ও Aryan temperament-এর পার্থক্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকে আমরা বলি শ্রুতি। পশ্চিম শাস্ত্রকে বলে 'Scripture'। ধাতুগত অর্থের পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্র শুনিয়া চলিয়া আসিতেছে—আমরা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করি। আমাদের শিক্ষক-গুরু যিনি কর্ণমন্ত্র দেন, কথক যিনি ধর্ম্মকথা বা সামাজিক কর্ত্তব্য উপদেশ শ্রবণ করান। পশ্চিমের শাস্ত্র Scripture বা লেখায়। মূসা লিখিত-অনুশাসন পাইলেন। Script-এর উপর ঝোঁক পড়িয়াছে। এই মূল বা fundamental পার্থক্য জীবনের প্রত্যেক কোঠায়

দেখা যায়। সে কথা যাক। আমাদের শিক্ষা বা Education, literary না হইয়াও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমে Education, literary হইয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। Literacy ও Education এক জিনিষ নহে, সে কথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন হইতেছে আমাদের সমস্যা কি? উত্তর—দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি Library এখন active প্রতিষ্ঠান—পূর্ব্বের ন্যায় জড় পাঠাগার নয়। এখন প্রশ্ন—লাইব্রেরী কেমন করিয়া সেই শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতে পারে? আমার এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন—আমি শিক্ষা-বিভাগের ও সাধারণ বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ও লাইব্রেরীর কর্ত্তব্যকে অভিন্ন করিতেছি। তাহা মোটেই বলিতে চাহিতেছি না। আমার বক্তব্য ·কেমন করিয়া এই লাইব্রেরী আমাদের দেশের প্রাচীন মৌলিক পদ্ধতির সহিত একসাথে কাজ করিতে পারে। বিদ্যালয় বিদ্যা দান করিতেছে—literacy বা অক্ষর জ্ঞানের মধ্য দিয়া বিদ্যা দান করিতেছে। লাইব্রেরী সেই কাজকে supplement করিতেছে। কিন্তু এ-ছাড়াও তার কাজ আছে। সেটা তার activity-র দিক।

লাইব্রেরীতে পূর্ব্বে লোক আসিত অধ্যয়নের জন্য এখন লাইব্রেরী পুস্তক লইয়া লোকদের কাছে উপস্থিত হইতেছে, শিক্ষা দিবার জন্য। লাইব্রেরীর প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—যাহারা অধ্যয়নশীল তাহাদের সহায়তা করা। কিন্তু অধ্যয়নশীল বলিতে কাহারা বুঝায় তাহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। হুগলী জিলায় বিশ লাখ্ লোকের বাস। পুরুষ আন্দাজ পনের লাখ। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা পাঁচ বৎসরের উপর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে শতকরা ২৫%-এর অধিক নহে। পাঁচ লাখ মেয়েদের মধ্যে শতকরা তিনজন লিখিতে পড়িতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মামুলী Definition অনুসারে এই মুষ্টিমেয় অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন। তাহা হইলে কাজ খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া আসে। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য এই দশ লাখ লোককে জ্ঞান দেওয়া। কেবলমাত্র অক্ষর জ্ঞান নয় যে-কাজ স্কুল করিতেছে। এই দশ লাখ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় পাঁচ'লাখ অবশ্যই স্ত্রীলোক। আমরা যখন কিছু আলোচনা করি তখন আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে ১৫ কোটি স্ত্রীলোক। হুগলী জিলায় (যদিও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম) স্ত্রীলোক প্রায় ৫ লক্ষ। ইহাদের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এক চক্ষু দিয়া ভাল করিয়া দেখা যায় না, এক পা দিয়া ভাল করিয়া হাঁটা যায় না।

তারপর হুগলী জিলায় ছয় লাখ অমুসলমানের মধ্যে হিন্দু, খ্রীষ্টান, আদিম

জাতি আছে। এই হুগলী জিলার প্রায় পাঁচ লাখ হিন্দুর মধ্যে হাজার করা ৪৪০ জন তথাকথিত অস্পৃশ্য বা জল-অচলনীয়। যেমন চাষীকৈবর্ত্ত, বাগ্দী, সাঁওতাল, একথা ভুলিলে চলিবে না যে তাহাদের পরিশ্রমে আমাদের দৌলত। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় উপনিবেশিকগণও ভারতীয় 'কুলী'দের শিক্ষার জন্য কিছু না কিছু করিয়াছে। আমরা আমাদের নিম্নতম শ্রেণীদের জন্য সেরূপ করিবার মত প্রয়োজন বোধ করি নাই। সুতরাং সমস্যা কত দূর, দায়িত্ব কিরূপ, তাহা বুঝান যায় নাই। তারপর জিলায় শিশুগণ ভবিষ্যৎ বাংলার আশা ভরসা। তাহাদের ভুলিলে চলিবে না, তাহাদের বাদ দিলে কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং লাইব্রেরীর যেটা activity-র দিক—তাহার দ্বারা আমরা জিলার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, তথাকথিত ভদ্র পুরুষদের, নারীদের ও শিশুদের reach করিতেছি।

এখন দেখা যাক্ কি করিয়া আমরা এই Service দিতে পারি।

প্রথমতঃ শিক্ষিত পুরুষদের কথা হউক। তাঁহারাই বেশী বই পড়েন। বই-এর চাহিদা তাঁহাদের মধ্য হইতে বেশী হয়। এখন এই চাহিদা কয়শ্রেণীর সেটি বিচার করিয়া দেখি।

১। Recreation—ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পাঠ। নভেল-নাটকই এই শ্রেণীর পাঠকদের প্রধান পাঠ্য। প্রত্যেক Public Library-র লাইব্রেরীয়ান্ জানেন—তাঁহাদের কোন্ বইএর চাহিদা অধিক।

২। Intellectual—এই শ্রেণীর লাইব্রেরী হইতেছে Asiatic Society-র লাইব্রেরী—Imperial Library, University Library.

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কাজের লোকেরা। এই শ্রেণীর লাইব্রেরী কলিকাতার Commercial Library। Reference-এর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী এখনো এই শ্রেণীর লাইব্রেরীর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা তেমন ভাবে অনুভব করে নাই।

এখন দেখা যাক্ হুগলী জেলায় পক্ষে কি দরকার। প্রথমে Public লাইব্রেরীতে Recreation-এর উপযুক্ত বই সংগ্রহ। নভেল, নাটক, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি। সে শ্রেণীর লাইব্রেরী অনেকগুলি নিশ্চয়ই আছে। এই সব লাইব্রেরীতে অনেক ইংরাজী নভেল, Continental novels থাকে জানি। এই শ্রেণীর লাইব্রেরী আমাদের সুপরিচিত। সুতরাং অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। Intellectual work-এর জন্য একটি বড় লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার। এই লাইব্রেরীতে হুগলী জিলা

সম্বন্ধে Collection বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পর বাংলাদেশ সম্বন্ধে, তার পর অন্যান্য প্রদেশ ও দেশ সম্বন্ধে গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। এরূপ করিতে কেন কহিতেছি —তাহার কারণ আমাদের আর্থিক অবস্থা। আমাদের ন্যায় গরীব দেশের পক্ষে বিচিত্র সংগ্রহ করিতে যাওয়া অন্যায়। তবে একভাবে হইতে পারে। সেটি হইতেছে জিলার যাঁহারা বড লোক আছেন—তাঁহাদের অনেকেরই Private Library আছে, তাহা দান করিয়া হুগলী বা চন্দননগরে একটি Central Library করিতে পারেন। তবে তাহা সম্ভব কিনা জানি না। বই-এর ব্যবহারের দ্বারা তাহার সার্থকতা। সুতরাং তাঁহাদের অর্থের সার্থকতা তখনই হইবে, যখন লোকে তাহা ব্যবহার করিবে।

এই পদ্ধতিতে বৃহৎ লাইব্রেরী করা যায়। সেই Central লাইব্রেরী জিলার intellectual কর্ম্মের কেন্দ্র হইতে পারে। এই লাইব্রেরী বিশেষভাবে জিলা সম্বন্ধে Collection করিবে। Collection কি জাতীয় হইবে? দেশের ইতিহাস, মানচিত্র প্রত্যেক মহকুমা, থানা, চৌকিতে সকল প্রকারের চিত্র, or Photo Collection; পুঁথি, জিলার বড বড লেখকদের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংগ্রহ। বিদেশের অনেক মফঃস্বল লাইব্রেরীর ইহাই বিশেষত্ব হইবে। বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিবার উপাদান সংগৃহীত হইবে এই সকল District Central Libraryতে।

লাইব্রেরীর আর একটি বড কাজ Public-কে Reference দেওয়া। Commercial Library এই কাজ করে। বর্ত্তমান Imperial Libraryও তাহাই করিতেছে। হুগলী জিলা সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর লইতে হইলে যেন আমরা সেইখানে পাই। Central Library-র একটি অংশ হইবে Reference ও বিশেষভাবে Historical Commercial ও Industrial Reference দেওয়া। Information Bureau উহার নাম হইবে।

লোকেদের শিক্ষিত করা যদি দরকার হয়, তবে জিলা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেবল প্রত্নতত্ত্ব লইয়া থাকিলে জাতির জীবন গড়ে না। প্রতিদিনের News জমিয়ে ইতিহাস হয়। আমরা যদি জীবন্ত জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, তবে বর্ত্তমানের দৈনিক ঘটনাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। হুগলীতে এত mill এ সম্বন্ধে খোঁজ খবর কোথায় পাইব? Central Library তে পাইব। জিলার লোকদের জীবনকে vitally প্রভাবান্বিত করিতেছে এমন ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে অথচ সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ একস্থানে পাওয়া যায় না।

Central Libraryতে এই দৈনন্দিন জীবনেতিহাসের সকল তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। হুগলী জিলার পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রগুলি এক করিয়া রাখা ; হুগলী সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় তাহার cutting সংগ্রহ করা ইত্যাদি কার্য্য Central Libraryতে হইবে। বিস্তারিতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন।

এইবার activityর কথা বলিব—যেটা Modern Library-র বিশেষত্ব। এক একটি করিয়া বলি। এই Central লাইব্রেরীর'সভ্যগণ জিলার সর্ব্বত্র যাহাতে লাইব্রেরী স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রয়োজন মানুষের অধ্যয়ন প্রবৃত্তি জাগ্রত করা। সেইটা কেমন করিয়া করা যায় ? সেইটা করা যায়—মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা বাড়াইয়া। জ্ঞান-তৃষ্ণা বাড়ান যায় কেমন করিয়া ? এইটাই আসল সমস্যা। মানুষ যে জানে না—এইটাই সে জানে না। সেইজন্য প্রথম কাজ হইবে, Libraryর Lecture Department-এর। এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন। একখানা বই একসঙ্গে একজন পড়িতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি এক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় একশত ব্যক্তির কাছে দিতে পারেন। নিরক্ষর দেশকে বাহিরের কোন্ উপায় দিয়া জ্ঞান-তৃষ্ণা জাগাইতে হইবে, যাহারা সামান্য জানে, তাহারা অধিক জানিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। নিজের অবস্থা ভাল কি মন্দ তাহার কোন absolute standard নাই ; কোন তুলনার দ্বারা নিজের অবস্থা জানা যায়। সেই বাহিরের জ্ঞান দিয়া সেই তুলনামূলক চিত্র দিয়া লোকের চিত্তকে জাগ্রত করিতে হইবে। দশলক্ষ লোকের মধ্যে যেখানে আট লক্ষ লোক নিরক্ষর, সেখানে লাইব্রেরীর কর্ত্তব্য এই ভাবে লইতে হইবে। আপনারা অবগত আছেন পৃথিবীময় Adult Education-এর জন্য একটা কাজ চলিতেছে। আমাদের দেশেও এই সব প্রতিষ্ঠান ছিল, ইহা নূতন নহে ; তবে নূতন ভাবে ইহাকে পুনরায় গড়িতে হইবে। লোক-শিক্ষা ও অক্ষর-জ্ঞান এক নহে। সুতরাং লাইব্রেরীর কাজ হইবে actively লোকদের কাছে গিয়া পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলা। এজন্য slides-এর প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলি। Burminghamএর জনসংখ্যা ৯ লাখ। সেখানকার Libraryতে ১১,০০০ slides আছে ; Warwickshireএর ৪০০০ ফটো আছে। এই slides দিয়া লোক-শিক্ষা যেরূপ হয়, Bioscope দিয়াও তেমনি হয়। এ ছাড়া আপনারা জানেন Radio optican নামে সামান্য একটি যন্ত্র দিয়া যে কোন ছবি, ফটো, picture postcard দেখানো যায়। Central Libraryর কর্ত্তব্য হইবে এই

সব সংগ্রহ করা ও নিয়মিত ভাবে Routine করিয়া গ্রামে গ্রামে সেই সব পাঠানো। Slides, pictures, postcards classify করিয়া রাখিয়া প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে Lectures বাংলায় সম্পূর্ণ ভাবে লিখিয়া Type করিয়া রাখিতে হইবে। কলেজে ছাত্রগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, সাধারণ নিরক্ষরদের যেমন এইরূপ দরকার—মহিলাদের জন্যও সেইরূপ করা যাইতে পারে, শিশুদের জন্যও তদ্রূপ হইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রোজন। সরোজ-নলিনী স্মৃতি সমিতি, Bengal Social Service League-এ বিষয়ে কাজ করিতেছে; Central লাইব্রেরী ইহা organize করিবে। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এ সবের জন্য বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন নাই। একটি জায়গা হইতে সমগ্র জিলার ব্যবস্থা হইতে পারে।

জিলার লাইব্রেরী উন্নতি করিতে হইবে এবং সত্য সত্যই সমাজের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে লাইব্রেরীকে এইরূপ active হইতে হইবে।

এ ছাড়া অনেক জিনিষ ভাবিবার আছে। যেমন গ্রন্থ নির্ব্বাচন, লাইব্রেরীর বর্গীকরণ (classification), administration ইত্যাদি। এ সব technical বিষয়। বিস্তৃত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে একটা কথা বলিব—Training of the Librarian সম্বন্ধে। এ জিনিষটা বিশেষ প্রয়োজন। ইউরোপের প্রত্যেক সুসভ্য দেশের, আমেরিকার প্রত্যেক state-এ বহু school ও college-এ Librarianship-এর course আছে, degree আছে। এ দেশে নাই। কিন্তু ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। লাইব্রেরীয়ান্ হবেন সবজান্তা। সত্যই কি তাহা সম্ভব? তাহা নহে। তবে! তবে তিনি জানেন—কোথা হইতে জানা যায়! ইহাই হইতেছে লাইব্রেরীয়ানের প্রধান Training। তাঁহার general culture, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ acquire করা দরকার। আপনারা Library-র devolopment সম্বন্ধে ভাবিতেছেন, ইহার পূর্ব্বেও আমি Librarian training সম্বন্ধে ভাবিবার জন্য বলি। ভাল trained লাইব্রেরীয়ান্ তৈয়ারী করুন, ভাল Library আপনি grow করিবে, culture-এর atmosphere তিনি করিবেন, দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলিবে। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত যুবকগণকে training দিয়া, এই কাজকে লাগাইতে হইবে। এই সব উপদেশের পর প্রশ্ন উঠিবে, 'কিন্তু রাজরক্ত লেকি তোরা এনে দিবি'?—কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসিবে? আমি Librarian আমি সেদিক হইতে জিনিষটিকে দেখিতে পারি না। সেটি ভাবিবেন

দেশনায়কগণ। তবে দু'একটা কথা বলিতে পারি। এখানেও সেই সমবায়ের কথা। United we stand. সমবেত হইয়া একটা municipal rate, বা local board rate করা যায় কিনা ভাবিতে হইবে। District board-এ কোন কোন বিভাগের strict supervision করিয়া টাকা বাঁচানো যায় কিনা, mill-worker দের কাছ হইতে টাকা পাওয়া যায় কিনা, ধনীদের নিকট হইতে অর্থ পাওয়া যায় কিনা, দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকদের নিকট হইতে টাকা আদায় হয় কিনা, শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে দান পাওয়া যায় কিনা ইত্যাদি ভাবিতে হইবে। মোট কথা সমবায় ভিন্ন উপায় নাই। এ দেশে কার্ণাগী হয় নাই—যদিও আপনার জিলায় দুই একজন দানবীর অতি মহৎ সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? নাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। মরণ বাঁচনের সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়া বাঙালীকে চেষ্টা করিতেই হইবে—বধির দেশবাসীর কর্ণের নিকট বিশ্বের বার্ত্তা পৌছাইয়া দিতেই হইবে—তাহার অন্ধ চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিশক্তি আনিতেই হইবে—তাহাদের মূক মুখে বাণী আনিতেই হইবে। আমাদের Cause বড় বলিয়া আমাদের সংগ্রামও কঠিন।

কাজী আবদুল ওদুদ

আপনাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির জন্য আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। আমি সাহিত্যিক মাত্র—সাহিত্যিক ভিন্ন আর কিছু যে নই তা জানা কথা। তাই আমাকে আপনাদের এবারকার বাৎসরিক অধিবেশনে এমন সাদর আহ্বান জানিয়ে আপনাদের গূঢ় সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়ই আপনারা দিয়েছেন -তার বেশী আর কিছু করেননি। বলা বাহুল্য এর জন্য কোনোরূপ সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা আপনাদের কম। তা হোক কম। লাভের কথাই যে সব সময়ে মানুষ বড় করে ভাবতে পারে তা নয়। আসুন কর্মারম্ভে আমরা এই প্রার্থনা করি: সাহিত্যের অর্থাৎ সাহিতত্বের শক্তি অন্য কথায় সবার সঙ্গে প্রেমের যোগের শক্তি, দেশের এই মহৎ-সম্ভাবনাময় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বাঙ্গীন সাফল্য দান করুন।

বিভিন্ন সময়ে আপনাদের বাৎসরিক অধিবেশনে যেসব যোগ্য ব্যক্তি পৌরোহিত্য করেছেন তাঁরা এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সূচনায় তাঁদের সেইসব সুচিন্তা নতুন করে স্মরণ করা যাক।

তাঁদের দুটি চিন্তাই মুখ্য; একটি: গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার দেশে শিক্ষা-বিকিরণের একটি দিক হলেও এর গুরুত্ব এতখানি যে দেশের শিক্ষা-বিভাগের একটি মামুলি উপ-বিভাগ রূপে গণ্য হলে এর সেই উদ্দেশ্যই হবে ব্যাহত; অপরটি: আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নিধারিত করতে হবে দেশের কোন্ অঞ্চলে কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থাগার বেশী উপযোগী হবে।

গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যে প্রাচীনকালের বিদ্বানরা ও বিশিষ্ট ধনীরা একটি বড় কাজ জ্ঞান করতেন সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাচীনদের চোখে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মোটের উপর ছিল যেন পিলসুজের উপরকার শিখা, অর্থাৎ জ্ঞানের চর্চা ছিল মানুষের সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একালে সভ্যতার পালাবদল হয়েছে—একালে জ্ঞানচর্চা সমাজের কোনো বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ না,

বরং সর্বত্র ব্যাপ্ত। অবশ্য তর্ক হতে পারে: জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে সেকালের তুলনায় এ কালের মানুষ সত্যিই কি এগিয়েছে? সেকালে জ্ঞানীদের সংখ্যা অল্প ছিল, গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় নগণ্য কিন্তু জ্ঞান সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক সেজন্য সেকালের জ্ঞানী ও শাসকদের চেষ্টাও কম ছিল না। একালে বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে পুঁথিপত্রও বেড়েছে অবিশ্বাস্য রকমে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি একথা বলা যায় যে একালে জ্ঞান মানুষের সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে? প্রশ্নটি যে দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতে হবে, একালে সর্বসাধারণের সম্বন্ধে সর্বক্ষেত্রের নেতাদের চেতনা অনেক বেড়েছে, মানুষের দাবিও বেড়েছে খুব, তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মতো ব্যাপার বিশেষ ভাবে একালের জিনিষ—সেকালের মানুষের এই ধরণের চেতনার অভাব ছিল। একালের নেতাদেরও সর্বসাধারণের এই বর্ধিত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে, গ্রন্থাগার আন্দোলনে আমরা সার্থকতার পথে চলেছি, না, গতানুগতি বজায় রাখছি মাত্র।

এই দিক দিয়ে সমস্যাটির দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে দেশে গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার দেশের শিক্ষা-বিভাগের একটি মামুলি উপ-বিভাগ হিসাবে গণ্য হতেই পারে না, কেননা যেমন সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে তেমনি গ্রন্থাগারের প্রসারের ব্যাপারে একালের করণীয় এত বেশী, এত বিভিন্ন রকমের যে, এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক চিন্তা পরিকল্পনা ও অনুসন্ধানের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, এই দুয়ের একটিকে অপরটির আনুষঙ্গিক জ্ঞান করলে দুই প্রচেষ্টাই হবে খণ্ডিত ও অসার্থক।

পূর্বসূরীদের অপর প্রধান চিন্তা প্রথম চিন্তারই অন্যদিকে, কেননা, বিচিত্র ধরণের বহু গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা একালে একান্ত কাম্য বলেই তো গ্রন্থাগারের প্রসার একটি স্বতন্ত্র দফ্‌তরের—অন্ততঃ একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিভাগের—বিষয় হওয়া উচিত। পূর্বে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন যাঁরা জ্ঞানপিপাসু তাঁরাই—দৈহিক-শ্রম-মুক্ত ধনীরাও কখনো কখনো ব্যবহার করতেন। কিন্তু একালে জ্ঞানের দ্বার খোলা থাকা চাই সব শ্রেণীর ও বয়সের লোকদের জন্য তাই গ্রন্থাগার বিচিত্র ধরনের না হলে তা হবে অসার্থক, এমন কি অনেকগুলো গ্রন্থাগারকে গ্রন্থের আগার তেমন না করে করা চাই বরং রেকর্ড ও বেতার আদি যন্ত্রের আগার যেখানে মাত্র বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন কিংবা নিরক্ষর গ্রামবাসীরা সেই সব রেকর্ড ও যন্ত্র শুনে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্ত বিনোদনও হবে। একালে, অন্তত গণতন্ত্রে, শেষ

পর্যন্ত জনসাধারণই দেশের শাসক—তাদের পছন্দ অপছন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের শাসন ব্যবস্থা। তাই সাধারণ শিক্ষার বিকিরণে বা গ্রন্থাগারের বিস্তারে যত অর্থব্যয়ই হোক্ তা বৃথাব্যয় কোন ক্রমেই নয়, বরং শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যয় বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে দেশের দৃষ্টি কি যোগ্যভাবে আকৃষ্ট হয়েছে? দুরদৃষ্টক্রমে স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরেও আমাদের বলতে হচ্ছে—না হয় নাই। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের এক পরিকল্পনা কিছুদিন পূর্বে গ্রহণ করেছেন। দেশের আয়তনের ও লোকসংখ্যার তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কথা—এর রূপায়ণে প্রাণের স্পর্শ লাগছে না—টাকা খুব কম খরচ হচ্ছে না, কিন্তু লোকদের মধ্যে এই সাড়া লাগছে না যে একটি বড় কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি কোথায়? জনসাধারণের অন্তরে, না কর্মকর্তাদের অন্তরে? অথবা দুই জায়গায়ই? হয়ত দুই জায়গায়ই। কিন্তু বেশী দায়ী করতে হবে কর্মকর্তাদেরই। একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে দোষ তাঁদেরই বেশী। যেদিন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলেছিল, সেদিন কোন কোন মহলে এই মত প্রকাশ করা হয়েছিল—Education can wait but Swaraj cannot—শিক্ষার ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে, কিন্তু স্বরাজের ভাবনা আজই ভাবা চাই। বলা বাহুল্য, সেদিনেও এই ধরণের চিন্তা ছিল, চিন্তার নামে গোঁজামিল, কেননা সভ্যসমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির সমস্যা গৌণ বিবেচিত হতে পারে না। আর আজ তো এমন চিন্তা সর্বনেশে। কিন্তু এই সর্বনেশে মনোভাব থেকেই আমাদের এ কালের নেতৃস্থানীয়েরা ভুগছেন। তাই তাঁদের চেতনা নেই দেশের নবীন জীবনে কতখানি ব্যর্থতা তাঁরা ঘটাচ্ছেন।

কিন্তু এর প্রতিকার কোন্ পথে? রাজনৈতিক চেতনা যাঁদের প্রখর, তাঁরা হয়ত সোজা বলবেন: যে দল এখন শাসন চালাচ্ছেন তাঁদের সরিয়ে দিয়ে নতুন দলকে সে সুযোগ দিতে হবে—গণতন্ত্রের তাহাই কাজ। কিন্তু কোন নতুন দল সম্বন্ধে দেশ যে আজো তেমন আশান্বিত হতে পারে নি তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকেই কতকটা বোঝা যায় দেশের রাজনৈতিক চেতনার দুর্বলতা—দেশের কর্মশক্তির অনেকখানি দিশেহারা দশা। দেশ এক নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হতে পারে, যদি দেশের বর্তমান অবাঞ্ছিত ধারা না বদলায়।

কিন্তু আমরা রাজনীতিক নই, রাজনীতির জটিলতা ও গহনতা তাই

যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই আমাদের জন্য শুভ। আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কর্মী, সেখানে শান্তভাবে প্রধানত জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞানের পথে যে কর্মকুশলতা অর্জন করা যায় তাই, আমাদের অবলম্বন। সেই দিক দিয়েই দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করবো।

দেশের কর্মভার আজ দেশের রাজনীতিকদের উপরে আর তাঁদের অধীন বড় বড় আমলাদের উপরেই ন্যস্ত। এঁদের মধ্যে যোগ্য চৈতন্যের উদয় না হওয়া পর্যন্ত দেশের কল্যাণ নেই, সহজেই সে কথা বোঝা যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এঁদের সাধ্য নেই যে দীর্ঘদিন এঁরা অনড় হয়ে বসে থাকবেন; ভিতরের ও বাইরের ধাক্কায় ধাক্কায় হয় এঁদের বদলাতে হবে, নইলে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, সময় একালে দেশের জন্য অনেকখানি অনুকূলও বটে—এমনও হতে পারে সুসময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে হাজির হবে। কিন্তু তখন আমরা প্রস্তুত থাকতে পারি, নাও থাকতে পারি। তাই আমাদের, অর্থাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের, পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে—এই কথাই আপনাদের বলতে চাই; সেই প্রস্তুত থাকার অর্থ—একালে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে কি রূপ নিয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা, আমাদের দেশে কোথায় এর কোন্ রূপ সর্বসাধারণের জন্য প্রকৃতই উপযোগী হবে সে-সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকা, আর এর অর্থনৈতিক বনিয়াদ কি করে মজবুত হবে সে সম্বন্ধে দেশের মত যোগ্যভাবে গঠন করে চলা। Knowledge is Power, জ্ঞানই বল, একথা স্বীকৃত সত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে।

আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। জ্ঞান আপনাদের শক্তি দেবে, আপনাদের সফলতায় নিয়ে যাবে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আর একটি বড় বিষয়ও আছে, সেদিকেও আপনাদের মনোযোগ কিছু কুণ্ঠিতভাবে আকর্ষণ করছি। বলা যায় সেটি হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রেমের দিক। জ্ঞানের সাধনা গ্রন্থাগার আন্দোলনে আপনাদের প্রতিষ্ঠা দেবে, কিন্তু আপনারা সত্যই খুশী হবেন ও গ্রন্থাগার যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের খুশী করতে পারবেন যদি গ্রন্থকে, গ্রন্থ-সরবরাহকে, ভালবাসতে পারেন। একালের মানুষ খুব অধিকতর সচেতন; কর্মকুশলতার মূল্যও তাঁরা বোঝেন; কিন্তু কাজকে ব্রত রূপে গ্রহণ করতে হবে, তাতে আত্মদান করতে হবে—একথাটা যেন বুঝতে চাচ্ছেন না। না বুঝলে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উপায় নেই। এক মহৎ সৃষ্টিধর্মী কাজে নেমে আমাদের এমন ভুল না হোক, এই আমার সাগ্রহ নিবেদন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

গ্রন্থকার আর গ্রন্থাগার যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গ্রন্থকার না থাকলে গ্রন্থাগার থাকে না। আর গ্রন্থাগার না থাকলে গ্রন্থকারের সৃষ্টি ধারণ করে রাখবে কে? বলা বাহুল্য ঘরোয়া গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার। আবার শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার।

তবে আমরা সাধারণত পাবলিক লাইব্রেরী অর্থেই গ্রন্থাগার শব্দটি ব্যবহার করি। পাবলিক লাইব্রেরী এদেশের মাটিতে নতুন। সবচেয়ে পুরাতন পাবলিক লাইব্রেরীর বয়সও দেড় শতাব্দীর বেশী নয়। এসব লাইব্রেরী দ্বারা পাঠক সাধারণের অশেষ উপকার হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়। এখনো এদেশের বৃহত্তর জনসাধারণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেবা থেকে বঞ্চিত।

গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাজ বেশীদিন ফেলে রাখা যাবে না। কেবলমাত্র পাঠশালা বিদ্যালয় বা কলেজ থেকেই সকলে শিক্ষা লাভ করতে পারে না। করলেও তা বিশ বাইশ বছরে ফুরিয়ে যাবে। কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা শিক্ষিত বলে গণ্য হবে তা ঠিক কিন্তু চর্চা না করলে প্রত্যেকটি বিদ্যাই বাসি হয়ে যায়। বিশেষ করে আজকের দিনে জ্ঞানবিজ্ঞান যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে শিক্ষিত ব্যক্তিও সেকেলে হয়ে যান। সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারান।

কলেজের পড়াই যথেষ্ট নয়। তার পরেও আরো পড়াশুনা করতে হবে। আজীবন অধ্যয়ন করা চাই। রবীন্দ্রনাথকে তা করতে দেখেছি। মৃত্যুর একবছর আগেও তিনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে "ম্যাথেমেটিকস্ ফর দি মিলিয়ন" নিয়ে পড়েছিলেন। আর একজন জ্ঞানতপস্বীর নিকট সংস্পর্শে এসেছি। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কখনো সংস্কৃত, কখনো প্রাকৃত, কখনো ফরাসী, কখনো জার্মান ভাষার বই হাতে নিয়ে বসেছেন, শুয়েছেন। তাঁর তৃষ্ণার জল।

সাধারণ মানুষকে সারাজীবন এই তৃষ্ণার জল জোগাবে কে? পাবলিক লাইব্রেরী। দেশে অসংখ্য পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে আর তাতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রথম প্রস্তাবটির চেয়েও কঠিন। সাহিত্যের রুচি এত নিচে নেমে গেছে যে তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য পণ্ড। না দিলেও বিপদ। কেউ বই নেবে না, চাঁদা দেবে না। তখন লাইব্রেরীটাই সেকেলে হয়ে যাবে।

লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্ধুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা সংগ্রহই হোক্, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহই হোক্, সেই সংগ্রহবায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, —সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় একথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠেসা করে রাখে। যার অনেক টাকা, আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার-তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হ'লে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু'রকমের আধার, এক অভিধান, আর এক সাহিত্য। গণনা করে, দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশী ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি একথা মান্‌তেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোল্‌বার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায়না। তার কারণ সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা সহরের মতো হ'য়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষ ভাবে বই সন্ধান কর্‌বার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়েচলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পার্‌লেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেন না, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা ক'রে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হ'লো বড়ো লাইব্রেরি, আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি ক'রে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তাহ'লে বোঝা যাবে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখ্‌লেই তার কাজ সারা হ'ল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হ'লে চল্‌বে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হ'লে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেই জন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যত ভাণ্ডার, ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোট লাইব্রেরি বল্‌তে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাক্‌বে কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাক্‌বে না, প্রত্যেক বই থাক্‌বে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান্ হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভী, শেল্‌ফ ভর্তির অহঙ্কার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাক্‌বে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরিয়ানের থাক্‌বে গুদামরক্ষকের

যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।

মনে কর কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে কোন বিষয়ে কোন ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে? বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্ম্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্ত্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে-বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্ত্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কি কি বই প্রকাশিত হচ্চে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্ব্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হ'লে একটা অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হ'লে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো

বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয়, তবে সেই লাইব্রেরিগুলিতে কি কি বই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে-কথাটি বল্‌তে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থসংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।

লাইব্রেরী

বিমল কর

লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আজকাল আর নেই। বহুকালই নেই বলা যায়। ছেলেবেলায় বা অল্প বয়সে নিশ্চয় ছিল, কলেজ টলেজে পড়ার সময়, চাকরির প্রথম দিককার জীবনেও ছিল। তারপর উদ্যমের অভাবে সে-অভ্যাস্ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যে ধরণের কাজকর্ম করি তাতে খবরের কাগজের অফিসের লাইব্রেরী ভিন্ন আমাদের মতন মানুষের অন্য কোথাও ছোটা সম্ভব নয়।

ছেলেবেলায় কিংবা কৈশোরে এই পড়ার অভ্যেস পেয়েছি বাড়িতে। তখনকার দিনের কিছু কিছু পত্রিকা, কোনো কোনো গ্রন্থাবলী আর আমাদের ধানবাদ স্কুলের ছোট্ট লাইব্রেরী ছিল আমাদের সব। তারপর আর খানিকটা বড় হবার পর ধানবাদের রেলের লাইব্রেরী ছিল আমার বই পড়ার জায়গা। এই লাইব্রেরী ছিল বেশ বড়, সাজানো গোছানো; রেলের টাকা পয়সা থাকত সাহায্য হিসেবে, কাজেই বইয়ের অভাব সেখানে ছিল না। বাংলা বই—একেবারে নতুন বইও সেখানে রাতারাতি চলে আসত। এনতার বাংলা উপন্যাস পড়েছি তখন, সেকেলে সব নাটকও। ইংরেজী বইও লাইব্রেরীতে ছিল, কিন্তু অল্প। কলেজে পড়তে এলাম কলকাতায়। আমাদের হোস্টেলে একটা মোটামুটি লাইব্রেরী ছিল, সেখানে, তিরিশের যুগেও বাঙালী লেখকদের—যাকে বলা হত আধুনিক লেখক—তাঁদের বইটইও থাকত। তাতে আমার সুবিধে হয়েছিল। কল্লোল যুগের লেখকদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়তে পেয়েছি। আমাদের কলেজ লাইব্রেরীতে গল্পের বইটই বেশী থাকত না, সেটা ছিল মেডিকেল কলেজ—কাজেই যা থাকত তাতে আমার মতন ছেলের সাধ মেটাবার উপায় ছিল না। যাই হোক, আই. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে যখন আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে গেলাম – তখন আমাদের বাড়ির কাছে আর একটা ভাল লাইব্রেরী পেলাম। এটাও রেলের লাইব্রেরী। তবে ধানবাদের নয়। সেখানে বিস্তর ইংরেজী বিখ্যাত উপন্যাসের অনেকগুলি তখনই পড়েছি। শুধু তাই বা কেন, ইবসেনের নাটকও আমি সেই সময়ে প্রথম পড়ি।

আবার কলকাতা। এবারে অন্য কলেজে। বড় লাইব্রেরী। বইও অনেক।

কিন্তু তখন যুদ্ধ চলেছে, কলকাতা প্রায় ফাঁকা কলেজ লাইব্রেরীর বইপত্র আগলে রাখার জন্যে আমরা বড় একটা পছন্দমতন বই পেতাম না। আমার এক দাদা ছিলেন পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার। তিনি বই আনতেন। সেই বই-ই পড়তাম।

এরও বেশ কিছুকাল পরে যখন আমি বেনারসে, তখন আমার প্রথম দিককার চাকরি ভবনে একটি লাইব্রেরী ছিল আমার বড় সান্ত্বনা। গোধুলিয়ার চৌমাথার কাছে একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। নাম মনে পড়ছে না—তবে সাহিত্য পরিষদ গোছের কিছু একটা হবে। বাংলা লাইব্রেরী। পুরোনো আমলের পত্র-পত্রিকা, পুরোনো বই পাওয়া যেত অনেক। 'সবুজ পত্র' আর 'বিচিত্রা'র সেট দেখেছি, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার কিছু সেটও দেখতাম। পুরোনো পত্রিকা পড়ার নেশা এবং ঝোঁক আমার ছিল। নিয়ে এসে পড়তাম। দরকারী বইও আনতাম।

এরপর আবার কলকাতায় ফিরে এসে লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বইপত্র ঘাঁটবার জন্যে ছুটতে হয়েছে কিন্তু যাকে লাইব্রেরীর অভ্যাস বলে তা আর থাকল না।

আমার নিজের পক্ষে লাইব্রেরীর আর তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আমি গবেষক নই কিংবা নিষ্ঠাবান পড়ুয়া নই। যাঁরা কোনো কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চান তাঁদের পক্ষে লাইব্রেরী ছাড়া গতি নেই। তেমন নিষ্ঠা আমার অন্তত নেই।

তবে একথা ঠিক, কিশোর এবং যৌবন বয়েসে যা-কিছু সামান্য পড়াশোনার চেষ্টা করেছি তার খোরাক পেয়েছি লাইব্রেরী থেকে। লাইব্রেরী না থাকলে আমাদের মতন মফঃস্বলবাসীরা বই যোগাড় করতে পারত না; মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সখ করে বই কেনারও ক্ষমতা ছিল না।

আজকাল শুনেছি লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে; বড় বড় লাইব্রেরীর চেয়ে ছোট ছোট লাইব্রেরী অসংখ্য হচ্ছে। হোক, তাতে আমার কিছু বলার নেই। বলার কথামাত্র এই যে, পড়ুয়ারা কেমন হচ্ছে। আমাদের সময় পড়ুয়ারা সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু পড়ার ব্যাপারে মনোযোগ ছিল। আজকাল যদি এমন হয়—পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াবে বলে লাইব্রেরী তাদের খুশী করতে যা তা বই কিনে আলমারি ভর্তি করছে—তবে কিন্তু সেটা গৌরবের বিষয় হবে না। বড় বড় লাইব্রেরী বোধ হয় বিশেষ পাঠকের জন্যে কিন্তু ছোট ছোট লাইব্রেরী নিতান্তই অগাপাঠকদের সঙ্গে করার জন্যে হতে পারে না। তারও একটা দায়িত্ব

থাকা দরকার। আমাদের অল্প বয়েসে দেখেছি লাইব্রেরীয়ান আজে-বাজে বই চাইলে দিতেন না, ধমক দিয়ে অন্য বই গছিয়ে দিতেন। সেই বইগুলি ছিল বাংলা সাহিত্যের সেরা। বিদেশী বইয়ের বেলাতেও তাঁরা খুঁজে পেতে ভাল বই দিতেন পড়তে। এই দায়িত্ব আজও পালন করা উচিত।

লাইব্রেরীকে অস্বীকার করার উপায় আমার নেই। দুঃখ এই যে, এখন আর লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি না। যদি পারতাম আমার লাভ হত অনেক।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবনা

সুশীলকুমার বসু

বিদ্যালয়ে আমরা যে বিদ্যালাভ করি, তাহার একটা নগদ মূল্য আছে। এখানে যতটুকু শিক্ষা হয়, তাহার একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়; মানসিক শিক্ষা ও জ্ঞানদান ব্যতীত, অনেক কাজ চালাইবার, অর্থার্জ্জন করিবার, ভদ্র সমাজে মিশিবার যোগ্যতা ইহা দান করে। এইজন্য সহজেই লোকে ইহার মূল্য বুঝিতে পারে। গ্রন্থালয়, বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানকে পুষ্ট করিতে পারে, লোকের পাণ্ডিত্যলাভে সাহায্য করিতে পারে, জ্ঞান-তৃষ্ণা ও জ্ঞানচর্চ্চাকে জাগাইয়া রাখিতে পারে। ইহার কার্য্য পরোক্ষ, আশু কোনও লাভ দেখাইতে পারে না, কাজেই, লোকে মুখে যাহাই বলুক, ইহাকে মানসিক বিলাসের ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক উচ্চাসন দিতে চায় না।

এইজন্য আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশেও সাধারণ লোকের চেষ্টায় নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় যাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহা দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। কিন্তু, গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে নিতান্তই সামান্য। যাহা হইয়াছে, তাহারও পুস্তকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা, পরিচালনের অবস্থা প্রভৃতির খোঁজ করিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে। গ্রন্থাগারের সর্ব্বপ্রধান কাজ অবশ্য লোককে পণ্ডিত হইতে, বিশেষজ্ঞ হইতে সাহায্য করা। কোনও বিষয় ভালভাবে আয়ত্ব করিবার জন্য যে বিপুল বহুমূল্য গ্রন্থরাজির প্রয়োজন হয়, কোনও একজন লোকের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। এবং অন্যপক্ষে পুস্তকগুলিরও গুণ ও মূল্য এত অধিক যে, মাত্র একজন লোকের কাজে লাগিলেই, তাহার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয় না, অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ইহা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অথবা পরিবারস্থ সকলের সহিত ভোগ করা যায় না। কাজেই সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হইয়াছে। এই অর্থে গ্রন্থাগার সাধারণের হইলেও মাত্র পণ্ডিতদিগেরই সম্পত্তি—সাধারণ লোকের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকে না। বিশেষ বিদ্যামূলক, দুষ্প্রাপ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থরাজী পণ্ডিতদের কাজে লাগিলেও সাধারণ পাঠকের তাহা কোনও প্রয়োজনে আসে না।

কিন্তু, সাধারণ পাঠকেরও পড়া দরকার এবং তাঁহাদের বেশীর ভাগ লোকের

পক্ষের প্রয়োজনীয় সকল বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, এবং এক্ষেত্রেও ২।১ জনের প্রয়োজন মিটাইয়াই বইগুলির উপযোগিতা নিঃশেষিত হইয়া যায় না, এইজন্য অতি সাধারণ পুস্তক সকলেরও সংগ্রহ রক্ষা এবং সাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা অর্থাৎ এক কথায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার স্থাপনা বহু ব্যয় এবং চেষ্টা সাপেক্ষ। রাজসরকার বা বিশেষ কোনও ধনী লোকের চেষ্টায় বিশিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্র সমূহে মাত্র এরূপ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। যে উদ্দেশ্যে আমরা গ্রন্থাগারের আলোচনা করিতেছি, তাহার সহিত এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারে বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই।

জন-শিক্ষার কাজে গ্রন্থাগারের বিশেষ উপযোগিতা আছে দেখা গিয়াছে। ইহা অবশ্য শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার।

দেশের গবর্ণমেণ্ট লোককে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন, দেশহিতৈষিরাও মনে করেন, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি শিক্ষার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু, তাহাতে ইহা বুঝায় না যে, যাহাতে আমরা, দোকানের হিসাব বুঝিতে পারিবার, খাজনা আদায় করিতে পারিবার, আত্মীয়-স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লিখিতে পারিবার এবং রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিবার মত বিদ্যার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারি, ইঁহারা সেইজন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেইজন্য অন্য লোকের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি ?

দেশের উন্নতির জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহার অর্থ আর একটু ব্যাপক। যাহাতে আমাদের মধ্যে পৌরচেতনা এবং পৌর কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত হয়, আমাদের সমাজে রাষ্ট্রের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের সাধারণ সমস্যাগুলি আমরা বুঝিতে পারি ; সহজে যাহাতে আমাদের অজ্ঞতাকে কেহ নিজের স্বার্থে নিয়োগ করিতে না পারে এবং সর্ব্বোপরি যাহাতে আমাদের শরীর ও মনের অলস ঔদাসীন্যকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উদ্যম ও আগ্রহ লাভ করিতে পারি, জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের এমন শিক্ষারই প্রয়োজন।

এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ে লাভ হইতে পারে না, অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত নহেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা এইজন্য বলিতেছি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা দেশের প্রত্যেক লোকের পক্ষেই সমভাবে দরকার এবং সকল লোকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ত কখনও সম্ভব হইবে না। কিন্তু গ্রন্থাগারের সাহায্যে এরূপ শিক্ষাবিস্তার সহজেই সম্ভব। এক বরোদা ব্যতীত আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষার চেষ্টা আর

কোথায়ও হয় নাই।

আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা করিলে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে পাঠাগারের সাহায্যে শিক্ষাবিস্তারের উপযোগিতা অধিক আছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন অচিরে তাঁহাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইবে, আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই পড়িবার আগ্রহ ও অভ্যাস কম। যাঁহাদের বিদ্যা অল্প, তাঁহাদের মধ্যে এই অভ্যাস একেবারেই নাই। কাজেই, এই প্রকারের অল্প বিদ্যা, ইহাদের নিজেদের যদিও বা কিছু কাজে লাগে, বুদ্ধির মাৰ্জ্জনা এবং মনের ঔদার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারায় সমাজকে ইহারা বিশেষ কিছু দান করিতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, যুক্তিবিমুখতা, নূতনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রভৃতি অজ্ঞতার কুফলগুলি কিছুমাত্র কম নহে। শিক্ষার একটা বিশেষ ফল, বাহিরের সহিত মনের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া মনের প্রসারতা বৃদ্ধি হয়। এ সব ক্ষেত্রে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই, আমাদের বর্তমান শিক্ষাকে বাহির হইতে পুষ্ট করিরার বিশেষ ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পূর্ণ সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে লক্ষিত হইবে না।

জাতীয় উন্নতিকর কোনও চেষ্টা যখন আমরা করিতে যাই, আংশিক ব্যতীত পূর্ণ সফলতা লাভ কখনও তাহাতে আমাদের হয় না। যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞলোকদের যদিও বা কিছু বুঝান যায়, অল্প শিক্ষিত লোকদের অজ্ঞতা একেবারেই দুর্ভেদ্য। কিন্তু, এরূপ দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে যে লোককে তাহার নিতান্ত হিতকর কোনও বিষয় কোনও ক্রমেই বুঝান যায় নাই, ছয় মাস ধরিয়া তাহাকে বাংলা দৈনিক পত্র পাঠ করিতে দিবার পর তাহার মতের আনুপূর্ব্বিক পরিবৰ্ত্তন হইয়াছে। যে ছাত্র নিজের পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে কোনও জগৎ আছে বলিয়া জানিত না, কিছুদিন ধরিয়া তাহাকে বাংলার ২।১ খানি শ্রেষ্ঠ মাসিকের পাঠক করিয়া দিবার পর দেখা গিয়াছে অন্য বিশেষ কিছু না পড়িয়াও সে up-to-date হইয়া উঠিয়াছে

আমাদের সমগ্রদেশ আজও পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থার কথাই ভাবা যা'ক, সর্ব্বপ্রথম আমাদের পল্লীর কথা মনে করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের পল্লীগুলির আর্থিক সামর্থ্য ও শিক্ষার অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে, প্রতি পল্লীতে অথবা ২।১ পল্লী অন্তর গ্রন্থাগার স্থাপন অনেকটা

অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা পল্লীতে অধিক না থাকায় ইহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারেও হইবে না। আবার অন্যদিকে যে অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের শিক্ষাকে বাড়াইবার চেষ্টাও অব্যাহত রাখিতে হইবে।

বাংলার পল্লীতে যে সকল পুস্তকাগার স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলিরই ইতিহাস ব্যর্থতার কাহিনী। কতকগুলি পুরাতন অকেজো বই সংগৃহীত হয়; ২।৩ খানি ক্রয় করা হয় এবং একটি ভাঙ্গা আলমারি ও ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল লইয়া মাস ছ'য়েক উৎসাহের সহিত কাজকর্ম্ম চলে; তাহার পর সব বন্ধ। তাহার পর ২।১ বৎসর অন্তর অন্তর ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা চলে। সহরের কথা বাদ দিয়া ইহাই বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ও করুণ ইতিহাস।

আসল কথা, বাংলাদেশে এই আন্দোলনকে সফল ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে ইহার রূপ বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। বাংলার পল্লীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, ইহার উপযোগিতাও বিশেষ নাই। গ্রন্থাগারের যে অংশ জনশিক্ষার কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা হইতেছে ইহার পাঠাগার বিভাগটি। পণ্ডিতেরা অথবা যাঁহারা বেশী কিছু শিখিতে চান, তাঁহারাই পুস্তকাদি পড়িতে চাইবেন। কিন্তু, সাধারণ পাঠকেরা সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকাদি দ্বারাই উপকৃত হইবেন।

গ্রামের শিক্ষা এবং জনসংখ্যা অনুসারে কোথায়ও প্রতি গ্রামে একটি, কোনও গ্রামে দু'টি, আবার কোথাও ৩।৪ গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপন করিয়া সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী পাঠাগার সঙ্ঘ গড়িয়া তুলা যাইতে পারে। যে সকল স্থান শিক্ষার খুব পশ্চাদ্বর্ত্তী সেখানে মাত্র ২।৩টি বাংলা সংবাদপত্র রাখিলেই চলিবে এবং যে সকল স্থান শিক্ষায় অগ্রসর, সে সকল স্থানে ইহার সহিত বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি রাখিলেই চলিবে। ইহাতে খরচ অধিক হইবে না এবং প্রতি স্থানে মাত্র একজন লোক উদ্যোগী হইলেই, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিবেন।

পল্লীগ্রামের পুস্তকাগারগুলি যে সকল কারণে নষ্ট হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, পুস্তকাদি নিয়মিত ধার দেওয়া, হিসাব রাখা এবং আদায় করা প্রভৃতি কাজ অবৈতনিক লোকের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না; পুস্তকাদি চুরি যায় এবং প্রথমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা প্রথমবার পুস্তক কিনিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। নানা কারণে পরে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আর কেহ

আর্থিক সাহায্য করিতে চায় না। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে পুস্তকাদি সংগ্রহ করা বা ধার দিবার প্রশ্নই নাই, অসুবিধা হইলে সংবাদপত্র রক্ষা না করিলেও চলিতে পারে। সাময়িক পত্রিকাদি প্রয়োজন হইলে, পাঠকেরা নিজেদের মধ্যে পালা-ক্রমে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। অন্ততঃ খুব অল্প পরিশ্রমেই একজন এই বণ্টনের কার্য্য করিতে পারেন। ইহার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন, লোকের একবার পড়া অভ্যাস হইয়া গেলে, তাঁহারা ততটুকু অতি সহজেই দিতে সম্মত হইবেন। যেখানে শুধুমাত্র সংবাদপত্রের প্রয়োজন, সেখানে মাসিক দুই টাকা হইলেই দু'টি বাংলা দৈনিক কাগজ গ্রহণ করা যাইবে; এবং ইহার সহিত মাসিক আর দুই টাকা যুক্ত হইলে, দু'খানি বাংলা দৈনিক এবং চারিখানি মাসিক গ্রহণ করা যাইবে।

ইহাতে বাংলা সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলির প্রসারের ক্ষেত্র এরূপ অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, সম্ভবতঃ পত্রিকা পরিচালকবর্গ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই প্রচেষ্টার সহযোগিতা করিবেন। জেলাবোর্ডগুলি যদি এরূপ পাঠাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন, তবে, কাজ আরও ভালভাবে চলিতে পারে। গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, গ্রাম্যবোর্ডগুলির কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে।

সংবাদপত্র পাঠে অল্প শিক্ষিতেরা দেশের সাধারণ খোঁজ-খবর রাখিয়া সর্ব্ববিধ ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য নিরূপণে কতকটা সমর্থন হইবেন এবং নিজেদের পারিবারিক জীবনের বাহিরে বৃহত্তর জগতের সহিতও যে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে সে সম্বন্ধেও কতকটা অবহিত হইবেন। অপর পক্ষে ছাত্র সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা সাময়িক পত্রিকাদিতে নিজেদের মানসিক শিক্ষা ও শক্তির কতকটা উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইবেন।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং চিন্তাশীল লেখকগণের প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রিকাগুলিতে লিখিয়া থাকেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী বহু লেখক আমাদের জীবনের সাময়িক এবং স্থায়ী নানাবিধ সমস্যা, নানাদিক দিয়া আলোচনা করেন। আধুনিক বাংলার চিন্তা ও ভাবের ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত, আমাদের নেতৃ-স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা আমাদিগকে কোনপথে চলিবার ইঙ্গিত করিতেছেন সাময়িক পত্রিকাগুলি আমাদের দ্বারে সে বাণী বহন করিয়া আনিবে। সাময়িক পত্রিকা-গুলিই আমাদের সাহিত্য এবং চিন্তার সর্ব্ব-প্রধান বাহন।

দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি আমার কথাগুলি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

মানুষ গড়ার কারখানা ঃ শিশু গ্রন্থাগার

স্বপনবুড়ো

জ্ঞানের স্পৃহা যদি অতি ছোট বেলা থেকেই জাগিয়ে দেয়া যায় তবে শিশু-চিত্ত আনন্দ-সলিলে অবগাহন করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এই সলিল যাতে স্বচ্ছ ও পঙ্ক-মুক্ত হয় সে দিকে বয়স্কদের দৃষ্টি দেয়া একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

আমাদের ছেলেবেলায় শিশু-চিত্ত-বিনোদনের বিশেষ আয়োজন ছিল বলে মনে পড়ে না। আমরা শৈশবে গ্রাম দেশে মানুষ হয়েছি। সেই সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে "শিশু" নামে একটি ছোট্ট শিশু-মাসিক প্রকাশিত হত। সারা গ্রামে এই ছিল ছোটদের মানসিক ভোজের আয়োজন। এই "শিশু" মাসিকটি যেদিন ডাকযোগে গ্রামে এসে পৌঁছুতো—সেদিন খেলার মাঠ ফাঁকা হয়ে যেতো। সবাই মিলে সেই ডাকঘরের পাশে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ার এসে সমবেত হত। কি করে ধাঁধার জবাব মিলবে—তাই নিয়ে সারা গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে চলতো প্রতিযোগিতা। একখানি ছোট কাগজ সমগ্র গ্রামের শিশু-চিত্ত যে কীভাবে জয় করে নিত—আজ সে কথা ভাবতে বসলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না!

আজকের দিনে আমাদের শিশু-সাহিত্যে আর সে দুর্ভিক্ষ নেই! কত রকমারী রঙীন ছড়ার বই, গল্প আর কাহিনী, দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ের কথা, আবিষ্কারের কাহিনী, বিজ্ঞানের বিস্ময়ে, শিকারের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি অভিনব মুদ্রণ পারিপাট্যে প্রকাশিত হয়ে শিশু-চিত্ত অবলীলাক্রমে জয় করে নিচ্ছে।

নতুন কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল ছোটদের মনে আপনা থেকেই বাসা বাঁধে। কিন্তু সেই কৌতূহলকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় একটি একমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে দিতে পারলে—তবেই শিশুর দল উপকৃত হবে। আর সেই জন্যেই চাই সুন্দর সজ্জিত শিশু-পাঠাগার।

শিশু-পাঠাগার গঠন করতে হলে—সকলের আগে বয়স অনুসারে বই বাছাই করা একান্তভাবে প্রয়োজন। পাঁচ বছর বয়েস থেকে ওদের বইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো প্রয়োজন। পাঁচ বছরের ছেলে মেয়েরা প্রথমে রঙীন ছবি দেখে ছড়ার

বিষয় বস্তুটা বোঝবার চেষ্টা করবে। তারপর বড়দের সহায়তায় মজার মজার ছড়া মুখস্থ করবে। এই ব্যাপারে মায়েদের আগ্রহ থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। মুখে মুখে আবৃত্তি করে শোনাতে পারলে ছোটরা যে কোনো পড়া-ছন্দ অতি সহজেই মুখস্ত করতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পুরাণের গল্প, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, দেশবিদেশের ছেলেমেয়েদের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের গল্প, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রভৃতি পড়বার সুযোগ দিতে হবে।

ওরা যদি প্রথমে ভালো করে বুঝতে না পারে তা হলে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হবে—সেই বইগুলির বিষয়বস্তু গল্পের মতন করে ছোটদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া। পড়বার নেশা একবার পেয়ে বসলে—জীবনে আর কোন নেশাই—তাদের কাছে এগুতে ভরসা পাবে না। পড়ার নেশা হচ্ছে জীবনের সেরা নেশা।

একটি ছেলে সবকিছু জানবার আগ্রহে নিজের মাকে সব সময় বিরক্ত করত। মা মৃদু হাস্যে শুধু উত্তর দিতেন,—"Read & you will know"—এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজের পুত্রের পড়বার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পল্লী অঞ্চলের গেরস্থ বৌরা প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে দিয়ে দেয় একটি ছোট্ট কাঠি। প্রদীপ যদি নিবু নিবু হয়ে আসে, তাহলে ওই কাঠি দিয়ে প্রদীপটি উস্কে দিতে হবে। প্রতিটি শিশুর অন্তরেও এমনি ভাবে জ্বলছে একটি অদেখা মাটির প্রদীপ। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছে "অন্তর প্রদীপখানি।" সেই অন্তর প্রদীপখানি উস্‌কে দিয়ে বিকশিত করে তুলতে হবে। শিশুর জানবার আগ্রহ অপরিসীম। নতুন নতুন মজাদার বিষয়বস্তু পরিবেশন করে তার সেই আগ্রহকে কেবলি বাড়িয়ে দিতে হবে। একবার আসল রাস্তাটি খুঁজে নিতে পারলে শিশু তার আপন আনন্দেই অগ্রসর হয়ে যাবে।

শিশুরা যেখানে বসে বই পড়বে—তার পরিবেশটি অতি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে ছোটদের আঁকা নানারকম ছবি থাকতে পারে। শিশু সাহিত্যিকদের আলেখ্য এখানে ঝোলানো থাকতে পারে। তা ছাড়া দেশের মনীষীদের চিত্র ও বাণী পাঠাগারের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। শিশু পাঠাগারের প্রাচীর চিত্র এমন হবে যে, তা যেন ছোটদের কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করবার কাজের সাহায্য করতে পারে। সেই বিশেষ সৌন্দর্য-মণ্ডিত স্থানটিতে গিয়ে বস্‌লেই যেন শিশুর কল্পনা পক্ষীরাজের পিঠে চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসা ছাড়িয়ে একেবারে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীর আস্তানায়

গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। অথবা ছোটদের কল্পনা বিলাসী মন সপ্ত ডিঙা মধু করে সোনালী পাল তুলে দিয়ে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে উধাও হয়ে যেতে পারে।

ছোটরা যাতে আজে-বাজে বই পড়ে অকালে বদ হজমের সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে মায়েদের ও অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্বও এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সকলের সস্নেহ দৃষ্টিপাতে যে সুন্দর শিশু-পাঠাগারটি গড়ে উঠবে—তাতে অবসন্ন সময়ে অতিবাহিত করে শিশুর দল তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার মণি মঞ্জুষায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে তাঁর হাজার রকম কাজের মাঝেও শিশুদের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি। তিনি চিরকাল নিজের পরিচয় দিয়েছেন, "আমি স্কুল পালানো ছেলে।"

কিন্তু এই স্কুল পালানো ছেলেটি চিরজীবন ধরে চিন্তা করেছেন—কি ভাবে শিশুদের নতুন ধরণের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নিজের ছেলেবেলার আনন্দহীন দগ্ধ নিরস দিনগুলির কথা ভেবেই তিনি সর্বস্ব পণ করে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়ে মৃণালিনী দেবী কবিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সে সব দিনের কথা আজ ইতিহাস হয়ে আছে।

একথা ভাবলে আজ বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করে ছোটদের জন্যে স্কুল পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া নিজ হাতে কোদাল ধরে তিনি ছোটদের তৃপ্তি বিধানের জন্য নতুন রাস্তা তৈরী করেছেন। সেই পথের দুই ধারে তিনি অজস্র ছায়া-শীতল বৃক্ষরোপণ করেছেন—যাতে সেই পথ চলতে গিয়ে শিশুপ্রাণ অকারণে রৌদ্র দগ্ধ হয়ে অকালে ঝরে না পড়ে।

কবির কাছ থেকে আমরা যে কত বিচিত্র শিশু-সাহিত্য-সম্ভার লাভ করেছি—তাকে কখনোই অতি বিশেষণে ভূষিত করা চলে না।

নিজের চিরকালের শিশুমনটিকে পাথেয় করে তিনি দু হাতে পরিবেশন করে গিয়েছেন—ছড়া, খাপছাড়া, কথা, কাহিনী, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ, কৌতুক আরো কত কি। তাঁর নিজের ছেলেবেলার কথা আর জীবন স্মৃতিই বা কি অপূর্ব ভাষায়

তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন! শিশুদের অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে এমন দরদ-মাখানো ভাষায় রচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

জগদানন্দ রায়কে দিয়ে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের কথা লিখিয়েছেন। এই জাতীয় শিশু-সাহিত্য ইতিপূর্বে আমাদের বাঙলা ভাষায় আদৌ ছিল না। নিজের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকে বাঙলা ভাষায় গাছ-পালার কথা লিখতে উৎসাহিত করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছোটদের কাছে বিশ্ব সাহিত্যের গল্প সহজ ভাষায় বলতেন। তাঁর বলবার ধরণ এত মনোমুগ্ধকর ছিল যে, কবি কবে তাদের গল্প শোনাবে—সেই মধু মুহূর্তের জন্যে তারা দিন গণনা করত।

দক্ষিণারঞ্জন আর অবনীন্দ্রনাথ—এই দুই দিকপাল লেখককে শিশু সাহিত্যের রূপকথার দিকে টেনে নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তা নইলে আমরা কি দক্ষিণা রঞ্জনের কাছ থেকে পেতাম—ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি, ঠানদির থলে, বাঙলার রূপকথা আর চারু হারু প্রভৃতি অপরূপ শিশু সাহিত্য? কাকার কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে অবনীন্দ্রনাথ দুহাত উজাড় করে আমাদের দিয়েছেন, শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ভূত-পেত্নীর দেশ, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা প্রভৃতি অননুকরণীয় মধু ভাণ্ডার।

আর এই সব মজার মজার বই ছোটরা পড়তে পারবে কোথায় যদি পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের জন্যে পাঠাগার গড়ে না ওঠে?

সব পেয়েছির আসর গত পনেরো বছর ধরে সারা দেশময় শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। এবিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে দান—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কি শহরে, কি গ্রামে—শিশু গ্রন্থাগার মানুষ গড়ার কারখানারূপে কীর্তিত হোক—এই কামনা।

শিশু-সাহিত্য ও শিশু পাঠাগার

নরেন্দ্র দেব

শিশু-সাহিত্য বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে সেটার আমদানী হয়েছে খুব হালে। সংস্কৃত ভাষাই যখন এখানে শিক্ষার বাহন ছিল তখন বিষ্ণুশর্ম্মার "পঞ্চতন্ত্র" ও হিতোপদেশ" ছিল শিশু শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বলা বাহুল্য যে হিতোপদেশে ছেলেদের উপযোগী অনেক হিতকথাই গল্পচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। 'মিত্রলাভ', 'সুহৃদ্ভেদ', 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি' এই চারটি বিষয়কে ভিত্তি ক'রে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থে গল্পের আকারে যে নীতিকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে তিনি ছিলেন কোনো উচ্চশিক্ষিত রাজা। আপন পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য শিশু সাহিত্যের একান্ত অভাব দেখে তিনি স্বয়ং ছেলেদের পাঠোপযোগী এই নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্রে' এর প্রমাণ আরও সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। কারণ 'পঞ্চতন্ত্রে' তিনি গল্প ও উদাহরণচ্ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ের সমাবেশ করেছেন। রাজপুত্রগণের পক্ষে এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন যতটা ছিল গৃহস্থের ছেলের ততটা নয়, তথাপি বাঙ্‌লা ভাষায় যখন শিশু-শিক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হ'য়েছিল, তখন শিশুসাহিত্য বলতে আমাদের নিজস্ব কিছু না থাকায় এই বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশই' বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়ে সেদিন শিশুসাহিত্যের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছিল। পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ 'পঞ্চতন্ত্র' অনুবাদ করেছিলেন এবং পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় 'হিতোপদেশ' অনুবাদ ক'রে সেকালে আমাদের শিশুসাহিত্যের অভাবজনিত লজ্জা দূর করেছিলেন। তারপর আমরা পেয়েছিলেম বটতলার প্রকাশিত শিশুবোধক। এই বটতলার প্রকাশিত শিশুবোধক সেকালে যেমন করে শিক্ষার সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল এমন আর সেদিন কিছুতে হয়নি। সেই প্রচ্ছদপটের উপর নগ্নগাত্র চাণক্য পণ্ডিতের দীর্ঘ শিখা সংযুক্ত প্রতিকৃতি আজও মনে পড়ে! সেই 'বন্দেমাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি'—মকরবাহিনী গঙ্গার এই সুমধুর বন্দনা আমরা আজও ভুলিনি। দাতাকর্ণের মহান ত্যাগ এমন করে আমাদের মনে আর কেউ এঁকে দিতে পারেনি।

কিন্তু, সে যাই হোক, 'শিশুবোধক'কে তথাপি ঠিক শিশুসাহিত্যের পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে না। কারণ ওর মধ্যে আরও এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ ছিল যার সঙ্গে সাহিত্য বিভাগের কোনো সম্বন্ধ নেই, কাজেই ও বইখানি তদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকের তালিকার মধ্যেই থেকে যাবে, যেমন থেকে যাবে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন ইংরাজী জানা প্রগতি-পরায়ণ পণ্ডিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। সেদিন সিড্‌নী স্মিথ, কোলরীজ, সাদ্রে, ল্যাম্ব, কার্লাইল, মেকালে, থ্যাকারে, নিউম্যান, রাস্কিন, ডিকেন্স্‌, ম্যাথু আর্ণল্ড, হাক্সলে, আর এল ষ্টিভেন্সন্‌, লর্ড টেনিসন্‌ প্রভৃতি একাধিক মনীষী শুধু ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ নয়, শিশু চিত্তকে বলিষ্ঠ ও নির্ভীক এবং তাদের চরিত্রকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর এই সময় নানা ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্‌লা ভাষায় শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্কুলপাঠ্য হিসাবে রচিত হ'লেও ঈশপের গল্প নিয়ে রচিত বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'কেই বোধহয় বাঙলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের প্রথম অবদান বলা যেতে পারে।

ভাস্বরকো নামঃ সিংহ এবং পাপবুদ্ধি ও ধর্ম্ম বুদ্ধির সংসর্গ পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের আবহ ও প্রভাব কাটিয়ে শিশুসাহিত্য এখন থেকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে সুরু করে। শুষ্ক নীরস পাঠ্যপুস্তকের প্রবন্ধের প্রতি শিশুর মনোযোগের একান্ত অভাব, অথচ গল্পচ্ছলে লেখা সরস সচিত্র নীতিগ্রন্থ তারা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে—'বোধদয়কে' তারা ভয় করে কিন্তু, কথামালার সঙ্গে তাদের একান্ত অন্তরঙ্গতা,—'পদার্থ কয়প্রকার?' এ প্রশ্নে তাদের কচিমুখ বাসিফুলের মত শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে এসব জটিল তত্ত্বের খবর তারা রাখতে না পারলেও ধূর্ত্ত শৃগালের নিমন্ত্রণে সারস পক্ষী এসে কি ভাবে ঠকে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল—হাসিমুখে ও প্রফুল্ল কণ্ঠে তারা সে বিবরণ দিতে পারে। শিশু মনস্তত্ত্বের এ পরিচয় অবগত হবার পর ক্রমে পাঠ্যপুস্তকের রূপ পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এদেশেও শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন সুরু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' ছোটদের জগতে একটা সাড়া এনে দিয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি খুসি' ও 'খুকুমণির ছড়া' শিশুরাজ্যে এক আনন্দ উৎস উৎসারিত করেছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

'ঠাকুরদাদার ঝুলি' নিয়ে এখনো ছেলে মেয়েরা কাড়াকাড়ি করে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের হাতে 'ক্ষীরের পুতুল' গড়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নদী ও শিশু রাজা ও মুকুট তাদের মন ভুলিয়েছে। ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চোধুরী, শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়, ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৺সুকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি একাধিক সুলেখক বাঙ্‌লা ভাষায় শিশুদের মনোরঞ্জনে সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমান্ সুনির্ম্মল বসুর ছন্দের টুং টাং ইত্যাদি বহু পুস্তক ছেলে মেয়েদের হাতে ভাষার ধ্বনিমধুর ঝুমঝুমি তুলে দিয়েছে। শ্রীমান অখিল নিয়োগী নানা চিত্রে ও কথায় তাদের কলকণ্ঠে হাসি ফুটিয়েছেন।

এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছেলেদের জন্য বাংলা মাসিকপত্রও দেখা দিয়েছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের 'সখা'ই বোধ হয় বাঙ্‌লা ভাষায় ছেলেদের প্রথম মাসিকপত্র। ১৩০০ সালে প্রকাশিত ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' ১৩০১ সালে 'সখা'র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশ হ'য়েছিল। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩০২ সালে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। তারপর, বিংশ শতাব্দীর যুগ। এ যুগে "সন্দেশ", "মৌচাক", "শিশু-সাথী", "খোকাখুকু", "রামধনু" প্রভৃতি একাধিক মাসিকপত্র বাঙ্‌লার শিশুদের চিত্তবিনোদনে সচেষ্ট রয়েছে। আজকাল ছেলে মেয়েদের জন্য বিবিধ 'বার্ষিক'ও প্রকাশ হ'তে দেখা যাচ্ছে। ছোটদের 'গল্প সঞ্চয়ন', 'ছোটদের চয়নিকা' 'ছোটদের বার্ষিকী' প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকও আমাদের শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। কালে হয়ত ওদেশের মত এদেশেও ছেলেদের জন্য বিচিত্র সুন্দর 'সাপ্তাহিক' ও 'দৈনিক পত্রিকা'ও দেখা দেবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এরূপ পত্রিকা একাধিক প্রকাশিত হয়। অধুনা জাপান, তুরস্ক, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেও এর প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝতে পেরে ছেলেদের জন্য বিশেষভাবে সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেছে।

এদেশের শিশু সাহিত্যের এই অর্দ্ধ শতাব্দী কালের নিদর্শন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে উদ্ঘাটন ক'রে ধরেছে যে—শুষ্ক পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ অপেক্ষা সরস সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সহজ শিক্ষাই শিশুদের সমধিক আকর্ষণ করে। তারা পড়ার বই পড়ে যা না শেখে তার চেয়েও অনেক বেশী শেখে ছড়া ও গল্পের বই পড়ে। 'টেক্‌ষ্ট বুক' অপেক্ষা 'আউট বুকের' প্রতিই তাদের অনুরাগ অধিকতর। 'কুজ্ঝটিকা' বানান করতে বললে যে ছেলের চোখের সামনে পৃথিবীর আলো ঝাপসা হয়ে আসে, ভুবনের মাসীর কথায় কিন্তু তার মুখে হাসি ফোটে। 'একদা এক

বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এ খবর সেদিনের সকল ছেলেই রাখতো। 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' এমন কি 'লাল ফুল' ও ছেলে ভুলে যায়, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কিন্তু তার আদ্যোপান্ত মুখস্থ থাকে। আমাদের 'শুভঙ্কর' এ সংবাদ জানতেন, তাই কঠিন অঙ্ক শাস্ত্রকে তিনি করেছিলেন কবিতার সাহায্যে ছন্দের বন্দনে সহজায়ত্তকর।

"কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে—" শুভঙ্করের ছাত্রেরা আজও কেউ ভোলেনি।

পাঠাভ্যাসের সময় খেলায় রত ছেলেদের ভৎর্সনা ক'রে পড়তে বললে তারা যে যার বই খুলে বসে দুলে দুলে সুর ক'রে পড়তে সুরু করে—

"রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন
কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ—"

কেউ বা অকারণ উচ্চৈস্বরে কণ্ঠস্থ করে—

"কি খাব মা কি খাব মা
বড় ক্ষুধা পেয়েছে—"

কেউ বা একান্ত গদগদ কণ্ঠে আওড়ায়—

"রামেদের বুধি গাই প্রসব হইল,
রাম শ্যাম দুই ভাই দেখিতে আসিল—"

পণ্ডিত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসুর "পদ্যমালা" ও "পদ্যপাঠেরই" সেদিন থেকে আজও পর্য্যন্ত শিশু মহলে জয় জয়কার!

'ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিং নগরে' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইতো না। 'সিন্ধু ঘোটক' বা 'বিবরের' সন্ধানে পাঠ্যপুস্তকে মনঃসংযোগ ক'রে কোনো ছেলেই তখন ডুবাল হয়ে উঠতে অগ্রসর হ'ত না। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ শিশু মনোরঞ্জনে পদ্য পাঠের কাছে হার মেনেছে। এতে যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে এই, যে—ছেলেরা স্বভাবতঃই ছন্দলোভী ও গদ্যভীরু!

শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে বর্তমান জগতে শিশুশিক্ষার জন্য নানা নূতন বৈজ্ঞানিক উপায় প্রচলিত হয়েছে এবং হ'চ্ছে। 'কিণ্ডার গার্টেন্'-প্রণালী জার্ম্মানী থেকে জগতে জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার পরীক্ষা সর্ব্বত্র শেষ হ'তে না হ'তে আজ আবার অভিনব 'মন্টেসেরী' পদ্ধতির প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার নব নব ধারার সঙ্গে যুরোপে আধুনিক শিশু সাহিত্যের গতিও প্রকৃত

পরিবর্তিত হ'তে শুরু হ'য়েছে। কিন্তু, আমাদের দেশের শিশু সাহিত্য আজ এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসেও এখনও ওদেশের উনবিংশ শতাব্দীর নাগাল ধর'তে পারেনি। এটা দুঃখের বিষয় হ'লেও একথা ভুললে চলবে না যে শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে সাহিত্য গড়বার দিকে আমাদের লক্ষ্য পড়েছে অতি অল্পদিন মাত্র। কাজেই আমাদের শিশুসাহিত্য এখনও ওদের সহযাত্রী হ'তে পারেনি।

সুকুমারমতি বালক-বালিকারা যে অল্পবিস্তর পেটুক এ খবর বোধ করি কারুর অবিদিত নেই। কিন্তু, এই রসনা পরিতৃপ্তির প্রলোভনের মতই তাদের মনের ক্ষুধা ও জ্ঞানের লালসাও যে অত্যন্ত প্রবল এ খবর হয়ত' আমরা অনেকেই রাখিনি। কেন যে তারা চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য বায়না ধরে, সার্কাস্ দেখবার জন্য কাঁদে, ইংরাজী বাজ্‌নার আওয়াজ পেলেই শত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কেন যে তারা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এ নিয়ে আমরা কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু, এসব নিয়ে ভাবা এবং এর কারণ জানা এদেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের একান্ত কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার মানসিক শক্তির উন্নতি ও বিকাশের জন্যও সেই রকম শিশুমনেরও প্রয়োজনীয় খাদ্য তাদের সরবরাহ করাও সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। শিশুমনের উপযোগী পুষ্টিকর আহার্য্য সে তার স্কুলপাঠ্য কেতাবে খুঁজে পায় না। সে আহার্য্য তাকে যোগায় যোগ্যতর শিশুসাহিত্য।

বিশুদ্ধ আলো বাতাস এবং খাদ্য ও পেয় যেমন শিশুর দেহকে সুস্থ সবল পুষ্ট ও পরিণত ক'রে তোলে, সুকুমার সৎসাহিত্যও তেমনি শিশুর সকল প্রকার মানসিক উন্নতি ও কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত করার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু, পড়ার বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়তে দেখ্‌লে এখনও অনেক অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের তিরস্কার করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন—ওটা শুধু ছেলেদের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় নয়, অন্যায়ও বটে। কিন্তু, তাঁদের জানা উচিত যে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে ছেলেদের আটকে রাখলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। তবে এ কথাটাও ঠিক যে তা ব'লে নির্ব্বিচারে যে-কোনো বই ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যেমন বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়, অন্যথায় শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি শিশুর পক্ষে অপাঠ্য কোনো বইও তাকে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তকের তালিকার বাইরে কেবলমাত্র সেই সাহিত্যই তাদের পড়তে দেওয়া যেতে পারে যা তাদের শিশু মনের

রসবোধের অনুকূল এবং তাদের মানসিক কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের সঙ্গে জ্ঞানোন্মেষেরও সহায়ক।

অতএব শিশুসাহিত্য এমন হওয়া প্রয়োজন যা উত্তরকালে শিশুকে তার জীবনে আদর্শ নির্ব্বাচনে সাহায্য ক'রতে পারবে। তার কল্পনাকে জাগ্রত ও বিচিত্র করে তুলবে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করে দেবে। তার চরিত্র ও প্রকৃতিকে মহৎ ও উদার ক'রে গড়ে তুলবে। শিশুসাহিত্যই শিশুদের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি বিকাশ পরিপূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধির সাধনে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে। জাতি গঠনের প্রথম সোপান এই শিশুসাহিত্য। সুতরাং শিশুসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে সাহিত্যিক মাত্রেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

আমাদের এখানে শিশু সাহিত্যের নামে যা কিছু এ পর্য্যন্ত চলেছে তাতে দেখা যায় যে অতি শৈশবকাল থেকে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত এদেশের ছেলেরা এতদিন যা শিখে এসেছে তা শুধুই 'রোম্যান্স্!' নিরর্থক ভাব-সর্ব্বস্ব কল্পনা-বিলাস মাত্র। কুঁড়ে ঘরের মেটে দাওয়ার উপর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আমাদের পল্লীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যা প্রদীপের স্তিমিত আলোকে শোনে "এক যে ছিল রাজা তার দুই রাণী—দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী।" কিম্বা রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র এই তিন বন্ধুর বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারানো. রাজকন্যার স্বপ্ন দেখা, রাক্ষস খোক্কস দৈত্য দানার কথা—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত' তারা পায় সেই সরোবরে ডুব দিয়ে কৌটার ভিতর 'ভোমরা ভুম্‌রী' নয়ত তালপত্রের খাঁড়া পক্ষীরাজ ঘোড়া অথবা সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠির যাদুস্পর্শ;

ফলে আমাদের দেশের ছেলেরা হ'য়ে ওঠে কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ। আজ তাই কবি ও' সাহিত্যিকের ভীড় জমে উঠেছে দেশে, কিন্তু, নিরলস ও অক্লান্ত কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া যায় না বেশী। আজ বাঙালীর ছেলেরা কেউ দুঃসাহসী বীর হ'য়ে উঠবার স্বপ্ন দেখে না। বিপদকে তুচ্ছ ক'রে মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার মত নির্ভীক হ'য়ে ওঠে না তার মন; মেরু আবিষ্কারে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার কোনো উৎসাহ নেই তার বুকে। গৌরী শৃঙ্গে উঠতে সে এগিয়ে যায়নি আজও! মোটের উপর আজও তার আত্মবিশ্বাস এবং আপন শক্তির উপর অটুট নির্ভরতা জাগেনি। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে তারা শেখে দৈব-নির্ভরতাটাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে! তাই পরবর্তী জীবনে তার সংসার যাত্রাপথে যদি কথনো তেপান্তরের মাঠ উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন হয় সে তখন্ পক্ষীরাজ ঘোড়ার আশায় দৈবের মুখ চেয়ে খোঁড়া হ'য়ে বসে থাকে। নিজের

পায়ের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে ভয় পায়! সে জানে সাতশ ভরা ডিঙি নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করলেও ঝড় তুফানে সাগর তাল সওদাগরের সব তরণীই ডুবে যাবে যদি না মা লক্ষ্মী কৃপা করে মুখ তুলে চান। সে জানে ভাগ্য মন্দ হ'লে পোড়া শোলমাছও নিশ্চিত তার মুঠোর ভিতর হ'তেও পালিয়ে যাবে; কারণ আশৈশব তার সুকুমার মনের উপর এই দৈবাধীন বিশ্বাসই বারম্বার দেগে দেওয়া হয় যত কিছু রূপকথা, ব্রতকথা, অতীত কাহিনী ও পুরাণের গল্পের ভিতর দিয়ে।

তাই, আমাদের ছেলেরা রবিন্সন ক্রুশোকে সহসা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হ'তে দেখেও মনে প্রাণে সেটাকে তার কৃতিত্ব ব'লে মেনে নিতে পারে না। ভাবে সে নিতান্ত ভাগ্যবান! তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই প্রয়োজন মত সেই নির্ব্বান্ধব দ্বীপে সবই তার কপালে জুটে গেল।

এই যে কপালে জুটে যাওয়ার আশায় ভাগ্যের উপর বরাত দিয়ে বোকার মত বেকার বসে থাকা—এদেশে ছেলেদের একেবারে মজ্জাগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যাবে যে, এদেশের শিশুসাহিত্যই ছেলেদের এই দুর্ব্বলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। তারা যে ইচ্ছা করলে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে পারে—ভাগ্যকে জয় করা যে তাদের সাধ্যায়ত্ত এ শিক্ষা তারা পায় না।

সকল ছেলেরই রূপকথা বা ফেয়ারীটেল্‌সের বিশিষ্ট ধারা ও পর্য্যায়ের অনুকূল একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে। তার আগে 'নার্সারী রাইম্‌ বা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' ও 'ঘুমপাড়ানী গান'ই শিশু দস্যুদের শান্ত রাখে। কিন্তু শিশুর মন তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে থাকে শিশু সাহিত্যের রূপ ও রং-ও যে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া ও অগ্রসর হওয়া দরকার একথা ভুলে থাকলে চলবে না। চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন:—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ॥"

চাণক্য পণ্ডিতের এই উপদেশ যদি আমরা ঠিক অনুসরণ করতেম তা'হলে বাঙ্‌লা দেশের ছেলেরা হয়ত অনেকেই এমন অমানুষ হত না। কিন্তু ছেলে মানুষ-করা সম্বন্ধে এ দেশের অভিভাবকেরা অধিকাংশই অজ্ঞ। তাঁরা নিজেদের খেয়াল খুসি অনুসারে চলেন। ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারের তাঁদের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁরা কেউ হয়ত' পুত্রকে

'পঞ্চবর্ষ' 'দশবর্ষ' ছেড়ে একেবারে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নিতান্ত শিশুর মতই লালন করেন ; সে ছেলে বড় হয়েও আদুরে খোকাই থেকে যায়। আবার কেউ হয়ত আমরা 'লালয়েৎ'টার পরিবর্ত্তে 'তাড়য়েৎ'টাই পছন্দ করি বেশী, এবং সেইটেই নির্দ্দয় ভাবে চালিয়ে যাই 'ষোড়শ বর্ষের' অনেক অধিক বয়স পর্য্যন্ত! কাজেই 'পুত্র' আমাদের 'মিত্র' না হ'য়ে শত্রুই হ'য়ে ওঠে অধিকাংশ স্থলে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর লালনের বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে তারই মধ্যে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে শোনানো উচিত ওই ছেলে-ভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানী গান, অর্থাৎ যার মাথামুণ্ডু কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সুরের একটা সুমধুর ধ্বনি ও তান মান লয়ে মেলা ছন্দের একটা অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা আছে, যা শিশুর সুবোধ চিত্তকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। ছড়ার ছন্দ ও গানের সুর শিশুর কানে যে ঝঙ্কার তোলে তারই রেশ থেকে কালে একদিন তার সুরবোধ ও ছন্দজ্ঞানের উন্মেষ হয়। তারপর ধীরে ধীরে যখন তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হ'তে থাকে তখন সে আশে-পাশে যা দেখে সেগুলির পরিচয় সবিশেষ জানবার জন্য তার মনের মধ্যে একটা ব্যগ্র কৌতূহল অনুভব করে। এই সময় শিশু তার অভিভাবকদের নিত্যনিয়ত সহস্র প্রশ্নের দ্বারা শুধু বিরক্ত নয়, বিপন্ন করেও তোলে। এই সময় অনেক অভিভাবক ছেলেদের ধমক দিয়ে নিরস্ত করতে চান। "ও সব তুমি বুঝতে পারবে না" বলে এড়াতে চান, কিম্বা "বড় হ'লে জানতে পারবে" ব'লে ভুলিয়ে রাখেন। কারণ ছেলেদের সেই অনন্ত জিজ্ঞাসা—মেঘ ডাকে কেন? বাতাস বয় কেন? বিদ্যুৎ চমকায় কেন? বৃষ্টি পড়ে কেন? আলো জ্বলে কেন? সূর্য্য রাত্রে কোথায় থাকে? চাঁদ দিনের বেলা ওঠে না কেন? রামধনু সাতরংয়ের হয় কেন? এই অসংখ্য 'কেন'র উত্তর মা, ঠাকুরমারা দূরে থাকুন, বিজ্ঞ জ্যাঠামশাই, দাদামশাইরাও চট ক'রে দিয়ে উঠতে পারেন না। মা, ঠাকুরমারা এক্ষেত্রে প্রায়ই বরুণদেব পবনদেব প্রভৃতির শরণাগত হন ; কিন্তু বাবা খুড়ারা এত সহজে পরিত্রাণ পান না। 'প্রকৃতি পরিচয়' প্রকৃষ্ট রূপে পড়া নেই যাঁদের, ছেলেদের এ প্রশ্নজালে তাঁরা একান্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েন এবং কোনো রকমে যা'হোক একটা কিছু তাদের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের মান বাঁচাবার চেষ্টা করেন। এগুলো আরো খারাপ, কারণ এর ফলে ছেলেরা অনেক কিছু ভুল শেখে যা সহজে তাদের মন থেকে মুছতে চায় না। স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে সহিষ্ণুভাবে এই সময় ছেলেদের সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়ে তাদের নানা বিষয়ে সহজ শিক্ষা লাভ সুগম ক'রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাঁচ বছরের ছেলের হাতে খড়ি হয়। এই সময় ছেলেদের কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হ'তে দেখা যায়। তারা চোখে দেখা সব কিছু ছাড়া, তাদের কানে শোনা অনেক কিছুরও সঠিক খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হয়। তারা বনের বাঘ ভাল্লুকের গল্প শুনতে চায়। শুক সারীকে খুঁজে ফেরে! আলোর পরীকে দেখবার জন্য আকাশের পানে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। পাতাল পুরীর বন্দিনী রাজকন্যার দুঃখে তাদের দুই চক্ষু সমবেদনার জলভারে ছল ছল করে ওঠে। তাদের এই কিশোর কোমল কল্পনা-প্রবণ তরল মনের উপর এই সময় এমন অনেক কিছু শুভ ও সুন্দর অভিজ্ঞান মুদ্রিত ক'রে দেওয়া যেতে পাবে, যা উত্তর কালে তাদের চরিত্র গঠনে বন্ধুর মত সহায়তা করবে এবং জীবনের ভবিষ্যৎ গতিপথ সত্যের দিকে নির্দ্দেশ করে দেবে।

এই উদ্দেশ্যই শিশু সাহিত্যেব প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বর্ণ পরিচয়ের প্রথম মুখপাতেই সুকুমার মতি শিশুকে যদি 'সুষমা' বানান করতে তালব্য মূর্দ্ধাণ্য ও দন্ত্য এই ত্রিবিধ শ'কারের বিভ্রাটে পড়তে হয় এবং তদুপরি হ্রস্ব না দীর্ঘ উ'কার দিলে তবেই সুষমার 'সু' ঠিক কু হয়ে উঠবে না এই নিয়ে উদভ্রান্ত হ'তে হয়, দু'টো 'জ'য়ের যাঁতায় ঘুরে—দু'টো 'ণ'য়ের খোঁচা খেয়ে প্রতিপদে যদি তাকে কাঁদতে হয়, তাহ'লে এ দেশের শিশুদের কাছে পাঠশালা'ত কারাগারের অধিক বিভীষিকা উৎপাদন করবেই, এ আর বিচিত্র কি? সুতরাং, শিশুদের জন্য এখন নূতন করে আমাদের এমন সরল ও সুখপাঠ্য বর্ণ পরিচয় লেখা চাই, যার আস্বাদ গ্রহণে তারা ভয় না পেয়ে, চকোলেট্ ও লজেঞ্জেসের অনুরূপ আসক্তি নিয়ে সমান আগ্রহেই অগ্রসর হবে। তাহ'লে আর কোনো অভিভাবকেই 'লেখা পড়া' তাঁর ছেলের পক্ষে 'বাঘ' হয়ে উঠেছে ব'লে আক্ষেপ করতে হবে না।

কি 'রূপ'-কথায়', কি 'শিশু সাহিত্যে' কোথাও কখনো এমনতর কোনো ভূত প্রেতের গল্প থাকা উচিত নয় যা শিশুচিত্তকে ভীতবিহ্বল ক'রে ফেলে। ভয় প্রাণী মাত্রেরই একটা সহজাত দুর্ব্বলতা। এই ভয়কে জয় করাই মানুষের সাধনা হওয়া উচিত। শৈশব হ'তে শিশু যাতে 'অভীঃ' হ'তে শেখে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। সেকালে ভূতের ভয় থেকে শিশু চিত্তকে মুক্ত রাখবার জন্য তাদের এই মন্ত্র শেখানো হ'ত—

"ভূত আমার পুত, শাঁক চুন্নী আমার ঝি—
বুকে আছেন রাম লক্ষ্মণ—ভয়টা আমার কি?

রূপকথার ভিতর দিয়ে তাদের এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হ'ত যে ভূত

প্রেত দৈত্য দানা প্রভৃতি অলৌকিক জীবেরা শক্তিশালী মানুষের কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করতো। ছেলেদের কাছে 'মনুষ্যকে' যদি এই-ভাবে সকল দিক দিয়ে সবার ক'রে তুলে ধরে নির্ভয় হ'তে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহ'লে সে ছেলেকে মানুষ হ'তেই হবে। শিব গড়তে আর বানর হবে না। ভয় মানুষের চরিত্রকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দেয়। এই দুর্ব্বলতাই কাপুরুষতার নামান্তর। সুতরাং ঘোর অন্ধকারময় তিমির রাত্রির ভয়াবহ রহস্যের মধ্যে শিশু মনের যে একটা স্বাভাবিক গূঢ় আকর্ষণ আছে, শিশু সাহিত্যের কর্ত্তব্য নয় তাই নিয়ে কারবার করা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকাল ছেলেদের জন্য রচিত একাধিক গল্পের বই ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কাটতির প্রলোভনে এই অপকর্ম্মই করা হচ্ছে।

অনেকে মনে করেন শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করা খুব সহজ কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে বড় দায়িত্ব ও কঠিন কর্ত্তব্য আর নেই। সমস্ত জাতির চরিত্র গঠিত করে এই শিশু সাহিত্য। শৈশবে যে বীজ বপন করা হবে শিশুর মনে উত্তরকালে তাই অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে তাদের জীবনে। যিনি দেশ জাতি সমাজ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত নন, শিশুমনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁর নিবিড় পরিচয় নেই, শিশুর রসবোধের মাপকাঠি যাঁর অজানা, তেমন লোকের পক্ষে শিশু সাহিত্য রচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁরা শিক্ষিত যাঁরা চিন্তাশীল যাঁদের নিপুণ হস্ত সতত দক্ষতার সঙ্গে লেখনী পরিচালনায় সুপটু শিশু সাহিত্যে হাত দেওয়া তাঁদেরই সাজে। অপটু অশিক্ষিত লেখকের এ কাজ নয়। কারণ তাঁরা শুধু শিশুমনস্তত্ত্বেই অনভিজ্ঞ নন, শিশুর শিক্ষা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি ও রচনা প্রণালী তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও রসবোধের ক্রমবিকাশ এবং তদনুকুল জ্ঞান ও শিক্ষার স্তরভেদ অনুসারে শিশু সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় সম্বন্ধে যাঁরা একান্ত অজ্ঞ শিশু সাহিত্য রচনার পক্ষে তাঁরা সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই জন্যই শিশু সাহিত্যের নামে আজকাল এখানে যা চলছে তার অধিকাংশই নিছক আবর্জ্জনা মাত্র। এ সব নির্ব্বিচারে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া কোনো অভিভাবকেরই উচিত নয়।

য়ুরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এদেশে অধুনা শিশু পাঠাগার স্থাপনা সুরু হ'য়েছে। যদিও আমাদের এখানে ঠিক পাঠাগার খোলা যেতে পারে এমনতর শিশু সাহিত্যের প্রাচুর্য্য দেখা দেয়নি, ইংরাজ ও মার্কিনের কাছে এ জন্য আমাদের হাত পাততেই হবে, তবু, সদ্দৃষ্টান্তের এই সাধু অনুসরণ প্রশংসনীয়ই বলতে

হবে। এই সব পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের পাঠোপযোগী বিভিন্ন স্তরের পুস্তকাদি সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় এবং পর্য্যায় ভেদে সতর্কতার সঙ্গে তা গ্রন্থাগারের শিশু-সভ্য শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পে মনোযোগ দেবার বয়স যে ছেলে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে তাকে আর রূপকথা দিয়ে ভোলানো উচিত নয়। তার বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হয়ে হঠেছে, এই সময় তাকে গল্পচ্ছলে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা এবং মহাপুরুষদের মহত্ত্বের কাহিনী জানতে দেওয়া চাই। দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক ও অন্যান্য নানা পরিচয় চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ কাহিনীর ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে। বিবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সম্বন্ধে তাদের জানবার কৌতূহল জাগ্রত করে তোলা উচিত। জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা তাদের জীবনী ও চরিত্র নিয়ে ছেলেদের আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষদের কেবলমাত্র শিশু সাহিত্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করলেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করা হবে না। চলচ্চিত্র অথবা অভাবে ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে মাঝে মাঝে তাদের আনন্দবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কখনো কখনো বা গ্রন্থাগারের শিশু সভ্যদের নিয়ে শিশুদের উপযোগী নাটকের অভিনয় আয়োজন করতে হবে। এর ফলে তারা ইতিহাস বা পুরাণোক্ত মহাপুরুষদের জীবনী ও কার্য্য সম্বন্ধে হাতে কলমে প্রত্যক্ষ ভাবে অনেক কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তাছাড়া অভিনয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি ললিতকলার প্রতি তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগ জন্মাবে। দৃশ্যপট আঁকা ও রঙ্গমঞ্চ সাজানো নিয়ে চিত্রবিদ্যা ও শোভা সংরচনের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন নিয়ে প্রাচীন যুগ ও তৎকালীন মানুষদের জীবনযাত্রার প্রথা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ হবে। মাঝে মাঝে তাদের ডেকে নূতন কোনো ভালো বই বা প্রসিদ্ধ কোনো পুরাতন বই পড়ে শোনানো ও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, রচনা-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, শিল্প-প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়া কৌশল ব্যায়াম ও শক্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কল্যাণকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাই।

শিশুপাঠাগারের সঙ্গে ছেলেদের জন্য গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো এক একটি 'মিউজিয়ম' প্রতিষ্ঠা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। শিক্ষিত জগতে ছেলেদের

আজকাল এই মিউজিয়মের সাহায্যে খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হ'য়েছে। এতে বিদ্যালয়ের বিভীষিকা ও গুরুমশা'য়ের আতঙ্ক থাকে না ব'লে ছেলেরা সহজেই মনের আনন্দে অনেক কিছু শিখতে পারে। তাদের সেখানে ইচ্ছামত হাতে কলমেও কাজ করতে দেওয়া হয়। কেউ গাড়ী তৈরি করে, কেউ বাড়ী তৈরী করে, কেউ মূর্ত্তি গড়ে, কেই কাটা ছবি নিয়ে জোড়া দেয়, কেউ ঘড়ির কলকব্জা খুলে আবার বসায়, কেউ ইঞ্জিন চালায়, কেউ বন্দুক চালায় এমনি ক'রে তারা খেলার ছলে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে।

শরীর-চর্চ্চা ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি এদেশের ছেলে, সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। এখানে এই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপারটার দিকে দেখি আমাদের সবচেয়ে বেশী অমনোযোগ ও অবহেলা। ফলে আমাদের ছেলেরা হয়ত' লেখাপড়া শেখে অনেকেই কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হ'য়ে উঠতে পারে না কেউ।

এমনিতর আদর্শ শিশুপাঠাগার যেদিন এদেশের গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে সেদিন বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেবে।

শিশু পাঠ্য উপকরণের মূল্যায়ণ

মৌমাছি

ছোটদের নিজের চেষ্টায় গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজে মণিমেলা সংগঠনই বোধ হয় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বর্ত্তমানে সারা ভারতে প্রায় দু'শ মণিমেলা কেন্দ্রের নিজস্ব ছোটদের পাঠাগার রয়েছে; এদের সংগ্রহের সংখ্যা কমপক্ষে তিনশ থেকে তিন হাজারের মত। যথাসম্ভব বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এসব পাঠাগারের পরিচালনার জন্য আমাদের বার্ষিক শিক্ষা-শিবিরে যুব সংগঠকদের গ্রন্থাগারিকের কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে মণিমেলা মহাকেন্দ্র থেকে "কিশোর পাঠাগার" নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ সালে; বইখানি শুধু মণিমেলা কেন্দ্রের সংগঠকদের নয় অন্যান্য উদ্যোক্তাদেরও বিভিন্ন স্কুলে ও গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট সুপরিচালিত শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অবশ্য, আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার সবটাই স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু এতদিন ধরে সাফল্যজনকভাবে কাজ করেও এইসব শতাধিক শিশু গ্রন্থাগার ও তাদের নীরব সংগঠকগণ উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি।

সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে এই ভবনে একটি নূতন শিশু গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও মহানগরীর এক সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় অনেকের পক্ষেই এর সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আমাদের সমাজসেবীদের কাছে এর থেকেও গুরু দায়িত্ব রয়েছে সারা দেশবাসীর প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের। আমার বিশ্বাস, এ কাজে নিজেদের যোগ্যতর ও দক্ষতর করে তোলার জন্যে ঠিক এই ধরনের আলোচনা-চক্রের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ সব অনুষ্ঠানে প্রাণ-খোলা অসংকোচ আলোচনার মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার বিনিময়ে আমরা সকলেই উপকৃত হব।

তাই শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাই। "শিশু গ্রন্থাগার" সম্পর্কে এ আলোচনার সবচেয়ে বড় কথা হল ছোটদের পড়াশোনার তত্ত্বাবধান—আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকদের কাছে এটা একটা জটিল সমস্যা। এই অসুবিধার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত বই-পত্রের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব অংশত

দায়ী। তা ছাড়া ছোটরা কি কি পড়তে ভালবাসে তা নির্ধারণ করাও বড়দের পক্ষে সহজ নয়। তা হলেও এ বাধা একেবারেই দুরতিক্রম্য নয়। একটু যত্ন নিয়ে পড়াশোনা করলে আমরা এ বিষয়ে কতকগুলো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি।

আমার মনে হয় সবার আগে আমাদের জানতে হবে—ছোটরা কেন পড়তে চায়? ছোটরা তাদের চরিত্রের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই পড়তে চায়—তা হল: কৌতূহল, কল্পনার তৃপ্তি, আর অনুকরণ প্রবণতা। ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে কোন শিশুই এই তিনটির কোন না কোন তাগিদে পড়ার আগ্রহ অনুভব করে।

স্বাভাবিক শিশুমাত্রই যেন এক একটি সক্রিয় সজীব প্রশ্ন চিহ্ন। যা কিছুই তার চোখে পড়ে তাই তার কৌতূহলের সঞ্চার করে। ছোটদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির একটি লক্ষনীয় ক্রম পরিণতি দেখা যায়। একেবারে নবজাতকের মধ্যে কৌতূহল বলতে কিছু থাকে না। বাইরের অনুভূতিতে সে শুধু সাড়া দেয় কিন্তু খুব একটা আগ্রহ নিয়ে নয়। ছোট্ট শিশুটির কানের কাছে একটা হাতঘড়ি ধরুন—সে শুনবে ঠিকই, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। কিংবা খুব উজ্জ্বল রং-চঙে কোন জিনিষ তার চোখের সামনে রাখুন—সেদিকে সে তাকাবে, হয়তো হাতও বাড়াবে। কিন্তু তার এই আকর্ষণ একান্তই সাময়িক। অথচ শিশুটি যেই দু'তিন বছরের হল, তখন নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষণ ধীরে ধীরে সক্রিয় আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে কেন? কিসের জন্য ঘণ্টা বাজে?···তিন বছরের পর থেকে ছোটদের কৌতূহল ক্রমাগতই বেড়ে চলে। যা কিছুই চোখে পড়ে, তাই নিয়ে জাগে উদগ্রীব প্রশ্ন···কেন? কিভাবে?

বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল প্রকাশ পায় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই। নিস্তেজ ও নির্বোধেরা নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষণ আর দুর্বল ঔৎসুক্যের স্তর কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারা যে সব প্রশ্ন করে সেগুলো স্বভাবতঃই অর্থহীন কিংবা অস্পষ্ট, হয় আর যে কোন উত্তর পেলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠতার চিহ্নই হল অদম্য কৌতূহল।

আমার সম্পাদিত "আনন্দমেলার" স্তম্ভে ছোটদের প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তাদের কৌতূহলের বস্তুগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ফেলা যায়:—(১) প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, (২) যান্ত্রিক কলাকৌশল, (৩) জীবনের উৎস, (৪) ধর্মীয় ও পৌরাণিক আখ্যান,, (৫) স্বর্গ এবং মৃত্যু। এসব প্রশ্নের অধিকাংশই

কার্যকারণ সম্পর্কিত—এটা কেন এমন হয়? ওটা কেন সেরকম হয় না? ইত্যাদি। অনেক বাবা-মা এবং শিক্ষক হয়তো একটা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু ছোটদের পড়াশোনায় ব্যাপারে এর গুরুত্ব কি ভেবে দেখা হয় না। নিঃসন্দেহে বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সে ঔৎসুক্যের পরিণতি অনুসারে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা উচিত। চার বছরের যে ছেলেটি, "রাতের আকাশে তারাগুলো কে জালিয়ে দিলো?" একথা জানতে চায়, তাকে সহজ, বাস্তব-ভিত্তিক প্রকৃতির গল্প শোনালে সে নতুনতর আনন্দের সন্ধান পাবে। ন বছরের যে ছেলেটি জানতে চায় কতকগুলো তারা অন্যদের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হয় কেন, কিংবা উড়োজাহাজ শূন্য পথে চলে কি করে, তাকে সহজ ভাষায় লেখা প্রকৃতি বিজ্ঞানের বই পড়তে দেওয়া যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় বিশ বছরে আগে আমি যখন প্রথম ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হাতে দিই, তখন তিন থেকে তের বছরের ছেলেদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়ার মত প্রকৃত তথ্যপূর্ণ বই প্রায় পাওয়াই যেত না। তাই আমার পত্রিকার শুরু থেকেই ছোটদের কাছে প্রশ্ন চেয়ে পাঠিয়েছি এবং সাধ্যমত তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি; আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার পুরস্কারও পেলুম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ডঃ মেঘনাথ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডঃ পি. সি মহলানবীশ প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপদ, বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা পত্রে। ১৯৪১ সালে এই প্রশ্নোত্তরগুলি সংকলিত হয়ে "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছরে দুটি সংস্করণ হওয়ায় বইখানি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করে। বইখানি অন্ততঃ সহজ কথায় প্রকৃত তথ্যের সাহায্যে ছোটদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত রচনার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে। তা হলেও মাত্র কয়েক বছরই হল তরুণ বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। তবে এটা খুবই আনন্দের কথা যে বাংলা শিশুসাহিত্য এ বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর।

আগেই বলেছি যে, প্রতি ক্ষেত্রেই ছোটদের স্বাভাবিক কৌতুহলই পাঠ্য-নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান বাজার-চলতি ছোটদের বই-এর অধিকাংশই তাদের জ্ঞানচর্চার দাবী মেটাতে অথবা নির্দোষ আনন্দের পরিবেশনে সক্ষম নয়। ছোটদের মন হল সক্রিয় যুক্তিশীল সত্তা যাতে সবসময়ই জীবনের নানা ঘটনা কৌতুহলের সঞ্চার করছে। তাই সবচেয়ে প্রয়োজন হল সেই ধরনের বই-এর যা এই ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করবে,

সুখপাঠ্য সহজবোধ্য গল্পের মাধ্যমে সত্য ঘটনা বিবৃত করে।

ছোটদের বই নির্বাচনে আর একটি তাগিদ প্রভাবশীল—তা হল অবচেতন মনের ইচ্ছাপূরণ। আমাদের অধিকাংশ শিশু সাহিত্যকই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখেই লিখে থাকেন। ছোটরা বড়দের মত কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ উপভোগ বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পড়ে না। তারা বই-এর মধ্যে নিজেদের সঞ্চার করে দিয়ে তাদের অবচেতন মনের নানা কল্পনার তৃপ্তি সাধন করে। এসব কল্পনার বহু রকমফের; আর কৌতূহলের মতো এগুলোও বয়সের সাথে সাথে ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়।

সবচেয়ে ছোট বয়সের কল্পনাগুলো অধিকাংশ খাবার-দাবারের সঙ্গে জড়িত। মিষ্টি ক্ষীরের ছাদ আর পান্তুয়ার থামওয়ালা সন্দেশের দোকানের রূপকথা তাদের সহজেই আকৃষ্ট করে। আর যে-সব ছেলেরা কিছুই খেতে পায় না—গল্প তাদের নিয়ে হলে, সহানুভূতি জাগে সবচেয়ে বেশী। এই সঙ্গে রূপকথার রাজ্যের নানা কল্পনা পরিণত হতে থাকে। কোন এক যাদুবলে তাদের সব ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে, ছোটরা এসব স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আত্ম প্রতিষ্ঠা আর প্রভুত্ব প্রবণতা জাগার সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত জাঁকজমকের গল্প ভাল লাগতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে এসব আজব কল্পনা অন্যান্যদের ওপর নিজের ক্ষমতা বা আধিপত্যের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। আর মেয়েদের মধ্যে এসব ইচ্ছা প্রায়ই অনেক সুন্দর সুন্দর বেশভূষা, বিলাসব্যসনের রূপ নেয়।

ছোটদের এসই কল্পনার ওপর বই-এর প্রভাব অসামান্য। ভাল বই পড়লে প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, প্রেরণা জাগে মহৎ কর্মের। আর খারাপ বই পড়লে আজগুবি এবং বাস্তব সম্পর্কে একটা অসুস্থ ধারণার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, যে সময় শিশু বয়সের রূপকথার কল্পনা দশ বছরের বাস্তবমুখী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হতে শুরু করে, ছোটরা ঠিক সেই সময়ই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়। এ সময় উপযুক্ত বই পেলে শিক্ষাপ্রদ নানা কাজে তাদের আগ্রহ জাগে।

ছোটদের পড়াশোনার ওপর আর একটি শক্তি কাজ করে—তা হল অনুকরণ। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ছোটরা তাদের চারপাশে সবার মধ্যে বিশেষ করে তাদের বড়দের কাছে আচার ব্যবহারের আদর্শ আর পছন্দ-অপছন্দের দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়। এভাবেই তাদের অনেকটা শিক্ষা হয়ে যায়। অনুকরণের বিশেষ গুরুত্ব হল পড়াশোনার ব্যাপারে। প্রথমতঃ যাদের মা-বাবা পড়াশোনার চর্চা করেন তাদের মধ্যে অনেক সহজেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়স্বজন

বা গ্রন্থাগারিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তারা কোন বিশেষ ধরণের সাহিত্যের সমাদর করতে শেখে।

ছোটদের পড়াশোনার কারণ নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তিনটি সিদ্ধান্তে পেঁাছন যায়। প্রথমতঃ ছোটদের স্বাভাবিক কৌতুহলকে কাজে লাগাতে হলে, আমাদের উচিত বিভিন্ন বয়সে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসার ধরণ সতর্কভাবে বিচার করে তাদের মনে কি কি বিষয় প্রাধান্যলাভ করছে তা স্থির করা এবং তারপর তাদের এধরণের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া যা তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবে এবং প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে। দ্বিতীয়তঃ পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে, ছোটদের এমন বই যোগান দিতে হবে যা তাদের মধ্যে সুস্থ-স্বাভাবিক আকাঙ্খাই জাগাবে এবং দরকারী কাজে উৎসাহ দেবে। তৃতীয়তঃ, ছোটরা এতবেশী অনুকরণ প্রবণ যে, তাদের সঙ্গী-সাথীরা যেন এমন ধরণের হয়, যারা আপত্তিকর কিছু পড়ে না সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার এবং শিক্ষাপ্রদ, উৎসাহজনক অথচ আনন্দ-দায়ক বই পড়ায় তাদের আগ্রহ জাগানর মত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত.

পরিশেষে, ছোটদের পড়াশোনার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল না বলে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখি-- যেমন, পড়াশোনায় উৎসাহের বিকাশ, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা, মানসিক ক্ষমতার তারতম্য, শিশু সাহিত্যের রকম ফের ইত্যাদি। আশাকরি আমার বন্ধুবর্গ এ নিয়ে আলোচনা করে আমাদের জানার সঞ্চয় সমৃদ্ধ করবেন।

গ্রন্থ উপাসনা

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতীকোপাসনার একটি প্রবল, প্রবলতম ভাব—গ্রন্থ বা শাস্ত্রের উপাসনা। সকল দেশেই দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে, ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন ; কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে এবং যদি তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুদ্ধকে পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, কিন্তু তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর না কেন?' তাহারা বলিবে, "যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে।' গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশী মিথ্যা বলো না কেন, তাহাতে দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি এবং যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহা হইলে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না ; কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কারসাজি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখা কার, তাহা হইলে মূর্খেরা দলে দলে আসিয়া আমার অনুসরণ করিবে। তারপর আবার কিছু লোক আছে, তাহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে ; তাহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে, কিন্তু ঐ প্রচারকেরা বলে, আমরা যাহা বলিতেছি, খ্রীষ্টের মতও এইরূপই ছিল। যত সব আহাম্মকেরা তাহাদের দলে ভিড়িয়া

এটা খুব

বড়দের ক বেদে বা বাইবেলে পাওয়া যায় না—এমন সব নূতন জিনিস মানুষ লইতেই

এভাবেই স্নায়ুসমূহ যেভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চায়। যখন

পড়াশোনা রা কোন নূতন বিষয় শোনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা

মধ্যে অ র প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব

সম্বন্ধে এ-কথা আরও বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিত ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন; সুতরাং সেই ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। কৌশল হিসাবে এটি ভাল বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। এই সংস্কারকগণ এবং যাঁহাদিগকে আপনারা উদারমতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা আজকাল রাশি রাশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না; কিন্তু তাঁহারা যদি ঐভাবে প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের (Christian Scientists) মতে যীশু একজন মস্ত রোগ-নিরাময়কারী, প্রেততত্ত্ববাদীদের (Spiritualists) মতে একজন মস্ত ভৌতিক (Psychic) এবং থিওজফিস্টদের মতে একজন 'মহাত্মা' ছিলেন। ধর্মগ্রন্থের একই বাক্য হইতে এই-সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই বাক্যের অন্তর্গত সৎ' শব্দের অর্থ বিভিন্ন মতবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। পরমাণুবাদিগণ, বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা। সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন।

গ্রন্থোপাসনায় এই-সব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে। উহা একটা শক্তি। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীকদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্যবাসী—এক সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি ছিল। আরবীয়েরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ[১] লইয়া পলায়ন করিল এবং সেই ধর্মগ্রন্থের বলেই তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। ইহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাহাদের একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহারা

১। পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ—জেন্দ আবেস্তা

জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাহাদের জীবনশক্তি রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচার সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তালমুড (Talmud) তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, উহা সমুদয় ভাবগুলি পরিষ্কারভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, এবং উহা উপাস্য বস্তু। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন—সকলেই উহা দেখিবে, একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। কেহ কেহ বোধ হয় আমাকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলির জন্য এই-সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে গ্রন্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

তারপর প্রতিমা বা মূর্তি ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা কোন-না-কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ মানবাকার প্রতিমা অর্চনা করিয়া থাকে, আর আমি মনে করি, উহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশু, গৃহ বা অন্য কোন মূর্তি অপেক্ষা বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করে, এই প্রতিমাটিই ঠিক; অপরে মনে করে, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টানরা মনে করেন: ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহাই ঠিক; কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাত্মক। ইহুদীরা মনে করেন, দুই দিকে দুই দেবদূত-বসানো সিন্দুকের আকৃতিযুক্ত একটি মূর্তি নির্মাণ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন মূর্তি গঠিত হয়, তবে উহা অতিশয় ভয়াবহ। মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া 'কাবা' নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই উহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমা- পূজার ইহাই অপূর্ণতা বা দোষ, তথাপি এগুলি সবই প্রয়োজনীয় সোপান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধবিশ্বাস যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন।

বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এই পুস্তকালয়, বিশেষতঃ এই হল দেখে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়েছে। চন্দননগরের বাইরে এরকম ছোট শহরে এরূপ সুন্দর হল দেখি নি। বর্দ্ধমানে একটি হল আছে, সেখানে ধনীলোকেরও অভাব নেই। কিন্তু সে হল এর চেয়ে ছোট এবং এরূপ সুন্দরও নয়। বরোদায় আধুনিক নিয়মে পরিচালিত একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। তার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের পড়বার জন্যে পাঠাগার ছাড়া মহিলা ও শিশুদের পড়বার স্বতন্ত্র ঘর আছে। ছেলেদের, মেয়েদের, সাধারণ পাঠকদের আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগেরই সুন্দর বন্দোবস্ত। তা ছাড়া আর এক রকম বন্দোবস্ত আছে, যাকে চলন্ত লাইব্রেরী (Travelling Library) বলা চলে। এটা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে বই বিতরণ করা। আমি এর বিবরণ কাগজে পড়েছি, কিন্তু তা'র কার্য্য চোখে দেখবার সুযোগ পাই নি। লাহোরে গিয়েছিলাম সেখানেও বরোদার মত বন্দোবস্তের লাইব্রেরী তখন তৈরি হচ্ছিল। মহিলাদের আলাদা ঘর, ছোট ছেলেদেরও আলাদা ঘর তৈরি হচ্ছিল। এই সব লাইব্রেরীর ব্যবস্থা দেখে হরিহরবাবুর কাছে আমরা অনুরোধ করতে পারি, একদিন তিনিও যেন চন্দননগরের লাইব্রেরীকে সকল দিক দিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারেন। নারীদের শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁদের পড়বার সুবন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁর নিশ্চয়ই দৃষ্টি আছে। আমাদের আর বেশী কিছু বলতে হবে না। আপনাদের লাইব্রেরীর রিপোর্টে দেখলাম এখানেও চলন্ত লাইব্রেরীর মত কতকটা কাজ হচ্ছে।

"চন্দননগরের অন্যান্য পুস্তকাগার ও পাঠাগারগুলি অর্থাভাব বশতঃ সকল প্রকার পুস্তক তাঁহাদের সভ্যদের পড়িতে দিতে পারেন না। সেই অভাব যাহাতে আংশিকভাবে পূরণ করিয়া পাঠাগারগুলি নিজেদের কার্য্যপ্রসার বাড়াইতে পারেন, সেই বিষয়ে চন্দননগর পুস্তকাগার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। শিবশঙ্কর পাঠাগার এইরূপ সাহায্য পাইতেছেন। হুগলী জেলা লাইব্রেরী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া যে সকল পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে পুস্তকগুলি চন্দননগর পুস্তকাগার হইতেই লওয়া হইয়াছিল।" (রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪)

আপনারা এইরকম বই ধার দিয়ে দিয়ে কাজটার প্রসার আরও বাড়াতে পারবেন। রিপোর্ট থেকে আর একটা কথা ব'লে আমি বাংলাভাষা সম্বন্ধে কিছু বলবো। এখানে পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখলাম, "India in Bondage" বইয়ের উল্লেখ আছে। এখানি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন। আমিই বই ছাপিয়েছিলাম। ৪০০০ কপি ছাপা হয়। তার মধ্যে ৩৫০০ কপি বিক্রী হয়। বাকি ৫০০ কপি পুলিস নিয়ে যায়। শুন্‌তে পাই, বইখানা গোপনে গোপনে, চারিগুণ তিনগুণ দ্বিগুণ মূল্যে, এখনও বিক্রী হয়—কেমন ক'রে হয়, সে সম্বন্ধে আমার কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। বইখানা দেখছি আপনাদের আছে—এখানে থাকবেও। বইখানা অন্যত্রও অন্য ক্রেতাদের নিকট আছে। কিন্তু তাঁদের নাম কেউ জানে না, কোথাও লেখা নাই। আপনারা দেখছি, একেবারে ছেপে দিয়েছেন, যে, বইখানা এখানে আছে! এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে পড়লো। "The Case for India" নামে আমেরিকা থেকে একখানা বই বেরিয়েছে। এর লেখক ডাঃ উইল ডুরাণ্ট রবীন্দ্রনাথকে বইখানা উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আপনি একাই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ("You alone are sufficient reason why India should be free")। আমি গ্রন্থকারকে চিনি না এবং আমেরিকাতেও যাইনি। রবিবাবুর কাছ থেকে বইখানা চেয়ে নিয়ে "Modern Review" কাগজে তার এক সমালোচনা বা'র করি। লেখক আমাকেও একখানি বই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বই আমি পাই নি। গ্রন্থকার বইখানা আমি পেলাম কি না জানতে চেয়েছিলেন। আমি লিখলাম পাই নি। আমাদের কাগজে সমালোচনা বা'র হওয়ার পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত পুস্তকের দোকান এই বইয়ের ৫০ কপি ফরমাস দিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে বই পাঠানও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বই পেলেন না। ডাঃ উইল ডুরাণ্টের ইংলণ্ডের এজেণ্ট আমাকে আর একখানা বই পাঠিয়ে লেখেন, "আমরা গ্রন্থকারের ইচ্ছানুসারে আপনাকে এক কপি বই পাঠাচ্ছি। আপনি বইখানা ভারতবর্ষে ইংরেজীতে বা দেশভাষায় ছাপাতে পারেন।" আমি তাঁদের লিখে দিয়েছি, সে বইও পাই নি, আর ভবিষ্যতে আবার পাঠালেও পাব না। [এই বইখানি সরকারী নিষিদ্ধ বহির তালিকাভুক্ত নয়, বাজেয়াপ্তও নয়। বোম্বাইয়ে দেখে এসেছি, এ বই প্রকাশ্যভাবে দোকানে বিক্রী হচ্ছে।]

এইবার আমি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবো। আমাদের দেশে স্বরাজ হ'লে, বর্ত্তমানে ইংরেজীর মত, আমাদের একটা রাষ্ট্রভাষা হবে। সে ভাষা হয়ত হিন্দুস্থানীই হবে। হিন্দুস্থানী ভাষায় সকলের চেয়ে বেশী লোক কথা বলে। বাংলা তার পরেই। হিন্দুস্থানীর সঙ্গে যেমন বেহারী ধরা হয়, তেমনি বাংলার সহিত আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ধরিলে বাংলাভাষীর সংখ্যা বাড়তে পারে। আমার উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের বেশ সমৃদ্ধি কেমন ক'রে হয় তারই আলোচনা করা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা আছে। এ পর্য্যন্ত কোন প্রচলিত ভারতীয় ভাষার কোন বই পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য ভাষায় অনুবাদিত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন-না-কোন বই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে সেই সমস্ত বইয়ের এক এক কপি রক্ষিত আছে। এটা বাংলা ভাষার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আমাদের অন্য মনীষীরা যদি তাঁদের অন্ততঃ কোন কোন বই বাংলা ভাষায় লেখেন তা হলে বাংলার অনেক উন্নতি হয়। বাঙালীর মাথা থেকে যে চিন্তা বেরিয়েছে তার প্রভাব পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনুভূত হচ্ছে, ইহা ভেবে সুখ হয়। আমার অনুরোধ, যে রকমই লেখক হোন না কেন, তাঁরা যেন তাঁদের অন্ততঃ কতক বক্তব্য বাংলা ভাষায় লেখেন। আমরা বাংলা লিখবো বাংলা বলব—এ ভাব সকল বাঙালীরই থাকা উচিত। বাংলা ভাষা যা'তে ভাল হয় তার চেষ্টা করা আমাদের আবশ্যক। অবশ্য বাংলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয় তার সবই ভাল, বা সব লেখারই সদ্য সদ্য আদর হবে, তা নয়। এখন যার আদর নাই, ভবিষ্যতে এমন অনেক লেখার আদর হ'তে পারে। ভাল চিন্তা, ভাল ভাব, কাজের কথা —যার যা মনে আসে আমরা তা বলে যাই—ফল বিধাতার হাতে। ভাষার ব্যবহার করতে করতেই তার সমৃদ্ধি আসে।

কোন ভাষায় অল্প লোকে কথা বলে ব'লেই তার যে স্থায়িত্ব হয় না, তা নয়। ওয়েলস্ খুব ছোট দেশ। ইংরেজদের মধ্যে থেকেও ওয়েলসের লোকরা নিজেদের ভাষাকে আঁকড়ে আছে। এদের সভ্যতা ইংরেজদের চেয়ে পুরাতন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ এই ওয়েলসেরই লোক। খুব কম করেও এদের ভাষায় পাঁচ লাখ বই ছাপা হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষায় পাঁচ লাখ বই আছে কিনা জানি না। সমস্ত বাংলা বই কোথাও সংগৃহীত হয়েছে কিনা তাও জানি না।

আমাদের সকলেরই বাংলা ভাষার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। কথা ত বাংলায় বলবই, লিখবও কিছু। বাংলা ভাষাতে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। তা ছাড়া বই পড়ার অভ্যাস থাকা যেমন দরকার, বইয়ের অধিকারী হওয়াও তেমনি

চাই। এই সম্পর্কে চার্ল্‌স্‌ ল্যাম্বের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একজন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখেন যে বন্ধুর লাইব্রেরীতে অনেক সুন্দর সুন্দর বই রয়েছে। বন্ধুটি দুই একখানা বই পড়বার জন্য বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বললেন, "আলমারী খুলে বইগুলো দেখ।" খুলে দেখেন, কোন বইয়ে তাঁর নিজের নাম নেই, সকল বইতে অপরের নাম লেখা। অতঃপর লাইব্রেরীর মালিক বললেন, "আমি যে বিদ্যেয় এই লাইব্রেরী করেছি, তুমি যে সেই বিদ্যে আমার উপর চালাবে, তা হ'তে দেব না।" অর্থাৎ তিনি অনেকের কাছ থেকে পড়বার জন্য বই চেয়ে নিয়ে এসে আর ফেরৎ দেন নি। আমাদের দেশেও অনেকের এ অভ্যাস আছে। চাতুরী হিসাবে এ বিদ্যা মন্দ নয়। তবে এ বুদ্ধি সকলের হলে গ্রন্থকারদের দশা কি হবে? সবাই বুদ্ধিমান হ'লে কি হয় তার একটা গল্প আছে। এক রাজা রাজ্যে একটা দুধের পুকুর তৈরি করবার জন্যে প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে রাজ্যে হুকুম দেওয়ালেন যে, প্রত্যেক প্রজা বিশেষস্থানে অবস্থিত এক নূতন পুকুরে রাত্রে এক ঘটি দুধ ঢেলে দিয়ে যাবে। পরদিন সকালে রাজা ও মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, পুকুর শুধু জলেই ভর্ত্তি, এক বিন্দুও দুধ নেই। প্রজারা সবাই ভেবেছিল, অন্য সকলে ত দুধ দেবে, আমি যদি এক ঘটি জল দিই, তা আর কে টের পাবে? সকল বুদ্ধিমান্‌ই একভাবে ভাবে। কাজেই দুধ আর কেউ ঢালে নি, সকলেই জল ঢেলে গেছে। সকলেই যদি বুদ্ধিমান হন, তা হ'লে লাইব্রেরীর মত প্রতিষ্ঠান চলবে না। ধার করবার লোকও পাবেন না, আর গ্রন্থকাররাও প্রায় সবাই আর বই লিখবেন না।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই যদি আপনার মৌলিক চিন্তা বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেন, তা হ'লে অন্য জাতির লোকেরাও বাংলা শিখবেন। রবীন্দ্রনাথের বই পড়বার জন্য ইউরোপে কোন কোন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি আগ্রহের সহিত বাংলা ভাষা শিখেচেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন তখন ভ্রমণ করতে করতে আমরা চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্‌ শহরে যাই। সেখানকার মেয়র রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার্থে এক ভোজ দিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যাপক লেজ্‌নী রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বাংলায় এক অভিনন্দন পাঠ করেন। সভার শেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বক্তৃতা কেমন হ'ল? অনেক ভুল করি নি ত?" আমি বললাম, "ব্যাকরণে কোন দোষ হয় নি, তবে উচ্চারণ "ঠিক্‌ হয় নি।" তিনি বললেন, "উচ্চারণ ঠিক্‌ হবে এ আশা আমি করি নি।" আমাদের ভাষার যত উন্নতি হবে জগতের কাছে আমরাও তত উন্নত বলে পরিচিত হব।

বাংলা ভাষার নানাদিক দিয়ে উন্নতি করা চাই। এখনও অনেক বিষয়ে লেখবার বাকী আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ কেবল কাব্য উপন্যাসেরই উন্নতি হয়েছে। কতকগুলি ভাল কাব্য ও ভাল উপন্যাস লেখা হয়েছে। অন্য ভাষায় লিখিত ঐ জাতীয় পুস্তকের চেয়ে তারা নিকৃষ্ট নয়, বরং কতকগুলি তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এখন অন্যদিকেও উন্নতির প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় এমন সব বই থাকা দরকার যা'তে কেবল বাংলা পড়েই, যাকে কালচার বা কৃষ্টি বলে, তা আমরা পেতে পারি। মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয় পাঠ করলে তা আমাদের যেমন অস্থিমজ্জাগত হয় অন্য ভাষার ভিতর দিয়ে সেরূপ হয় না। যে সমস্ত বিষয়ে নূতন পারিভাষিক শব্দ চাই, সংস্কৃতের সাহায্যে আমাদের সেই সমস্ত নূতন শব্দ সৃষ্টি করতে হবে। এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সম্বন্ধে যা স্থির করেছেন তার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলবো। এঁরা স্থির করেছেন, সংস্কৃত এখন থেকে প্রবেশিকায় স্বেচ্ছাশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হবে। তার ফল এই হবে, এর পরে অল্প ছাত্রই সংস্কৃত পড়বে। আমি এরূপ ব্যাপারের বিরোধী। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তাঁরও মত, সংস্কৃতকে স্বেচ্ছাশিক্ষণীয় করলে ক্ষতি হবে। বিজ্ঞান, ডাক্তারী প্রভৃতি বিষয়ে বই লিখতে গেলেও নূতন কথা সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য যেগুলো চলে গেছে, তাকে আর নূতন করে তৈরি করবার দরকার নেই। নূতন কথা তৈরি করতে গেলে সংস্কৃত জানতে হবে। এটা ঠিক কথা, আজ পর্য্যন্ত বাংলার সম্পূর্ণ কোনো ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় নি। রাজা রামমোহন রায় নিজের লেখা "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক কালে রাজশেখরবাবুর "চলন্তিকা" একখানি ভাল বাংলা অভিধান। তিনি অভিধানের সঙ্গে একটু একটু ব্যাকরণও জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ লিখতে গেলেও তার কতকটা সংস্কৃতের ব্যাকরণও হবে; কারণ, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাংলা ভাষাকে ভাল ক'রে জানতে ও গড়তে গেলে সংস্কৃত শিখতে হবে।

মূল থেকে রস সংগ্রহ ক'রে গাছ সতেজ হয়। তেমনি অতীত থেকে আমাদিগকে পরিপুষ্টির উপায় খুঁজতে হবে। কোন জাতির সভ্যতা জানতে হ'লে, তার অতীতের সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত। সেই জন্যে সংস্কৃত পড়া উঠালে চলবে না। যখন শিশুর হাতেখড়ি হয়, তখন তাকে কি আমরা জিজ্ঞাসা করি, "তুমি এ-কোর্স্ নেবে, না বি-কোর্স্ নেবে?" বড় না হ'লে পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করবার শক্তি কার হয় না। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত যে অল্প সংস্কৃত ছেলেদের শিখান হয় তা হোক্, পরে বাদ দিতে হয় তারাই দেবে; সংস্কৃত ভাষাকে গোড়া থেকেই বাদ দেওয়া উচিত নয়।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েচি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেচে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে-রকম উন্নত, সে-রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে -তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারিদিক থেকে অভিযোগ ওঠে, আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন। কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতিনিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয় সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভাল। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই যে, এইসব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়।

বিলাতে কিন্তু গল্পলেখকদের অবস্থা অন্যরকম। তারা ধনী। তাদের এক একজনের আয় আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়। কারণ ও-দেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোক বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ও-দেশে বাড়িতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত বা কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি ঘটে। আর অবস্থাপন্ন লোকেদের ত কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না-থাকুক—গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই। অনেকে হয়ত মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালিগালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন ত দেখতে পাবেন তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্য্যন্ত পড়েননি। আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক

আসে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তাঁরা কয়েকজন চক্চকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাঙলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাঙলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলচেন—সে হয় না, কারণ বিক্রী নেই। বিক্রী হয় না বলেই প্রকাশকেরা ছাপতে চান না। তাঁরা বলেন, ও-সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এস গল্প। লোকে ভাবে, গল্প লেখাটা বড়ই সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোক যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয়—তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিওপ্যাথি করগে যা। অথচ হোমিওপ্যাথির মত শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্ছে, যে জিনিসটা সকলের চেয়ে শক্ত তাকেই অনেকে সবচেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবান সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দেখি, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনো বিদ্যে-বুদ্ধির অভাব ঘটে না।

গল্পলেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভাল ভাল কল্পনা—কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল,—একটা উচ্চাশা ছিল যে 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরী করব। যেমন সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য—এই-রকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে 'নারীর মূল্য' লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই 'দ্বাদশ মূল্য' আর শেষ করতে পারিনি, তার কারণ অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু-বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না, প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ও-সব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও,—তবু হাজারখানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই বলুন, কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন, বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরে যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েচে, তা এই গল্পের ভেতর দিয়েই।

কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেননি। পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদচেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ-রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সেদিনও বলেছিলুম, এখন আপনারা

কেঁদে ভাসাচ্ছেন। কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাঁচ শ'খানা বই বিক্রী হয়নি। অনেকে বোধ করি তাঁর পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। অথচ আজ এসেচেন অশ্রুপাত করতে।

আমাদের বড়লোকরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্ত্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, তবে ত তাঁরা 'জ্ঞানগর্ভ' বই লিখতে পারবেন।

রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা কথা বেশী করে আমাদের নজরে পড়ে যে, ওদের দেশের যা কিছু হয়েচে, তা করেচে ও দেশের জনসাধারণ। তারা মস্ত লোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেচে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই। কিন্তু এই আমাদেরই দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডার ভরল কতটুকু। তিনি দেশের জন্যে কত করেছেন! তাঁর স্মৃতি-রক্ষার জন্যে কত আবেদনই না বেরুল। কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হ'ল না; অথচ ইংলণ্ডে ওয়েস্টমিনিস্টার এবি'র এক কোণে ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের জন্যে এক আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা এল যে, শেষে তিনি সেই ফাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা নাম বাজাবার জন্যে যে দান করেননি তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কাগজে কারোরই নাম বেরোয়নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই যখন লোকের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।

আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবী হউন। তাঁর এই প্রারব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমার মনে জাগে আকুলত। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্যে তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয় আজকের দিনে যারা তরুণ—যারা বয়সে ছোট, তারা নিশ্চয়ই একাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।

'কোন্নগর পাঠচক্রে'র চেষ্টায় এই যে মূল্যবান কথা শুনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম,—শিক্ষা পেলাম, মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ! যুগ-যুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।

বাংলা বইয়ের দুঃখ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিনের 'বিচিত্রায়' উক্ত শিরোনামায় শরৎবাবুর ছোট্ট কয়েকটি কথা মস্ত কয়েকটি কথা খুলে দিয়েছে। জ্ঞানগর্ভ বইয়ের অভাবে যে কেন, নভেল আর গল্পের প্রতি অভিযোগ; লেখক সম্প্রদায়ের অবস্থা, প্রকাশকের বিজ্‌নেস্ বজায়, অবস্থাপন্নদের বাংলা বই কেনার অনভ্যাস, প্রভৃতি সত্যের সংবাদ দিয়েছেন। আবার কড়া কথা বলা যে তাঁর অভ্যাস আছে, সেটাও এমন ক্ষেত্রে শুনিয়ে দিয়েছেন যেখানে সেটা মিঠেকড়া বলেই লোকে উপভোগ করে থাকবে।

তাঁর মত লোকের মুখে এসব কথার মূল্য আছে। তাই, পড়ে আনন্দ পেলুম। তবে তদতিরিক্ত পাবার আশা করতে পারলে সুখীই হতুম।

কথাগুলি মধ্যে মধ্যে মনকে ছুঁয়ে যায়। নিশ্বাসের দ্বারাই তাদের কুলোর বাতাস দিয়ে, কর্ত্তব্য সমাধা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশলাভ ঘটায়, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাইস্-চ্যানসেলার কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার লেখকদের কাছে সাহিত্যের ও অন্যান্য বিভাগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পুস্তকাদির প্রয়োজনের কথা শুনিয়ে তাঁদের সাহায্য আহ্বান করেছেন। সেই সম্পর্কে, গত "প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন" ক্ষেত্রে একটা আক্ষেপের কথা না বলে থাকতে পারিনি। বাধ্য হয়েই বলেছিলুম— "বাণীর সেবকেরা প্রায়ই অবস্থাপন্ন নন। তাই ইচ্ছা ও শক্তি সত্ত্বেও তাঁরা এমন রচনায় হাত দিতে পারেন না—যার প্রকাশক জুটবে না, কারণ সে সব পুস্তকের চাহিদা কম! সে জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পুস্তক লেখা বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হয়েছে"।—এর বেশী বলতে সাহস পাইনি। শরৎবাবু কথাটা এগিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন। সাহিত্যিকদের নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যতদিন না গড়ে ওঠে ততদিন লেখকদের 'জ্ঞানগর্ভের' ক্ষেত্র বিদর্ভ। মহাজনদের লাভ লোকসান খতাতে হয়। তাই 'জ্ঞানগর্ভের' মত সর্ব্বনেশে দেবতাকে তাঁরা দূর থেকে নমস্কার করেন—ঘরে ঢোকাতে ভয় পান। Dead-Stock বাড়াতে চান না।

জ্ঞান সঞ্চয় করবার আগেই 'জ্ঞানগর্ভের' হোয়ে ওকালতী করে এক বন্ধুকে ডুবিয়েছিলুম। কথাটা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের। কিন্তু সে কথা মনে হলে আমার

সুস্থির বাহাদুরীর বাহবাব্যঞ্জক তাঁর সেই সুমধুর উপহাসের হাসি আজো আমাকে লজ্জা দেয়।

সেটা ছিল কেরাণিগিরি নব মোহের যুগ! বন্ধুর সৌভাগ্যে তাঁর হস্তাক্ষর ছিল—বাংলা কি ইংরাজি, কি উড়িয়া সেটা মাথা খুঁড়িয়া উদ্ধার করা লোকের সাধ্যাতীত ছিল। অথচ সে যুগে হাতের লেখাই ছিল চাকুরির পাস্‌পোর্ট।

গ্রাম ছেড়ে কলকেতায় ভরন্তর করেও, সুবিধা না হওয়ায় প্রয়োজন তাঁকে উপার্জ্জনের পথ দেখালে। তিনি লেখক ধ'রে তাঁদের সামান্য কিছু দিয়ে যৌবন রুচির নাড়ী বুঝে বই লিখিয়ে Catchy (চিত্তাকর্ষক) নাম দিয়ে, তার প্রকাশ আরম্ভ করলেন, এবং উদীয়মান বঙ্গবাসী পত্রিকায় তার মোহ উৎপাদক বিজ্ঞাপন দিয়ে হু হু করে মফস্বলে ভিঃ পিঃ আরম্ভ করলেন। টাকা কুড়ুবার জন্যে তাঁকে মাইনে করা লোক রাখতে হয়েছিল জানি। বইগুলি ঠিক উপন্যাস ছিল না, ডাক্তারী ও যুবক-যুবতীর মনোহারী বিষয়ের সংমিশ্রণে—দরকারী বলে তারা তাঁর ভাগ্যে প্রবল বেগে চলে গিয়েছিল।

তিনি কলকেতায় থাকতেন, দেখা কমই হত। একদিন গ্রামে তাঁকে পেয়ে, কথাপ্রসঙ্গে কাজটার অনেক নিন্দা করলুম।—"একি করচো?"

"কেনো অর্থ উপার্জ্জন করছি। ধর্ম্ম করতে তো বসিনি।"

"কিন্তু অনিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে।" (তখন সে ধরণের লেখা আমাদের অপরিচিতই ছিল।)

আমি তো জোর করে, মাথার দিব্যি দিয়ে, কি হাতে ধরে থেকে কাকেও কেনাচ্ছি না। যাদের ভালো লাগে তারাই নেয়, তারা নিতান্ত কম নয়,—লিষ্ট দেখলে চমকে যাবে। তুমি বুঝি ভাবো'—বৈরাগ্যশতক' পড়বার জন্যে দেশ হাঁ করে আছে? পল্লীগ্রামে থাকো কত রকমের লোক আছে তার কিছুই Idea নেই। আনন্দ না পেলে লোক পয়সা দিয়ে নেয়"?

"তোমার 'সময়টা' তাদের নেওয়াচ্ছে"।

"মানলুম,—তবে এটা মানবে না কেনো যে সময়ই আমাকে এই Idea দিয়েছে।"

আমার চড়া সুর নেবে গেল। বললুম, "তা হোক্ ভাই; যখন এই কাজই করছো, তখন একখানা ভালো বইই বার কর না।"

একটু ভেবে বললেন - "তুমি বাল্য বন্ধু, তোমার একটা কথা রাখতে এখন পারি। চারখানাতে কিছু দিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনেও কম দিইনি। যাক, ভেবে

দেখি, যদি একখানা এমন বই পাই যা গল্পচ্ছলে ভালো কথা (জ্ঞানের কথা) শোনায়, তাহলে ছাপবো। সেরেফ 'যোগাম্বুধি' চলবে না, বরং উজ্জ্বল নীলমণি' চলে। কলকেতায় না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না।" সেদিন ওই পর্য্যন্ত কথায় হয়।

বন্ধুর কলকেতার বাড়ীতেই একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বলে একটি যুবাকে দেখে আকৃষ্ট হই। সাদাসিদে দীনতাভাবাপন্ন, উদাস প্রকৃতি, অল্পভাষী, সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি। তিনি মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে থাকতেন। চিরকুমার অবস্থায় সেইখানেই ভগবৎচিন্তা নিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। সদাপ্রফুল্ল, আড়ম্বরহীন, সদালাপী ও সহৃদয় ছিলেন। সময়ে সময়ে খেয়াল মত ধর্ম্মবিষয়ক কথা রূপকচ্ছলে লিখতেন। কয়েকখানির মধ্যে তাঁর "জীবন পরীক্ষা" এবং "ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়" বলে পুস্তকখানি পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। বঙ্কিমবাবুও বইখানির সুখ্যাতি করে ছিলেন। বিষয়টি আগাগোড়াই জ্ঞানগর্ভ; কিন্তু গল্পচ্ছলে ব্যক্ত হওয়ায় তখনকার দিনের পাঠকদের সুখপাঠ্য হয়েছিল, বইখানির নামও হয়েছিল। তার প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায়—আমার বন্ধু সেইখানির (সম্ভবতঃ) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন! বইখানির আকার বৃহৎ, ছাপাতে ব্যয়ও তদনুরূপই হয়েছিল,—অধিকন্তু বিজ্ঞাপনের খরচ।

বছর দুই পরে একবার বন্ধুর কলকেতার বাড়ীতে যাই। অন্যান্য কথার পর বন্ধু বললেন—"তোমার কথাও রেখেছি, এবং নিত্য স্মরণে থাকবে বলে তা আলমারিতে পুরেও রেখেছি। আর কিছু না হোক্ তাতে জীবে দয়া হিসেবে পরোক্ষে বেশ কিছু পুণ্য সঞ্চয়ও করছি। সেইটাকেই এখন লাভ বলে মনে করি।"

বললুম—"বুঝতে পারলুম না যে"। বললেন, "বুঝে ফল নেই, আমায় একাকেই বুঝতে দাও।—পড়ে ছিলুম "স্বপ্ন সত্য নয়" আমার ভাগ্যে তা কিন্তু সত্য হয়েছে—আর প্রিয়নাথ ভায়া তার নামকরণে 'ভীষণ' বলে তো দেগেই রেখেছিলেন। সেটা তখন আক্কেলে আসেনি।"

তারপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটি আলমারী আর দোর জানলার খিলেনের নীচে ঠাসা 'ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়' দেখিয়ে বললেন, "মুস্কিল এই ফেলতেও পারি না, আলমারিও দরকার।—ঘরটি বাল্মিকির আশ্রম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই উইয়ের খোরাক যে কত দিনে শেষ হবে তাও জানি না। ঘর ভাড়া লাগে না—তাই হাজার দুইয়েই রেহাই পেয়েছি।" ইত্যাদি—

হাসি তামাসায় কথাট শেষ হলেও লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরেছিলুম;

ভায়া পরলোক প্রস্থান করলেও, মরলোকে সে কথা আজো আমি ভুলতে পারি নি।

যাক্ এটা আমার নিজের দুর্ব্বুদ্ধির কথা ছিল। এর মানে এমন নয় যে, আমাদের জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের আবশ্যক নেই বা তার পাঠক নেই বা তার দরকার নেই। তবে, কিনে পড়বার বা রাখবার লোক যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা শরৎবাবু খুলেই শুনিয়েছেন। তাঁদের ভরসায় মহাজনদের উৎসাহ বা সাহস বোধহয় জাগে না।

জ্ঞানগর্ভ বই সাপটা ভাবে গ্রহণ করবার যুগ এটা নয় বলেই মনে হয় ভেবে বোঝবার সময় কম। তাকে সাময়িক রুচিসম্মত প্রণালীতে,—স্বচ্ছ রূপ দিলে যে চলে না, এমন কথা বলতে পারি না। ইতিমধ্যে অনেক না হলেও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক যে বেরয়নি তাও নয়। বঙ্কিমবাবুর অনুশীলনের মত কঠিন জিনিষও পাঠক সংগ্রহে নিয়েছিল। পরে শ্রীম কথিত ঠাকুরের কথা, বিবেকানন্দ স্বামীজির কথা, অমিয় নিমাই চরিত, অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ, স্যার গুরুদাসের "জ্ঞান ও কর্ম" প্রভৃতি না থাকলে কোনো পুস্তকাগারই সম্পূর্ণ নয়। হীরেন্দ্রবাবুর পুস্তক কয়খানি যে কোন 'জ্ঞানগর্ভকামীর' আদরের সামগ্রী এবং পুস্তকাগারের রত্ন বিশেষ। এইরূপ আরও আছে। তারা সময়োচিত সুরে জ্ঞানের কথা শুনিয়েছে বলেই বোধ হয় আদর পেয়েছে। বিজ্ঞানের ভালো ভালো বই, অল্প হলেও, কিছু কিছু বেরুচ্ছে। আরো অনেক পেতে পারি। চাহিদা সৃষ্টির অপেক্ষা। Adventure লেখার দিকে আমাদের অবকাশ রয়েছে কম নয়। গল্পাদি অপেক্ষা তা কম চিত্তপ্রিয় বলে মনে হয় না। শরৎবাবুর ইন্দ্রনাথের সামান্য একটু কথা কে সাগ্রহে পড়ে।

উপন্যাস বা গল্পের একটা ঢালা নিন্দে অনেকেই করেন। ভালো মন্দ সকল জিনিষেরই থাকে ও আছে। উপন্যাস ও গল্প জ্ঞানগর্ভের কোটায় পড়ে না, আর তা আশা করেও সেসব কেউ পড়ে না। তারা জীবনমুভূতির কথা কয়,—আনন্দ দেয় তাতে শিক্ষার বা পাবার বস্তু যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, এবং ক্ষমতাশালী লেখক তা প্রচুর পরিমাণে দেবার প্রয়াস পেলেও, তা উপন্যাসের মহলেই থাকবে। কিন্তু নিন্দাটা যদি না পড়েই শুধু 'নভেল' শুনেই করা হয়, সেটা কেবল ক্ষোভের কথাই হয় না, তাতে জাতীয় সাহিত্যকে বাড়তে দেওয়াও হয় না। আবার বই না কেনার কারণ স্বরূপ সেটা যখন ব্যক্ত হয়—তখন সত্যই হতাশ হতে হয়—বিশেষ সমর্থেরা যদি ওই ওজুহাতের আশ্রয় নেন। যেখানা যার কাছে মন্দ

সেখানা তিনি নাই কিনলেন ;—ভালও যে নাই এমন কথা বলা যায় কি ? ভালো বই ও ভালো লেখা যে জাতীয় সম্পদ। সেটা বাদ পড়লে ক্ষতি আছে।

এখানে নভেলের কথাও একটা বলি। বঙ্কিমবাবুর 'রাজসিংহ' যখন প্রথম বেরয় তখন তার আয়তন ছিল এখনকার 'রাজসিংহের' আধখানা। তখন শিক্ষিতদের পড়বার মত এত বাংলা বই ছিল না, এবং শিক্ষিতদের বাংলা বই পড়বার অভ্যাস ছিল কম।

বঙ্কিমবাবু তার দাম রেখেছিলেন দেড় টাকা,- (বোধ হয় ভেবেছিলেন ৸৹ আনাই হওয়া উচিত)—তাই ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তার মর্ম্মটা ছিল—দামটা যাঁর বেশী বলে মনে হবে তিনি কিনবেন না। বাংলাদেশে বই কিনে পড়ার অভ্যাস কম। কোন গ্রামে একখানা কেউ কিনলে যাঁর কেনবার সামর্থ্য আছে তিনিও চেয়ে পড়েন। এরূপস্থলে কম দাম করবার কোনো সার্থকতা নেই,—ইত্যাদি।

অনেক দুঃখেই এই কথা তিনি বলেছিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে দেখতেন --লেখকের একটু নাম থাকলে তা আড়াই টাকায় উঠেও থামচেনা। বোধ হয় আনন্দই পেতেন।

কিন্তু বই কেনা বেড়েছে কি ? যদি কিছু বেড়ে থাকে তো সেটা মালক্ষ্মীদের কৃপায়। শরৎবাবু যে দুঃখের কথা জানিয়েছেন—এবং লেখকদের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়েছেন তা চাক্ষুষ সত্য। তাঁরা যে কতটা চিন্তা সময় শ্রম ব্যয় কোরে দেশকে ও জাতিকে কিছু দেবার প্রয়াস পান, শরৎবাবুর চেয়ে কে আর সেটা বেশী জানেন। এটা তো তাঁর অনুমানের কথা নয়। সব বই সকলের মনে না ধরতে পারে। এ কথাটা কোন্ বিষয়ে বা কোন্ জিনিষ সম্বন্ধে না খাটে। কিন্তু তাঁদের বাঁচিয়ে তবে রাখলে না তাঁরা ভালো বই দেবার চেষ্টা পেতে পারেন। আমি রুচিবিরুদ্ধ বই কিনতে কা'কেও বলচি না। ভালোর জন্যে চেষ্টা পাওয়াই তো সকলের স্বভাব ধর্ম্ম। কেউকি চান—"আমার লেখার নিন্দে হোক্ ?" কিন্তু অনশন বরণ করে তো কেউ লিখতে বসতে পারেন না। আমি সেই কথাই বলছি।

তাই সমর্থরা একটু ত্যাগ স্বীকার কোরে এ বিষয়ে সাহায্য করাটা কর্ত্তব্য বলে ভাবলে ভালো হয়। এ সাহায্য কেবল লেখকদেরই করা হবে না, পরোক্ষে উন্নতিকামী দেশ ও জাতিকেই করা হবে।—আমরা স্বরাজের জন্য আশা করছি ; কিন্তু বড় কিছু আশা করতে হলে তার পূর্ব্বে ঘরের সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন ঠিক রাখতে হয়, ভাণ্ডার সমৃদ্ধ থাকা চাই। বাইরে 'বর্ব্বর' বলেই প্রসিদ্ধি রটছে। সাহিত্য যে ভাণ্ডারের একটা শ্রেষ্ঠ উপকরণ এ কথা ভুললে যে আজ চলবে না।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলি

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই! কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আর একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন

ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমনই বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়েই নিজেই consumer: আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই

produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভাল পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে পায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি. দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনপূতঃ হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না ?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য্য জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তার হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবতঃ যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানোটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'। এর অর্থ, কোনো-কোনো লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। সে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস, অসংগত হবে না।

দুই

আজকের সভায় যে দু-চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে, অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি থাকবে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা, মানুষে এ কালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দুটি কাজ: এক চা-পান, আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে,

The cup that cheers but not inebriates. অর্থাৎ চা পান করলে নেশা হয় না অথচ ফূর্তি হয়। চা পান করলে নেশা না হোক, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। তার পর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

তিন

কাব্যচর্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনো সভ্যজাতি কস্মিনকালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ওসব কথায় ভুলি নে, তখন সেকালেও সম্ভবতঃ কেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাশন ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'নাগরিক' বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে man about town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনো নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

চার

যদি অনুমতি করেন তো এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এ দেশে যেমন একদল ত্যাগী পুরুষ ছিলেন তেমনি আর এক দল ভোগী পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক ধর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার, শুধু আত্মার নয়, দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতিনীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন; অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য, বিশেষতঃ ও-সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

বাহিরে বাসগৃহেও অতিশুভ্রচাদরপাতা শয্যা একটি থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে অনুলেপন, মাল্য, শিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপুটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বূল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক বর্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনো পুস্তক।

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা এর অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐসকল অপরিচিত শব্দের বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া, এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চস্থান; কূর্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনো অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ; আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না। সুতরাং কূর্চ হচ্ছে এক প্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায়, আমরা

যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না ; কিন্তু দেবতার ধার ষোলো আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক ওসব কথা। এখন দেখা যাক, বেদিকা বস্তুটি কি। বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল ; এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয় ; তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা ; কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয় ; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য বুঝতেন। সিক্থকরণ্ডক হচ্ছে মোমের কৌটা ; সেকালে নাগরিকেরা ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তার পর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিপুটিকা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে পাউডার-বক্স ; বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তি সংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা ; টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার 'নিচোল-অবগুণ্ঠিতা' ; বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ি, শাড়িপরা বীণার অবশ্য কোনো মানে নেই ; নিচোল অর্থে গেলাপ ; জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন 'নীলয় নীল নিচোলং', তার অর্থ নীল রঙের একটি ঘেরাটোপ পরো ; ইংরেজি ভাষায় ওর তর্জমা হচ্ছে, put on a dark-blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। তার পর পাই চিত্রফলক ; সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্তিকা-সমুদ্গকের অর্থ তুলি ও রং রাখবার বাক্স। তার পর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তার পর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন ? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হোন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোনো কোনো ধনী-লোকের গৃহে হয় ? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে,

এইসকল বীণাদিদ্রব্য সর্বদা উপঘাতের, অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তিনিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হইবে।

পূর্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন –'যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং', অর্থাৎ যা হোক একটা বই, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-বই, আর যে কারণেই হোক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই—

'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দেশ হইলেও তখনকার যে-কোনো কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণা-বাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকি সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, 'যে-সে বই নয় তখনকার বই'; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্ল্যাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখাবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর-এক কথা। আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, 'এখনকার' বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবতঃ কিপ্‌লিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপ্‌লিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি নে।

বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি? অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ওসব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এ রকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কাল্‌চার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms।

পাঁচ

এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলে

জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে 'মাল্য-চন্দন-বনিতা' এ-তিন একসঙ্গেই এবং ও-তিনই ছিল এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দন শামিল বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালে নাগরিক সমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হলে সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখতে চাই। বলা-বাহুল্য ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই; আরও অনেক হওয়া চাই, কিন্তু ও-দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তি চারতাথতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপর পক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্য-জাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে, মানুষকে ভালো করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হোক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে, মানুষকে ভালো না করা যাক, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও মান্ করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক্, সেকালের নাগরিকসমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার করণ হিসেবে দেখত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন, সেই ভাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। এতে ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম বিদগ্ধমুখনম্। ও রকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। যাই হোক, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার শামিল হল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল 'বিট'। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখতে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাসভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন, আকারের ব্যবহার দেখলে ও কথা শুনলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হাত নিশপিশ করে; অপর পক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাঁকে সাদরসম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায় দু দণ্ড আলাপ করবার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবতঃ চিরকাল করবে; এসকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে। এবং এসকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এসকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ, সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্রাটিক, আর একালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে ডেমোক্রাটিক; সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার, আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখতেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্ল্যাসিক্ সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরই চোখে ধরা পড়বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন; এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন, মুখপাত্রও নন; সুতরাং যে কবির মন নিজের মন, লৌকিক মনও নয় সামাজিক মনও নয়। আর সেকালে কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন।

সেকালের সামাজিকের কলাবিৎ ছিলেন বলে সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারে দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্যাদা ঢের বেশি। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিস্টিক হয়েছে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এইসব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে নাগরিকদের কাব্যচর্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্ল্যাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি এ যুগের ডেমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবতঃ মনে মনে হিংসাও করে; বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের চাপ চিরস্থায়ী রূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্রাসির এ-সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা মেটিরিয়ালিজ্‌মের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ্‌ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।

ছয়

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমতঃ সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়তঃ অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যের দেশে জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবতঃ নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্যে আমরা সকলেই উদ্‌বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবতঃ দুরাশা; কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি,

এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ-বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিতসমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে,

দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে। কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমনকি এ ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর-কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের

বিয়ে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন. যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপানক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাতপা ছুঁড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন 'আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর-এক ঢোক, আর-এক ঢোক' ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মনে যে ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

সাত

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময় ফরাসিদেশে শিক্ষাপদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে-যুগে France was saved by her idlers: অর্থাৎ যারা পাস করতে পারে নি, কিংবা চান নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল

বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কি রকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবু আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলে জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টারমহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর-একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এ দেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তার পর একে একে সবগুলি উগলে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলাগুলির এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গিরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও যাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এই স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম

উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

আট

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার, কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর, সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমানধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত: এক যারা কেতাবি, আর-এক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিতসমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয় এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই, অথচ এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু এ কথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। তার পর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা অতএব কোন নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতির না ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয় আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, এ কথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই

আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কি না জানি নে; সম্ভবতঃ হই নি। কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডেমোক্রাটিক যুগে অ্যারিস্টোক্রাটিক সভ্যতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই। বরং দুয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্মীর দল যেমন এক দিকে বাংলায় ডেমোক্রাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর-এক দিকে আমাদেরও পক্ষে মনের অ্যারিস্টোক্রাসি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্যকলার চর্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে কাব্যকলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক, এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।

বই পড়া বিষয়ে

নারায়ণ চৌধুরী

বই পড়া এমন একটি অভ্যাস যা নিয়ে অতীতে বহু লেখালেখি হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, কিন্তু যার আকর্ষণের রহস্য কোনোদিনই বোধ হয় পূর্ণ ব্যাখ্যাত হবে না। বইয়ের আবেদন এক-এক জনের এক-এক রকম। কেউ বইকে দেখেন প্রধানতঃ তথ্য ও সংবাদের আকর হিসাবে, কারও চোখে বই মূলতঃ রসের উৎস। আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট বইয়ের তথ্যবাহী কিংবা রসবাহী রূপ অপেক্ষাও বড়ো তার জ্ঞানের আবেদন। এমন জ্ঞান, যা প্রজ্ঞায় বিধৃত, দার্শনিকতায় স্থিত। আরও নানা স্তরের ও ভঙ্গীর পাঠক আছেন, যাঁদের এক-এক জনার কাছে বইয়ের আবেদন এক-এক রকমের।

এর থেকে এ কথাটারই প্রমাণ হয় যে, কে কী ভাবে বইকে নেবেন সেটা তাঁর স্বকীয় রুচি পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। তাঁর নিজের মানসিক গঠনটাই বইয়ের ভালো-লাগা মন্দ লাগাকে নিয়ন্ত্রিত করে। একই বই প্রবণতা ভেদে এক-এক জনার নিকট এক-এক মূর্তিতে দেখা দেয়। কেউ তার থেকে আহরণ করেন তথ্য, কেউ রস, কেউ জ্ঞান, কেউ আর কিছু। যাঁর গ্রহিষ্ণুতা বেশী অর্থাৎ এক সঙ্গে অনেক জিনিস গ্রহণ করবার যাঁর ক্ষমতা আছে, তিনি হয়তো একটি বই থেকে একই সঙ্গে একাধিক উপাদান আত্মগত করতে পারেন কিন্তু তেমন পাঠকের সংখ্যা কোনো সময়েই খুব বেশী থাকে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পাঠকভেদে বইয়ের চেহারা বদলায়।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক-মনীষী বেকনের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, কিছু বই আছে যা অখাদ্য, কিছু বই আছে যা গেলনীয়, আর কিছু বই আছে যা তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে হজম যোগ্য (Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested)। এই থেকেও বইয়ের প্রকৃতির ভিন্নতার তত্ত্বটি উপলব্ধি করা যায়। সব বই সকলের জন্য নয়, আবার সকল পাঠক সকল বইয়ের জন্য নয়।

লাইব্রেরীতে বহু ধরণের বই সাজানো থাকে। নানাবিধ বিষয়ের ও ভাবের

বই লাইব্রেরীর শেল্‌ফগুলিতে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। এক বিরাট বিশাল জ্ঞানবারিধি যেন তার উত্তাল তরঙ্গমালাকে সংহত ক'রে গ্রন্থাগারের প্রকোষ্ঠ-মধ্যে থমকে আছে। কোন্ বই কোন্ পাঠকের মনে কী ঢেউ তুলবে সে শুধু সেই পাঠকই বলতে পারেন, অপরের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে, লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার আর কিছু নয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট অগণিত পাঠকদের চাহিদার যোগানের একটি সংগঠিত চেষ্টা। অর্থাৎ লাইব্রেরী একটি 'মালটিপারপাস' পুস্তকভাণ্ডার। এখানে সকলেরই রুচিমাফিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন জ্ঞানের ও রসের সমাবেশ, কে কোন্ জ্ঞানে বা রস গ্রহণে উদ্যত সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বইকে রস, জ্ঞান, তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে যেমন শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, তেমনি বিভক্ত করা যায় বিষয় ওয়ারী ভাবে। অর্থাৎ ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, (বিজ্ঞানেরও আবার বহুতর শাখা) অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি নানা ভাগে বইয়ের জগৎকে ভাগ করে দেখানো যায়। এ ছাড়া বইয়ের একটা কালগত বিভাগও আছে। কোনো বই ক্লাসিক বা ধ্রুপদ, কোনো বই মডার্ণ বা আধুনিক। এই দুই বিপরীত সীমার অন্তর্বর্তী স্তরে নানা বিভিন্ন ধরণের বই বর্তমান। এই ক্ষেত্রেও পাঠকদের রুচির ভিন্নতা অতি প্রকট।

যেমন, কিছু কিছু পাঠক আছেন যাঁরা অত্যাধুনিক বই ছাড়া আর কোনো বই পড়তে ভালোবাসেন না। হালের 'বেষ্ট সেলার' জাতীয় বই—তা যে বিষয়েরই উপরে হোক না কেন, তাঁরা সাগ্রহে লুফে নেন। যতো বড়ো প্রসিদ্ধ লেখকের লেখাই হোক, পুরনো বই পড়তে তাঁদের ভালো লাগে না। হালের লেখা বই পড়ার মধ্যে এক ধরণের সজীবতার স্বাদ আছে মানি, কিন্তু বই মাত্রই তো আর পাঠ্য বই নয়। বরং প্রকাশকদের বইয়ের কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত যে সকল বই প্রস্তুত হয়ে বাজারে আসছে তাদের অধিকাংশই অসার বলতে পারা যায়। নতুন বই হলেই সেটা অসার এটা যেমন কোনো যুক্তি নয়, তেমনি এটাও এই সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, সাধারণ শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদের রুচি পুরণার্থে নিতান্তই অর্থকরী তাগিদে ক্ষেপে ক্ষেপে যে সকল বই বাজারে আসছে ও পাইকারী হারে বিক্রি হচ্ছে, তাদের একটা মোটা অংশই সারবান্ বই হওয়া সম্ভব নয়। জনপ্রিয় বই স্বতঃই মূল্যবান্ বই নয়। বরং বইয়ের জগতে 'জনপ্রিয়তার' লেবেলে যে সকল বই চিহ্নিত তাদের অধিকাংশের সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেই বোধ করি ঠিক কাজ হয়। 'বেষ্ট-সেলার'

জাতীয় বই মরসুমী ফুলের মতো, কিছুকালের জন্য শোভা বিতরণ করেই দৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়, পাঠকের মনের উপর স্থায়ী কোনো ছাপ রাখে না। প্রকাশকের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা 'সফল' বই, সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা সফল বই বলে গণ্য না-ও হতে পারে। বরং বিপরীত হওয়াই সম্ভব। টমাস ফুলারের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, সেটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য 'Learning hath gained most by those books by which the printers have lost'. অর্থাৎ সেই সব বই থেকেই মানুষ সমধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে যেগুলি ছেপে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একথা যে সত্য তাতে আর সন্দেহ কী। ভালো বই বাজারে কাটতে চায় না, কিন্তু মন্দ বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। জনৈক লেখক সখেদে বলেছেন, জনপ্রিয় সাহিত্য মানেই জোলো সাহিত্য। কথাটা অকারণে বলেননি।

অন্যপক্ষে একজাতের পাঠক আছেন যাঁরা সমসাময়িক কালের লিখিত বই সম্বন্ধে উৎসাহী নন, তাঁরা ভালোবাসেন ক্লাসিক বা ধ্রুপদী সাহিত্য। অগণিত পাঠকের অনুরাগধন্য যে সকল গ্রন্থ যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হয়ে কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে, সেইসব চিরায়ত বই বার বার পড়েও এঁদের আশ মেটে না, যতো বার পড়েন ততোই তাদের নতুন নতুন তাৎপর্য, নতুন নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনা খুঁজে পান। আর ওই সব বইয়ের এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই ওইগুলি ক্লাসিক মহিমায় ভূষিত হয়েছে, বইগুলি আগে ক্লাসিক ব'লে চিহ্নিত হয়ে পরে পাঠকের ভালো লেগেছে এমন তো নয়। যা-কিছু পুরাতন তা-ই শ্রদ্ধেয় নয়। পুরাতন বইয়ের মধ্যে ঝড়তি-পড়তি সব বই কালের নিয়মেই ঝরে গেছে, যেগুলির চিরন্তন মূল্য রয়েছে সেগুলিই শুধু অম্লান মহিমায় বিরাজ করছে।

ক্লাসিক বা চিরায়ত বই পড়ার মস্ত লাভ এই যে, অতীত যুগের মনীষী ভাবুক কবিরা কী ভেবে গেছেন কল্পনা করে গেছেন, এ যুগে বসেও স্বাদ আমরা পেতে পারি। তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁদের সান্নিধ্য চর্চা করতে পারি। ধ্রুপদী লেখকেরা বিগত হয়েছেন অনেক দিন, কিন্তু প্রত্যক্ষে তাঁরা বেঁচে না থাকলেও আমাদের মনে তাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের সহায়ে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড অডিসি সংস্কৃত তথা গ্রীক কাব্য ও নাটক কতো পুরনো দিনের সৃষ্টি, কিন্তু সে-সবের আকর্ষণ বিচক্ষণ পাঠকের কাছে আজও মন্দীভূত হয়নি তার কারণ এগুলিতে এমন সব চরিত্রের ও পরিবেশের ছবি আছে, এমন সব ঘটনার রূপায়ণ আছে, সর্বোপরি চিত্রিত চরিত্রগুলির মুখে

এমন সব জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও তাদের স্রষ্টা লেখকের কল্পমে এমন সব রসঘন মন্তব্য আছে যে, সে সবের অনুষ্ঠানে আনন্দ এবং শিক্ষা দুই-ই প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু আনন্দ নয়, শুধু শিক্ষা নয়—আনন্দ ও শিক্ষার যুগ্ম পার্বতী-পরমেশ্বর রূপ প্রতিটি সার্থক চিরায়ত সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয়। তার উপর চিরায়ত সাহিত্যের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী কন্‌টেন্ট ও ফর্ম, মর্ম ও আঙ্গিক—দুইয়েরই মর্যাদা সমান স্বীকৃত। পরবর্তীকালের রোমান্টিক সাহিত্যের ধরণধারণ থেকে তার জাতই আলাদা। রোমান্টিক কাব্যসাহিত্য ভাবসমৃদ্ধ কিন্তু অস্বচ্ছ প্রকাশশৈলীতে কুয়াসাচ্ছন্ন। ধ্রুপদী সাহিত্যে সেরকম নয়। তার রচনারীতি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। এ কথা অতীত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যেমন সত্য, তেমনি দূরাগত বা নিকটাগত মধ্য যুগে সাহিত্য সম্বন্ধেও সত্য। দান্তে, পেত্রার্কা, সেক্সপীয়র, গ্যেটে প্রমুখের রচনারীতিই সে কথার সাক্ষ্য বহন করছে।

পুস্তকপাঠ সৎসঙ্গ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। বাস্তব জীবনে সৎ লোকের সঙ্গ খুব বেশী মেলে না, মিললের তার পুরাপুরি উপযোগ করা যায় না—সময়গত ও অন্যান্য কারণে। পুস্তকপাঠের বেলায় সে অসুবিধা নেই। বরং নির্জনতা ও নিভৃতি পুস্তকপাঠককে সৎ সান্নিধ্য অনুশীলনের অপরিমিত সুযোগ এনে দেয়, যদি তাঁর থাকে পড়ার উপযুক্ত অবসর। শান্ত, অবিক্ষুব্ধ পরিবেশ—যা কেবলমাত্র ভিড় ও কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারলেই আয়ত্তগম্য হওয়া সম্ভব—পুস্তক-পাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন আর এ রকম পরিবেশেই কেবল সৎসাহিত্য পাঠের অর্থাৎ সৎসান্নিধ্য চর্চার শ্রেষ্ঠ সুফল লাভ করা যায়।

চিরায়ত সাহিত্য আর আধুনিক সাহিত্য এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচার করতে গেলে, সৎসঙ্গের অনুশীলনের পক্ষে চিরায়ত সাহিত্য অনেক বেশী প্রশস্ত। আধুনিক সাহিত্যে আছে সজীবতা, প্রাণোচ্ছলতা, কিন্তু প্রজ্ঞাশীলতার দিক্ দিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের কোনো তুলনাই হয় না। চিরায়ত সাহিত্যে topicality-র—সাময়িকতার—আকর্ষণ খুঁজতে গেলে নিরাশ হতে হবে, তার জন্য আধুনিক সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার পড়ে রয়েছে; কিন্তু অর্বাচীন সাহিত্যে যেটা নেই প্রাচীন সাহিত্যে সেটা আছে—পরিণত চিন্তা ও উপলব্ধির সুপ্রচুর সুসমৃদ্ধ ফসল। জীবন জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে ধ্রুপদী লেখকদের সিদ্ধান্ত-সমূহ সত্যের অনেক বেশী কাছাকাছি। বৈজ্ঞানিক সত্যের হয়তো নয়, বজ্ঞা (intuition) প্রসূত সত্যের।

প্রাচীন সাহিত্যের আকর্ষণ যে কতো দুর্নিবার কবি ও মনীষীদের উক্তি থেকে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। দু-একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করছি। ইংরেজ কবি রবার্ট সাদে লিখেছেন—

My days among the Dead are passed ;
Around me I behold,
Where'er these casual eyes are cost,
The mighty minds of old ;
My never-faillng friends are they,
With whom I converse day by day.

অর্থাৎ. মৃত মনীষীদের মধ্যেই আমার দিন কাটে। আমার চারপাশে যেখানেই আমার দৃষ্টি যায়, দেখতে পাই শক্তিশালী মনের অধিকারী ব্যক্তিরা আমাকে ঘিরে রয়েছেন। আমার নিত্য-সহযোগী বন্ধু তাঁরা, তাঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমার বাক্যালাপ চলে। মিল্টন তাঁর বিখ্যাত 'অ্যারিও প্যাগিটিকা' গ্রন্থে (যা লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল) লিখেছেন—A good book is the precious life blood of a master-spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life. অর্থাৎ সৎ গ্রন্থ হচ্ছে একজন মহান্ চিন্তানায়কের অমূল্য জীবন-শোণিত, যা জীবন থেকে জীবনান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক সযত্ন-সঞ্চিত রাখা হয়েছে। প্রাচীন মিশরে মৃত দেহ সুগন্ধি মসলা ও তৈলাদি দ্বারা সুবাসিত করে সংরক্ষণের রীতি ছিল, এখানে সেই রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ, সৎ গ্রন্থ বলতে খুব সম্ভব মিল্টনের মনের পটভূমিতে ছিল ধ্রুপদী সৎ গ্রন্থ। (মিল্টনের স্বরচিত কাব্যাদিও আজ ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।) যে সব গ্রন্থে কোনো না কোনো আকারে ধ্রুব সত্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে সেগুলিকেই আমরা ধ্রুপদী বা চিরায়ত সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি।

পড়ার নেশা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা-ঘটনা-সংস্থানে চারপাশে বই নিয়ে আমার জীবন গড়ে উঠেছে। ছোট ঘরের সঙ্কীর্ণ তক্তপোশের অর্ধেকটা এখনো বই দিয়ে ভরা থাকে। কখনো কখনো শুধু পুস্তকের সান্নিধ্যটাই অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এককালে এটা কিছু আত্মতৃপ্তি দিত। কিন্তু আজকাল মোহ দূর হয়ে গেছে। সিনেমা, সঙ্গীত, চিত্রকলা বা ফুটবল খেলা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বই পড়ার আনন্দ বেশী মর্যাদা পাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাইনে।

অবশ্য আনন্দের আগে আছে প্রয়োজন। আজকাল বই ও সংবাদপত্রের সাহায্য ছাড়া জীবন চলা দায়। সভ্যতার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি কাগজ বা পুস্তকের যুগে। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কথা বাদ দিলেও, দৈনন্দিন জীবনে বই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল গুরুবাদ; গুরুরা ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্মম পুঁজিপতি। তাঁদের হাতে-পায়ে ধরে শিষ্যবৃন্দ ছিঁটে-ফোটা জ্ঞান লাভ করতেন। গুরুকে যে কোনো উপায়ে তুষ্ট করা ছাড়া পথ ছিল না। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীরা থাকত অনেকটা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো। ঘরঝাঁট দেওয়া, জল আনা, গরু রাখা এবং গুরুর পা টিপে দেওয়া প্রভৃতি ছাড়াও শিক্ষা শেষে গুরু দক্ষিণার দাবীটা ছিল আরো কঠিন। একলব্যের মতো শুধু আঙুল কেটে দিলেই যথেষ্ট হতো না, প্রস্তুত থাকতে হতো মাথা দেবার জন্যেও। কিন্তু এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেও সকলের পক্ষে গুরুর চরণে আশ্রয় পাওয়া সহজ ছিল না। শিষ্য হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত গুরুর ইচ্ছার উপর। এই খেয়ালী মেজাজের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। এক ঋষি তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর ছেলেদের যথারীতি পড়াতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তাঁর শূদ্রাণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলে যখন পড়তে এলো তখন তাকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলেন। অভিমানী বালক মার কাছে ফিরে এসে কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে নিজের চেষ্টায় সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করল এবং ঋগ্‌বেদের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত টীকা লিখল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'।

শূদ্রা বা ইতরার ছেলে বলে একদিন যে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন 'ঐতরের ব্রাহ্মণ' নামের মধ্যে সেই অভিমানটুকু চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে গুরুদেবদের ক্যাপিটালিষ্ট মনোবৃত্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীও অনেক সময় অধ্যয়নের সুযোগ পেত না।

প্রাচীনকালে বই ছিল না বলেই এমনটা সম্ভব হতো। তালপাতার পুঁথি প্রচলিত হবার পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। একে তো লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া নিজেদের প্রভাব কমে যাবার আশঙ্কায় পুঁথির প্রচলন করতে গুরুরা চাইতেন না। য়ুরোপে তো প্রথম দিকে বইগুলো মঠের গ্রন্থাগারে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, যাতে কেউ বাইরে নিয়ে নকল করে প্রচার করতে না পারে। প্রাচীনকালের কথা নাইবা বললাম কয়েক শতাব্দী পূর্বেও রঘুনন্দন মিথিলা থেকে গুরুকে এড়িয়ে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে বাঙলা দেশে নিয়ে এসেছিলেন। নকল করে আনবার অনুমতি পাওয়া যায় নি। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলেই গুরু তাঁর সম্পূর্ণ বিদ্যা গোপনীয়তার শপথ করিয়ে প্রিয়তম শিষ্যকে দিয়ে যেতেন। এমনি করেই যুগ যুগ ধরে গোপনীয়তা রক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে এলো নতুন যুগের সূচনা। জ্ঞানের রাজ্যে গণতন্ত্র নিয়ে এলো বই।

যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে, আজ সকলের জন্য তার দ্বার মুক্ত হয়েছে। আর সব চেয়ে বড় কথা জ্ঞান বর্তমানে আর্থিক বিনিময়ের সহজ পর্যায়ে অনেকটা নেমে এসেছে। আগে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হতো গুরুর উপর। টাকা দিয়ে বই পাওয়া যায়, শিক্ষকের সাহায্য পাওয়াও স্বাভাবিক। গুরুর বাড়ীতে রাখাল হয়ে থাকবার প্রস্তাব তো দূরের কথা, আজকাল কোন অধ্যাপক ছাত্রকে বলবার কল্পনাও করতে পারেন না যে, লাইনে দাঁড়িয়ে আমার রেশনটা এনে দাও, তার বদলে লজিকটা বুঝিয়ে দেব। ছাত্ররা আগের মতো শিক্ষককে সমীহ করে চলে না। ক্লাশে না পড়া শুনে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে। কারণ জানে শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য নয়। বই পড়ে নিজেই জেনে নিতে পারবে। না পারে তো পরীক্ষায় অভিধানের কিম্বা টিউটরের সাহায্য নিলেই চলবে। ভবিষ্যতে শিক্ষকের মর্যাদা আরো কমে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা মেধাবী ছাত্র তারা নিজেরাই বই পড়ে বুঝতে পারে, আর যারা মেধাহীন তারা না বুঝে নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের আপাতত প্রয়োজনটা

মিটিয়ে নিতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের আবশ্যক কি? প্রয়োজনের সঙ্গে শ্রদ্ধার মাত্রাও কমে আসছে।

কমলেও এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি যাঁরা লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা আজও একটু বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। এটা পুরানো সংস্কারের অবশেষ ছাড়া কিছু নয়। লিপি আবিষ্কারের পরই সকল দেশে তাকে ধর্ম সাধনার সহায়করূপে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের প্রথম রচিত গ্রন্থগুলি ধর্মসম্বন্ধীয়। বইগুলি সযত্নে রাখা হতো মঠ ও মন্দিরে। জনসাধারণ এসব ধর্ম পুস্তকের পাঠ শুনতে আসত চণ্ডীমণ্ডপে এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে। দেবনাগরী, দেবভাষা প্রভৃতি নাম ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক দ্যোতক। প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফিক 'Hieroglyyhic'-এর গোড়ার অর্থও "Sacred carving" লেখক ও পাঠকরা সবাই ছিলেন ঈশ্বরভক্ত ধর্মসাধক। সুতরাং জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ধর্ম থেকে বিযুক্ত হলেও বই ও বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে, তাঁদের প্রতি সম্মানটা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

যোগ্য হলে নিশ্চয়ই তাঁরা সম্মান পাবেন। বই সমাজের কতটা উপকার করেছে তা বিচার করলে বোঝা যাবে একে কেন্দ্র করে যাঁরা আছেন তারা এখনো বিশেষ সম্মানের যোগ্য কি না। এককালে পৃথিবী ছিল পুস্তকহীন; বর্তমানে সাময়িক পত্রিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অন্তত পৌনে দু'লক্ষ বই (টাইটেল) প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক পড়ছে এসব বই। গ্রেট বৃটেনের কথাই ধরা যাক। এখানে শুধু লাইব্রেরী থেকে বার্ষিক প্রায় বত্রিশ কোটি বই পড়বার জন্য ধার দেওয়া হয়। এগুলো কিনে পড়তে হলে দাম লাগত দু'শ দশ কোটি টাকা। অন্য দেশ এখনো এতটা বই পাগল হয়নি। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বইএর চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এত বই পড়েও কি আমরা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছি। তিন হাজার বছর আগে যে সুখ ও শান্তি ছিল না, আজ কি তা এসেছে আমাদের জীবনে? ক্ষুধা, মড়ক ও যুদ্ধকে দূর করা আজও সম্ভব হয় নি। হবে যে, এমন ইঙ্গিতও চোখে পড়ে না। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনে প্রকৃত মহৎ বিপ্লব নবযুগের শুভ সূচনা করেনি এখনো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বই গৌণ; হাতে-কলমে পরীক্ষাটাই মুখ্য। তবে বই পড়ে কি হয়? কেন তার সম্মান?

আপনার মতো আমিও পুস্তক পাঠের শতেক গুণ দেখিয়ে জবাব দিতে পারি। শুধু তাই নয়, বিশ্বাসও করতাম কিন্তু সে বিশ্বাস ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। এত ভালো বই আছে, ইতিহাসের শিক্ষা আছে, তবু কি সত্যকে চিনতে পেরেছি? ক্রুশবিদ্ধ করবার পর যীশুখৃষ্টকে আমরা স্বীকার করেছি ঈশ্বরের পুত্র বলে। আবার জোয়ানকে পুড়িয়ে মেরে সেন্টদের দলভুক্ত করা হয়েছে। এমন দুটো জাজ্বল্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে আমাদের হাতে প্রাণ হারাতে হলো। ভালো বইয়ের পৃষ্ঠায় বন্দী মহৎ আদর্শগুলি নিরুপায় সাক্ষী হয়ে রইল। নিষ্ঠুর নির্বুদ্ধিতা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারল কই?

গান্ধীজীর জীবন যত বড়ই হোক, তাঁর মৃত্যু অন্ততঃ এক দিক থেকে অনন্যপূর্ব। আর কোন মৃত্যু পৃথিবীর সর্বত্র এমন শোকোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারে নি। শালবনের নিভৃতে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর। চারপাশে ক্রুদ্ধ জনতার উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে যীশু পরলোকগমন করেছিলেন। লাঞ্ছনার ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর বন্ধুরাও সামনে এগিয়ে যেতে পারে নি। পায়ে হেঁটে মন্থরগতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সুতরাং মহতের মৃত্যু হৃদয় পরিবর্তনের যে সুযোগ আনে, সেকালে তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞানের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। বই, সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্ম প্রভৃতি আগেই তাঁর নামকে পরিচিত করে পটভূমিকা তৈরী করেছে। তাই আশা করেছিলাম যে বেদনা অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর হৃদয়কে এক করেছে, তারই সাহায্যে এক মহৎ আদর্শ গোড়াপত্তনের সুযোগ আসবে; গান্ধীজীর জীবনবেদ পথ দেখাবে আমাদের। বই ও সংবাদপত্রের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচারের যতটা সুযোগ পেয়েছে আর কোন মহাপুরুষই তা পান নি। কিন্তু এতে ফল কিছুই হলো না। চেষ্টারটন এক জায়গায় বলেছেন যে, বর্তমান যুগে আমরা অতীতের মতো ঢিল ছুঁড়ে মহাপুরুষদের হত্যা করি না; গোলাপ ফুলের তোড়ার নীচে চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারি। প্রশংসার গোলাপ ফুল আজকাল ফোটে বইয়ের পৃষ্ঠায়। গান্ধীজীকে আমরা বুঝতে চাইনি, চাইনি গ্রহণ করতে; তাকে ভাসিয়ে দিয়েছি প্রশস্তির বন্যায়।

শোপনহাওয়ার সম্বন্ধে এক গল্প আছে। তিনি হোটেলে গিয়ে প্রত্যহ একটি স্বর্ণ মুদ্রা টেবিলের উপর রেখে খেতে বসতেন। ওয়েটার ভাবত ভালো করে খাওয়ালে বুঝি ঐ মুদ্রাটি পুরস্কার পাবে। কিন্তু রোজই শোপনহাওয়ার ওটি

পকেটে ফেলে চলে যান। কৌতুহল দমন করতে না পেরে ওয়েটার একদিন প্রশ্ন করল যে, রোজ স্বর্ণ মুদ্রার লোভ দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবার কী অর্থ? দার্শনিক জবাব দিলেন, আমার চারপাশের টেবিলে যে সব লোক খেতে বসে তারা যেদিন কুকুর, ঘোড়া ও মেয়েদের সম্বন্ধে কথা না বলে কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে শুনতে পাব সেদিন এই মোহরটি ভিখারীদের দিয়ে দেব।” শোপনহাওয়ার স্বর্ণ মুদ্রাটি বিলিয়ে দেবার সুযোগ পাননি। আজকে সে সুযোগ আরও সুদূর পরাহত। কোন গভীর বিষয় উপলব্ধি করবার মতো মানসিক স্থৈর্যের অভাব ঘটেছে। সমাজে চলতে গেলে পৃথিবীর সব খবরই রাখা চাই। খেলাধুলা, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম সব বিষয়েরই কিছু কিছু খবর না রাখলে সাধারণ আলাপ আলোচনাও চলতে পারে না। একালের কালচার মনকে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে দেবার মধ্যে, সকল বিষয়ে দু' একটা কথা বলবার ক্ষমতা থাকা চাই; না হলে লোকে আপনার শিক্ষায় সন্দেহ প্রকাশ করবে। যিনি সাহিত্যের চর্চা করেন, তাদের শুধু সাহিত্যের খবর রাখলেই চলবে না, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলা, কোরিয়ার যুদ্ধ, পিকাসোর শিল্পনরীতি, ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফরাসী মন্ত্রীসভা, খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যান প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে দু' চারটে মন্তব্য করবার মতো পটভূমিকা না থাকলে অবজ্ঞার পাত্র হওয়াই সম্ভব। বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে; বইয়ের মারফৎ টেবিলের উপর সংগৃহীত হয়েছে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার কিন্তু এদের সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞান নানাবিষয়ের উন্নতি করলেও আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেনি। পূর্বে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে স্বল্প পরিধির মধ্যে দু একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা সম্ভব৭র হতো আজ তাকে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুচ্ছ ও অমূল্য সকল প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করতে চাই। সুতরাং আমরা সব কিছুর উপর চোখ বুলিয়ে যাই, মন বুলাতে পারি না। পারি না গভীর বস্তুকে আয়ত্ত করতে। গোয়েন্দা কাহিনী ও রম্যরচনা তাই এ যুগের বিশেষ সৃষ্টি।

চীনা দার্শনিক তাওয়াই বলেছেন, অন্যকে যে জানে সে চতুর, নিজেকে যে জানে সে জ্ঞানী। বইয়ের যুগ আমাদের চতুর করেছে; অন্যকে জানবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা স্মার্ট হয়েছি; কিন্তু নিজেদের চেনা হয়নি। সকাল বেলায় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় থেকে রাত্রিতে রেডিয়োর শেষ সংবাদ পরিবেশন পর্যন্ত কেবলই অপরের মতামতের বন্যায় হাবুডুবু খাই। নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকবার সুযোগ নেই; একটা জিনিস যে মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে দেখব

তেমন ফুরসৎ আর কোথায়? বই ও পত্রিকা চারদিক থেকে এসে অপরের চিন্তা ভাবনাগুলি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। পৃথিবীর কোন সমস্যাকে নিজের মতো করে ভেবে দেখবার অবসর পাওয়া যায় না। নিজেকে চিনবার চেষ্টা তো দূরের কথা, মনের বিশিষ্ট কাঠামোটি রক্ষা করাই মুশকিল। একই বিষয়ে কত বিভিন্ন মত এবং প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের ছাপ মারা। এর কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি নয়? চিন্তারাজ্যের এই 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা তুলে দিয়ে খানিকটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্ভব হলে আমাদের হয়তো মঙ্গলই হবে। শস্যের চাষ করতে আগাছা তো উপড়ে ফেলতেই হয়।

জীবনের গভীর উপলব্ধির জন্য বই অপরিহার্য নয়। এশিয়ার অনেক মহাপুরুষ ছিলেন নিরক্ষর। তাঁরা জগতকে দেখেছেন প্রত্যক্ষরূপে, বইয়ের জানালা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেননি। উপলব্ধি যেখানে সত্য, প্রকাশ সেখানে হয় সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত। গীতা, বাইবেল, কোরানের মতো এক একটি গ্রন্থে যুগ যুগান্তের সত্যোপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ বইয়ের পৃষ্ঠায় এক কথাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যানুভূতির অভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করি এখন। সত্য যদি কোথাও থাকে তাও অনাবশ্যক বহু ভাষণের ফলে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না: এক রাজা মানুষের ইতিহাস জানতে চাওয়ায় ঋষিকল্প সভাপণ্ডিত পাঁচশ, খণ্ডের বই এনে হাজির করলেন। রাজা শাসনকার্যে ব্যস্ত, এতবড় বই থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর জানবার সময় নেই। বললেন বই সংক্ষেপ করে আনুন। বিশ বৎসর পরে পণ্ডিত আবার এলেন পাঁচশ'র পরিবর্তে পঞ্চাশ খণ্ড বই নিয়ে। রাজা তখন বৃদ্ধ বড় বড় বই পড়বার শক্তি নেই। অনুরোধ করলেন আরো সংক্ষেপ করে আনতে। আবার বিশ বছর কেটে গেল; পণ্ডিত এবার মাত্র একখণ্ড বই হাতে করে এলেন কিন্তু রাজা তখন মৃত্যু শয্যায়, এক পৃষ্ঠা পড়াও অসম্ভব। পণ্ডিত এই দেখে একটি বাক্যে মানুষের ইতিহাস রাজাকে শুনিয়ে দিলেন: He (man) was born, he suffered, and he died. বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; তাই পাঁচশ' খণ্ডের বই এক লাইনে সংক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। আর এ-যুগে মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্য পেয়ে এক লাইনের বক্তব্য পাঁচশ' বইয়ে ফেঁপে ওঠে।

বই পড়াকে মোটামোটি দুভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত, প্রয়োজনের পড়াটা

হলো এ যুগের বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রর জন্যই বই দরকার। গুরুবাদ উঠে গেছে, সে জায়গায় এসেছে বই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মিস্ত্রি, কারুশিল্পী সবার কাছে আজ বইয়ের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ইলেকট্রিসিটি, ট্রেন, জলের কল ইত্যাদি ছাড়া আজকাল আমাদের যেমন চলে না, বই তেমনি হয়ে উঠেছে জীবনের অত্যাবশক অঙ্গ। প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজ করা হয়, তার জন্য তো সম্মান দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর একশ্রেণীর পাঠক প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার পরও বই পড়ে; খেয়াল খুশি মতো মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টানো কিংবা দু-একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়বার কথা বলছি না। বই না হলে যাদের চলে না, পড়াটা যাদের কাছে আনন্দের উৎস,—বলছি তাদের কথা। এ ধরনের পাঠকের সংখ্যা সব দেশেই কম। বৃটেনে পাবলিক লাইব্রেরীর কল্যাণে বিনা চাঁদায় যে কেউ বই পড়তে পারে। কাছে লাইব্রেরী না থাকলে দরজার গোড়ায় মোটর ভ্যানে করে চলমান গ্রন্থাগার চলে আসে। এত সুবিধা সত্বেও জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ জনের বেশী নিয়মিত ভাবে লাইব্রেরীর সুযোগ গ্রহণ করে না। কয়েকমাস পূর্বে স্যাটার-ডে রিভিয়্যু পত্রিকায় এক প্রবন্ধেও দুঃখ করে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে বই পড়বার আগ্রহ দেখা যায় না। না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পরও নিয়মিত বই পড়াকে নেশা বলা যায়। নেশা কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এবং নেশা প্রধানত ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলে সকলের এক নেশা হবে, তাও বলা চলে না। তাস খেলা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি আর পাঁচটা নেশার মত বই পড়বার আনন্দ শুধু একাংশের মন আবিষ্ট করতে পারে।

বই পড়তে ভালো লাগে, সময় পেলে বই নিয়ে বসি। বই পড়ে সংসারের কোনো উপকার করেছি এমন মিথ্যা অহংকার আমাদের নেই। নিজেরও উপকার করি না; শুধু আনন্দ পাই। কিন্তু এ আনন্দ নেহাৎ ব্যক্তিগত অনুভূতি। সুতরাং একমাত্র বই পড়বার জন্য কারো সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা ডক্টরেট থিসিসের জন্য সংকীর্ণ গণ্ডীর নির্দিষ্ট ধারায় অধ্যয়ন করি না। রোজই পড়ি; কিন্তু পড়ায় আছে স্বাধীনতা। আজ যদি পড়ি মেয়েদের পোশাকের ইতিহাস, কাল পড়ব এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংএর প্রিয় কুকুর ফ্লাসের জীবনী। পরশু সকালে তুলে নেব রাশিয়ান দর্শনের ইতিহাস, আর

বিকেলে খুলে বসব হাওয়াই দ্বীপের উপকথা। পড়ে হজম করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বই রাখবার আনন্দটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একালের অগুনতি হাল্‌কা সাহিত্য আমাদের জন্যই বুঝি সৃষ্টি হয়েছে। বইখোর আমরা কাগজ যুগের প্রোডাক্ট। বইয়ের সাহায্যে ঘরের কোণে বসে আমরা দেশ-দেশান্তর ঘুরে আসি; মানুষের হৃদয় অরণ্যে প্রবেশ করি; বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণে প্রতিফলিত করি। এই আমাদের বিলাস, এই আমাদের আনন্দ।

অন্যান্য অনেক নেশার খোরাক যোগাবার জন্য নিয়ম-নির্দিষ্ট পথ আছে। আমাদের জন্য কিন্তু এখনো তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। অন্ততঃ এদেশে নয়। হয়তো লাইব্রেরীর কথা তুলবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর গোড়ার কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, এর সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে; নেশা-খোরের উপকরণ যোগানো মোটেই এর উদ্দেশ্য নয়। বিলেতে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে, সাধারণের অর্থ দিয়ে নাটক নভেল লাইব্রেরীর জন্য কেনা উচিত কিনা। একদল বলেছে যে সবাই তো বই পড়ে আনন্দ পায় না; কারো ভালো লাগে খেলা, কারো বা সিনেমা। শ'র পিগমিলিয়ান বইটি কিনে কর্তৃপক্ষ যদি কয়েকজনের আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করেন তাহলে যারা সিনেমা ভালবাসে তাদের জন্য পিগমিলিয়ান ফিল্মটি দেখানো হবে না কেন? সভ্য সমাজের রীতি বিরুদ্ধ না হলে সব আনন্দের মূল্যই তো এক। তাহলে পক্ষপাতিত্ব করা হবে কেন? যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার নয়।

লণ্ডনের বইখোরদের সুযোগ সুবিধার বহর দেখে ঈর্ষা হয়। বিনা চাঁদার লাইব্রেরী জলের মত সমস্ত দেশটা ঢেকে রেখেছে তবু যাদের পড়ার নেশা আছে তাদের পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয়। নেশাখোরদের উপকরণ যোগায় কমার্শিয়াল লাইব্রেরীগুলি। এরা চাঁদা নিয়ে বই দেয়, তাই ফ্রী পাবলিক লাইব্রেরী থেকে পার্থক্য বোঝবার জন্য 'কমার্শিয়াল' কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা পাবলিক লাইব্রেরীর চেয়ে পাঠকদের সন্তুষ্টির জন্য বেশী মনোযোগ দেয়। অথচ তুলনায় চাঁদা খুবই কম। বছরে ষোল টাকা চাঁদা দিয়ে অনধিক সাড়ে দশ শিলিং দামের যে-কোনো উপন্যাস এবং একুশ শিলিং দামের অন্য যে-কোনো বই একবার একখানা করে পড়বার জন্য পেতে পারেন। পড়ে শেষ করতে পারলে দৈনিক একখানা করে বই ধার করতেও বাধা নেই; নতুন বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই এসব লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। আর একটি লোভনীয় সুযোগ পাওয়া যায় এদের "গ্যারাণ্টিড সার্ভিস" অর্থাৎ, বছরে পঁয়তাল্লিশ টাকার মত চাঁদা দিলে

কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর যে-কোনো বই সংগ্রহ করে দেবে। যদি স্টকে না থাকে, তাহলেও দু-একদিনের মধ্যে যে করে হোক দাবী মিটবে আপনার। অবশ্য বইএর দাম একুশ শিলিংএর মধ্যে হওয়া চাই। এমনি আরও অনেক রকম সুবিধা চাঁদাদাতারা পেতে পারে। লণ্ডনে অসংখ্য কমার্শিয়াল লাইব্রেরী আছে। শহরের বাইরেও এদের শাখা রয়েছে। গ্রামে চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায় সুলভ প্রতিযোগিতা থাকে বলে পাঠকেরা লাভবান হয়।

কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর কয়েকটি শোচনীয় অনুকরণ দেখেছি। বলা বাহুল্য, নিত্য নতুন বইয়ের দাবী মেটানো এদের শক্তির বাইরে। আমাদের জন্য এত বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিকে সেগুলো হাতে পৌঁছে দেবার মতো কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়বার উপযুক্ত একটি বই সংগ্রহ করা যে কী কঠিন; তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। খোরাক জোটে না বলে অনেককেই বই পড়া ছেড়ে দিতে হয়। স্বধর্মীদের ধর্ম ত্যাগের বেদনাদায়ক দৃশ্য অনেক দেখেছি। প্রায়ই চোখে পড়ে বই পাওয়া যায় না বলে কত উদীয়মান বইখোর শেষ পর্যন্ত তাস পাশার আড্ডায় কিংবা ফুটবল ক্রিকেটের মাঠে ভিড়ে পড়ে।

বই যাঁদের কাছে নিছক আনন্দের উৎস, এই বিপদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পাঠকের দায়িত্ব

দীপেন্দ্র সান্যাল

কথামালায় পড়া গেছে ব্যাং-এর যখন দুঃসময়, তখন ঢিল ছোঁড়ায় উন্মত্ত বালকদের ছিলো সুসময়! বাঙলাদেশেরও আজ যখন দুঃসময় তখনই দেখছি বাঙলা-সাহিত্যের অ্যাং-ব্যাং লেখকদের চরম সুসময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই বাঙলাদেশের কৈশোর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রথম দেখলো পথের উপর সেইসব কাণ্ড দিনের আলোয় ঘোটতে, যা বর্ণনারও অতীত লজ্জার। যুদ্ধ এক সময় থামলো, বিদায় নিলো খাকীরা। কিন্তু দাগ বোসে গেল কিশোরমনে। চিরকালের মতো ভেঙেচুরে গেলো যা কিছু শ্রদ্ধার—তার ভিত। এবং তার সুযোগ নিলো বোম্বাই সিনেমা। সিনেমার চটুল সুর—সুড়সুড়ি দেওয়ামাত্র, হুড়মুড় কোরে ভেঙে পড়লো প্রেক্ষাগৃহের সামনে তারাই যাদের এই দুষ্কর্মের পীঠস্থান থেকে থাকা উচিত ছিলো শতহস্ত দূরে।

সিনেমা থেকে সাহিত্যের আঙিনায় এখন পা বাড়াচ্ছে এই পাপ। সাহিত্য আজ আর নেশা নয়, পেশা। পেশাদার লেখক চাইছে সস্তায় কিস্তিমাত কোরতে। চাইবারও কথা। পাঠককে পেষাই যে লেখকের একমাত্র পেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, তার প্রধান কারণ সস্তায় কিস্তিমাতের পেছনে প্রচণ্ড উস্কানি রোয়েছে প্রকাশকের। প্রকাশক বোলছে, যে বই-এর সংস্করণ সাতদিনে হয় সে বই-ই শুধু বই। তার লেখকই শুধু লেখক। এইভাবে জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকে ছেয়ে গেছে কিতাবপট্টি। জাত লেখকের দিন গেছে, এসেছে বজ্জাত লেখকের সুদিন। একদিন পকেটকাটা ছিলো যার পেশা, তারও আজ 'যখন পকেটমার ছিলাম' বোলে বই লিখতে বাধা নেই। সে বই এদেশের সাপ্তাহিকে মাসিকে ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ কোরতে নেই অসুবিধে এবং ঝকমকে মলাটে বিক্রি হোতেও অনন্ত সুবিধা আজ সকল সম্ভ্রান্ত দোকান থেকেই।

জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকের সোনায়-সোহাগা যোগাযোগ ঘোটেছে লাইব্রেরীর কৃপায়। পাড়ায়-বেপাড়ায়, অফিস-পাড়ায়, স্কুল-পাড়ায়, কলেজ-পাড়ায় গোড়ে ওঠা লাইব্রেরী—গৌরী সেনের টাকায় আজ ছিনিমিনি খেলতে বোসেছে।

এতো টাকা তাদের হাতে এসেছে যে, যে কোনো বই বেরুনো মাত্রই তারা এক অথবা একাধিক কপি বিনাবিচারে নিয়ে এসে ঘর সাজাচ্ছে। প্রকাশক তাই দেখছে যে, যে কোনো বই কেবলমাত্র লাইব্রেরীর কৃপায় প্রথম সংস্করণের গিরি লঙ্ঘন কোরছে অতি [illegible] যারা কোনোদিন পুস্তক প্রকাশনা কি বস্তু জানতো না তারা আজ ঘর ভাড়া নিচ্ছে কিতাবপট্টিতে। যারা কোনোদিন নিজের কলমে একখানা পোস্টকার্ডও পুরো লেখেনি তারাও নাম লেখাচ্ছে 'রাইটার্স ক্লাবে'।

লাইব্রেরীর পরেই বিয়েবাড়ি। নতুন বই, নতুন বউ-এর হাতে তুলে দেওয়ার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, উন্নতরুচি এবং অর্থ একসঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব দেখে, লোকে বউভাতকে বইভাত জ্ঞান কোরে কৃতার্থ। বিয়ের বাজার কোরতে আজ তাই বইয়ের বাজারেও একবার যেতে হয়। আর যেতে হয় বোলেই প্রকাশক বিয়ের তারিখ বুঝে বই ছাড়ছে, নতুন বইকে নতুন বউ-এর মতই সাজিয়ে বার কোরছে এবং লেখককে বই-এর বিষয় যাইহোক বই-এর নাম প্রিয়াদের পছন্দসই দিতে বাধ্য করাচ্ছে। চকচক মলাট, ঝকঝকে ছাপা, বিয়ের মাসে, বই-এর বাজারে আর মাছের অথবা মিষ্টির বাজারে তফাত নেই আর। লগন্‌শা সর্বত্র। এই বউভাত উপলক্ষ্যে একই বই-এর ভাগ্যে কখনও কখনও বারবার ছিঁড়ছে বইভাতের শিকে। এমন কি কোনো কোনো বিয়েবাড়িতে ঢোকবার মুখেই নোটিশ : অমুক বই এতগুলি পাওয়া গেছে ; দয়া কোরে আর কেউ বই দেবেন না। নতুন বউ-এর বাক্সর মধ্যে নতুন বই প্যাক হোয়ে চোলে যায় শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বহুদিন বাক্সবন্দী থাকে, কখনও কখনও পাড়াপড়শীর হাতে উধাও হয়। প্রায়ই পড়া হয় না। পড়া হোলেও, একই বই এতো বেশী বউভাতে পড়ে যে, ভালো বই পাতে পড়ার অযোগ্য বিবেচিত হয় প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। অন্যদিকে লাইব্রেরীতেও কখনও কখনও টাকা পর্যাপ্ত এবং বাঙলা বই অপর্যাপ্ত হওয়ায় একই বই তিনচারখানা কোরে কিনে উদ্বৃত্ত অর্থ অপচয় হয়। ফলে, বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়ে কিন্তু পাঠক বাড়েনা সেই হারে। বিশ্বের বইয়ের জগতে এমন বিস্ময়কর দুর্ঘটনা বাঙলা বই-ই ঘটাবার কারণ হোলো।

কিন্তু এতে আমার আপত্তি খুব সোচ্চার নয়। নয় তার কারণ বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়াই বাঙালী লেখকদের এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন। 'কল্লোল' পত্রিকার অকালে লেখকমাত্রই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নির্ভর কোরতে বাধ্য হোতেন লেখা ছাড়া অন্য যা কিছুর ওপরই। এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ প্রমাণ হোয়ে

গেছে যে, নেশার দিন চলে গেছে, তার বদলে এসেছে পেশার দিন। যে খেলায় বড় হোতে চায় তাকে খেলতে হবে সারাদিন ; যে লেখায় বড় হোতে চায় তাকে লেখা নিয়েই থাকতে হবে কেবল ; তাই লেখা যদি বাঙালী লেখকদের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাতে পারে, তা সে লাইব্রেরীই হোক আর বিয়েবাড়ির কল্যাণেই হোক তাকে সানন্দে স্বাগত জানাতে আমার অকুণ্ঠ উৎসাহ।

নিরুৎসাহ বোধ কোরছি আমি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। নিরতিশয় অবসাদ আচ্ছন্ন কোরেছে আমার মন সম্প্রতি। নিরুদ্বেগ না থাকবার কারণ ঘোটে গেছে অন্যত্র। তীর এসেছে অন্যদিক থেকে। লেখার জন্যে টাকা পাবে লেখক, যথেষ্ট টাকা পাবে এতে কার আপত্তি টিঁকবে? বরং তাই-তো হওয়া উচিত। সেটাই তো সঙ্গত। সেই তো শোভন। সেই হচ্ছে সমীচীন। কিন্তু লেখার জন্য টাকা এবং কেবল টাকার জন্যই লেখা—এ দুই কোন কালেই এক নয় ; পৃথিবী জুড়েই লেখকের উপন্যাস সিনেমা হোয়েছে এবং লেখক তার জন্যে পেয়েছে পারিশ্রমিক। এ দেশেও তার ব্যত্যয় হবে কেন? সে রকম উপন্যাস লেখা হোয়েছে বোলেই সিনেমা সম্ভব হোয়েছে এতকাল। কিন্তু উপন্যাসের জন্যে সিনেমা আর সিনেমার জন্যেই শুধু উপন্যাস রচনা কি এক? না। সিনেমার লেখক আর সাহিত্যের লেখক কোনোদিনও এক ছিলো না। এক হয়নি। আজ কিন্তু তারা এক নয় শুধু, একাকার হোতে বোসেছে! সিনেমার জন্যে নয়, সিনেমার কাগজের জন্য।

সিনেমার কাগজই আজ বহুবিক্রীত বাঙলা কাগজ। সাহিত্যকেও সে আর অবিকৃত থাকতে দিতে রাজী নয়। সে জানে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। টাকা ছড়ালে লেখকেরও। বিশ পাতার যে কোনও রচনাকেই তাই উপন্যাস বোলে চালাতে দিতে আপত্তি আছে এমন লেখকের সংখ্যা খুব কম। যে দু-একজনের মুখে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়, তৎক্ষণাৎ তাকেও মোটা টাকার মরীচিকায় নিয়ে গিয়ে মজাতে মুহূর্তমাত্র। এককালে শুধু লেখারই মুখবন্ধের প্রয়োজন হোতো ; এখন লেখকেরও মুখবন্ধের প্রয়োজন হোচ্ছে। লেখার মুখবন্ধ রচনা করেন নিজেই। বইয়ের গোড়াতে লিখে দেওয়ার প্রয়োজন ঘোটতো আগাগোড়া বইয়ের দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে প্রস্তুত করবার কারণেই। এখন লেখকের মুখ বন্ধ করে সিনেমা কাগজের মালিকরা টাকা দিয়ে। যে লেখকের বাজার আছে, বাজারে সে যাতে সিনেমার কাগজে লেখার বিরুদ্ধে একটি আওয়াজ না তুলতে পারে সেই কারণেই তার চোখের ওপর চলে এই

কালোটাকার কুচকাওয়াজ। তারপর এক সময়ে তার আর ট্যাঁ ফুঁ শোনেন না। বরং সে তখন বোলে বেড়ায়, সাহিত্যের কাগজ আমাকে কি দেয় এমন ? তারচেয়ে সিনেমার কাগজ আমাকে ঢের বেশী দেয়। এই দেওয়ার-নেওয়ার রাস্তাতেই সিনেমার কাগজের প্রেমে সাহিত্যের ইন্দ্রপতন আজ আর বিরল নয়, হামেশাই ঘোটছে।

এর জন্যে সিনেমার কাগজের মালিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে চাইবেই তার কাগজেই বিক্রি বাড়ুক এবং বাড়াবার জন্যে যদি শুধু হিরোইনের সায়া দেখিয়ে না হয় তাহোলে সাহিত্যের যাঁরা মেসায়া বর্তমানে তাঁদেরও ডাক পাড়ো। মনোহারিণীদের ছবির সঙ্গেই তিনখানা উপন্যাস ছাপো। যাতে লেখা যায় এ কথা যে, এই উপন্যাসগুলি বই হোয়ে বেরুলে তার প্রত্যেকটার দাম যা হবে তার চেয়ে অনেক কমে সবকটি উপন্যাস প্লাস হিরো-হিরোইনের চুলের বিন্যাস এই একখানা কাগজেই মাত্র পাবেন। অতএব……!

দোষ সেই লেখকের যিনি নিজেকে বিক্রি কোরছেন এই বিকৃতির পায়ে। শুধু টাকার জন্যে লিখলেও, বলার ছিলো না, যদি সেগুলি উপন্যাস হোতো বা উপন্যাস হবার এতোটুকু চেষ্টা থাকতো সেগুলির। তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রচনা দেবার কারণেই লেখকেরা ঘৃণার পাত্র, কেবল করুণার পাত্র নয় আর। শুধু তাও নয়, এতে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠকছেন লেখকরা—কারণ, একখানা উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সে লেখা অনেক পাঠক পাঠিকাই বই হোয়ে বেরুলে একসঙ্গে পড়বার অপেক্ষায় থাকেন। তাতেই মাসিকে বেরুতে বেরুতে যদি কানাকানি হোতে থাকে যে লেখাটি ভালো হোচ্ছে তাহোলে বই হোয়ে বেরুলে তার বাজার আছেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সিনেমার কাগজে একসঙ্গে একসংখ্যায় পুরো বইটি বেরুবার ফলে সিনেমার কাগজের বিপুল পাঠিকা সেটি পড়ে ফেলেছে এবং বই হোয়ে বেরুবার পর লাইব্রেরীকে বাধা দিচ্ছে বই কেনায় উৎসাহিত হোতে। কিন্তু আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক এতো দূর চিন্তা কোরতে পারলে ল্যাঙটপরা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ কোরতে পারতো না এসব কাগজে। নগদ বিদায়ের ব্যাপারে বাঙালীতে আর কাঙালীতে আজ তফাৎ কোথায় ? কাঙালী বিদায়ের অপর নামই তো আজ বাঙালী (লেখক থেকে সব) বিদায়।

আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক আর সৎ থাকছে না। বাঙালী প্রকাশক আর সৎ নেই। এই অসৎ লেখক-প্রকাশকদের দলকে সায়েস্তা করবার জন্তেই

দেশে-দেশে কালে-কালে প্রয়োজন সৎ সমালোচকের। কিন্তু আজ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যেমন নেতা নেই একজনও; আছে অভিনেতা, তেমনই আজকে এদেশে সমালোচনা হোচ্ছে আসলে সেই বস্তু; শিবরাম চক্রবর্তীর উক্তিতে, 'যার মধ্যে আলোর ভাগ অল্প, চোনার ভাগ বেশী।' সমালোচনার নামে এখন দেশের এবং দলের হোলে তার জয়গান, না হোলে তার সম্বন্ধে হয় কটূক্তি—নয় সাহিত্য-সমালোচনা যা হয় তা আরও ভয়াবহ। কোনো কোনো লেখক নিজেই নিজের সমালোচনার নামে নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসা লিখে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়েছে—এর নজীর কিতাবপট্টিতে এমন কেউ নেই যার অজানা।

সৎ সমালোচক যদি বা কেউ থাকেন, তিনি সমালোচনার কালে সততা অবলম্বন কোরলে এদেশের কাগজে বেশীদিন আর থাকেন না। সৎ সমালোচক কাকে বলে, সেটা এখানে জনান্তিকে বোলে রাখা দরকার। সমালোচক নামে বাঙলাদেশে একদল আছেন যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার অনাবশ্যক দায় এঁরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ন্যস্ত কোরেছেন! এঁরা সমালোচক নন, এঁরা আসলে সাহিত্যের শনি। এঁদের মাথায় সরস্বতীর অভিশাপের অশনিপাত আসন্ন হোয়ে এসেছে। সমালোচনার ধর্ম হোচ্ছে সাহিত্য থেকে মন্দটুকুকে ছেঁকে, ভালোকে আলোয় বেরুবার পথ কোরে দিয়ে সত্যিকারের সৎ লেখা দেশব্যাপী আলোচনার জন্যে প্রস্তুত করা। কোনো বই অশ্লীল হোয়েছে অতএব তা সাহিত্য হয়নি—এ যে বলে, সে সমালোচক নয়। যে সমালোচক, সে বলে, এর বদলে, অমুক বই সাহিত্য হয়নি অতএব অশ্লীল। যোগ্য অথচ অবহেলিত লেখাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য অথচ পুরস্কৃত লেখার মুখোস খুলে ধরাই সমালোচকের ধর্ম। সমালোচকের অপর কোনো ধর্ম নেই। সবই তার পক্ষে পরধর্ম এবং ভয়াবহ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, এই হোচ্ছে সমালোচকের সবল ধর্মবিশ্বাস।

এই সমালোচকের সিংহাসন আজ শূন্য। তার দায় আজ পাঠককে তুলে নিতে হবে নিজের দায় বোলে। সততার শুল্ক সাহিত্যের কাছ থেকে আদায় কোরতে হবে আজ পাঠককে। জাতসাহিত্যের জয়ধ্বজা বহন কোরতে হবে তাকেই। সাহিত্যে শুধু লেখকেরই দেয় নেই; পাঠকেরও আছে। উপাদেয় সাহিত্যের জন্ম-লালন এবং বাড় নির্ভর করে শুধু লেখকের উপর নয়, পাঠকেরও ওপর। 'পথের পাঁচালী'র মত ছবি দেখাবার জন্যে চাই উত্তম প্রদর্শক যেমন, তেমনই দেখবার

জন্যে চাই যথেষ্ট দর্শক। ভালো বই লেখে যে—সেই লেখক। ভালো বই যে লেখায়—সেই হোচ্ছে পাঠক।

আমি জানি, আমি জানি যে, পাঠকমাত্রই প্রশ্ন তুলবেন যে, তাঁরা কি ভাবে এই দুরূহ গুরুভার বহন কোরতে সক্ষম। যদি এই প্রশ্ন একজন পাঠকের মনেও জাগাতে পারি তা হোলেই এ রচনা তখন আর রম্যরচনা নয়; এ রচনার তখনই, তৎক্ষণাৎ জন্ম সার্থক। কারণ আমি জানি, প্রশ্নের অঙ্কুর থেকেই একদিন সমাধানের সজীবতার আবির্ভাব ঘটে উত্তরকালে। যদি কোনো পাঠক বলেন যে তাঁরা দুচারজন অবহিত হোলে বা আপত্তি জানালে শুনছে কে, তাহোলেও আমি বোলবো আমি জানি, আমি জানি এ উক্তি সত্য নয়; আমার বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। দুচারজন লোক ঘরে বোসে একদিন যা ভাবে তাই তো একদিন ঘরে-বাইরে দেশসুদ্ধ লোককে ভাবায়। দুচারজন লোক একদিন শিকল কাটার কথা ভেবেছিলো বলেই আজ ইংরেজ রাজত্বের সূর্য শেষ পর্যন্ত পাটে বোসতে বাধ্য হোলো।

বাঙলা বইএর পাঠক এখনও মূলতঃ লাইব্রেরীর পাঠক। বাংলা বইয়ের বৃহত্তম ক্রেতা আজও লাইব্রেরী। কিন্তু বই বেরুনো মাত্র বিনা বিচারে, নির্বিচারে সমস্ত বই-ই কিনতে যে পারে সেই শুধু লাইব্রেরী,—লাইব্রেরী সম্পর্কে এর চেয়ে বড় লাই-আর কি হোতে পারে। লাইব্রেরীর কাজ কেবল বইএর লিস্ট তৈরী করা নয়; পাঠক তৈরী করাও বটে। এই লাইব্রেরী-সভ্যদের গড়তে হবে পাঠক-চক্র। কেবল মাত্র দর্শনধারী পুস্তককে কেটে কুচি কুচি কোরতে পারে পাঠ-চক্র নয়, সুদর্শন চক্র।

বাঙালী লেখক আজ ললাটনির্ভর। বাঙলা বই মলাটনির্ভর। বাঙলা বইয়ের মলাটে আজ মাদুর, বালি, রাঙতা, মখমল, ছাপাশাড়ির মত ফ্লুরেসেণ্ট প্রিণ্টিংএর ছাপ কিছুই বাদ নেই। বরবাদ হোয়ে গেছে শুধু ভেতরের বস্তু। কিন্তু যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয়, তেমনই যার মলাট ঝকঝক করে তাই-ই কিছু বই নয়। অথচ এই মলাটটুকুর জন্যে বইয়ের দাম একটাকা বেশী দিতে হোচ্ছে লাইব্রেরীকে, ছ মাসের আগেই যে মলাট খোসে গিয়ে দপ্তরীর হাতে যার চিরন্তন লাইব্রেরী মোড়ক ফিরে আসছে আবার। এই অতিরিক্ত দাম কেন দেবে লাইব্রেরীর সভ্য, কোনো পাঠক কখনও কি এ প্রশ্ন তুলেছে? না। তোলেনি। তোলেনি, তার কারণ আজকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানাতে বিস্মৃত হোয়েই জীবিকার প্রতিযোগিতা থেকে বরবাদ হোয়ে যাচ্ছে যে সেই বাঙালী। সাধক-কবি

রামপ্রসাদ গান বেঁধেছিলেন : 'আবাদ কোরলে ফলত সোনা'। আজ বাঙালীর দুর্দশা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলে নূতন কোরে গান বাঁধতেন তিনি। 'আবাদ কোরলে ফলতো সোনা', নয়, তিনি এখন গাইতেন; প্রতিবাদ কোরলে ফলতো সোনা।

জীবনের আর আর ক্ষেত্রের সঙ্গে কখনই এক নয় বই। বই-এর জগৎ হোচ্ছে আসলে জীবনের কুরুক্ষেত্র। এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে যোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যের নয়, কর্ণের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় কেবল। এখানে শিখণ্ডীকে খাড়া করা যায় কিন্তু তার দিকে তীর ছোঁড়া যায় না। জীবনের কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথ চালাবার জন্যে শুধু সারথিতে চলে না, তাকেও পার্থসারথি হোতে হয়। তেমনই বই লিখলেই যেমন একজন লেখক নয়, তেমনই বই প্রকাশ করে—মাত্র এই কারণেই একজন প্রকাশক নয়। (ধনী দপ্তরী আর প্রকাশকে কিতাবপট্টিতে আজ তফাত কোথায়? ঠিক এমনই, সব বই রাখে বোলেই তা লাইব্রেরী নয়, বই পড়ে বোলেই একজন পাঠক নয় যেমন।

প্রকাশক হচ্ছে সেই, যে শুধু বই নয়, বই-এর লেখককে প্রকাশ করে। পুস্তক প্রকাশ করা তার একমাত্র করণীয় নয়। পুস্তক-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের রাজপথ প্রশস্ত করা তার আরও বড় কাজ। নবীন লেখক সে নয় যে নতুন লিখতে আরম্ভ কোরেছে। নবীন লেখক সে-ই, যার লেখা নতুন জাতের। লাইব্রেরী নয় তা কিছুতেই, যে বই কিনে তবে পড়ে; লাইব্রেরী হোচ্ছে সেই— যে বই পড়ে তবে কেনে। পাঠক হচ্ছে সেই—যে ভালো বই পাঠ করে এবং মন্দ বই লোপাট কোরতে সাহায্য করে।

এখানে ভালো বই বোলতে অনেকে ধর্মপুস্তক মনে করে, মন্দ বই বোলতে বোঝে গোয়েন্দা-পুস্তক। আমি তা বুঝি না। কারণ এদেশে যত অধর্ম ধর্মপুস্তকের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এত আর কোনো বই-এর বেলায় করে না। বরং আমি যা বুঝি তা হোচ্ছে আধ্যাত্মিক বইও লেখার দোষে অত্যন্ত অপাঠ্য হোতে পারে। আবার গোয়েন্দা-পুস্তকও লেখার গুণে সুন্দর হয়। তাই লাইব্রেরীতে ডিটেকটিভ বই না রাখা অত্যন্ত ডিফেকটিভ নির্বাচন-পদ্ধতি। লাইব্রেরীতে রহস্য-উপন্যাসের সঙ্গেই, একসঙ্গেই যে উপন্যাস জীবন-রহস্যের অতলে ডুব দিতে চায় তাও থাকবে, অর্থাৎ কেনার পর র‍্যাকেই পড়ে থাকবে না। প্রত্যেক সভ্যেরই রহস্য-উপন্যাসের মতই, জীবনরহস্যের অতলে ডুব দেওয়া উপন্যাসও পড়া থাকবে।

বাঙলাদেশের কোনো কাগজেই রিভিউ হয় না, তার কারণ রিভিউ করবার জন্যে সমালোচকের নিজস্ব ভিউ থাকা উচিত। বর্তমানে কারুর যদি সে ভিউ থাকেও ত তার সঙ্গে কাগজের মালিকের ভিউ পয়েণ্ট মিলবে না। কাজেই লাইব্রেরীর পাঠক-চক্রকে নিজেদের মত গড়ে তুলতে হবে, অপরের অভিমত ভিক্ষে করার বদলে। এইখানেই একটা কথা পরিষ্কার কোরে বলা দরকার। বাঙলা ছবি যেমন সুচিত্রা-উত্তম ছাড়া অচল, বাঙালী লেখকদেরও দেখেছি একটি কি দুটি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া গতি নেই। কারণ এখন এমন হোয়েছে যে, এই সাপ্তাহিক এবং মাসিকে লেখা ছাপালে তবেই আপনি লেখক। এখানে লেখা বেরুলে তবেই তার প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে এবং নামকরা প্রকাশক ছাপলে তবেই তা লাইব্রেরী মারফত পাঠকের কাছে পৌঁছুতে পারছে এবং এই সব কাগজে তবেই সমালোচনার নামে যা-তা সার্টিফিকেট ছাপা সম্ভব হোচ্ছে।

এরই বিরুদ্ধে, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাতে হবে পাঠক-চক্রকে। বোলতে হবে ওই একটি কি দুটি যা ছাপে তাই লেখা নয়; বোলতে হবে ঐ সব লেখা নামকরা প্রকাশক বার কোরেছে বোলেই তা বই নয় এবং যেহেতু লাইব্রেরীতে সরকারী সাহায্য যে পরিমাণ নতুন বইয়ের সংখ্যা সে পরিমাণ নয়, সেহেতু বাজারে যে বই বেরুক তা কিনতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নামকরা লেখকের বদনাম করার মত বই বেরুলে তার প্রকাশককে জানাতে হবে; যে কাগজে প্রকাশিত সেখানে চিঠি দিতে হবে। অযোগ্য বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রতি নির্মম পত্রাঘাত কোরতে হবে সমালোচনাকারী কাগজেই। তারই সঙ্গে হঠাৎ এমন কোনো বই যদি হাতে এসে পড়ে যা তথাকথিত খ্যাতনামা লেখকেরই নয়, যা অখ্যাত কাগজে এবং অবজ্ঞাত প্রকাশক কর্তৃক পরিবেশিত যদি তার মধ্যে কোনো বস্তু থাকে তবে তা সর্বসাধারণের গোচরে আনবার জন্যে সক্রিয় হোতে হবে পাঠক-চক্রকে। লাইব্রেরীতে কেনালেই হবে না কেবল, পড়াতে হবে সকলকে। আজকে দিনে নকলের বিরুদ্ধে বাঁচতে হোলে আসলেরই বিজ্ঞাপন দরকার বেশী।

সরকারী পুরস্কার যেমন সাহিত্যিককে উৎসাহ দানের জন্যে, পাঠক-চক্রের প্রয়োজন সাহিত্য-তিরস্কারের জন্যে। সাধু সাহিত্যকে পুরস্কার যেমন কর্তব্য, তেমনই সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের মধ্যে যা অসাধু তাকে সাধুবাদ না দিয়ে তিরস্কার দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য। একই বই, নাম পাল্টে নতুন বই বোলে চালাবার অপচেষ্টা; একই নামে বিভিন্ন বই প্রকাশ করার দারিদ্র্য, বড় গল্পকে

উপন্যাস বলে চালাবার জন্যে পাতার চারপাশে অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়ার ফাঁকি, ভেজাল সংস্করণের ধোঁকাবাজি—এসবেরই বিরুদ্ধে সজাগ হোতে হবে আজ সমালোচকের অভাবে পাঠককেই। সরকারী পুরস্কার দেশের চক্রান্তে, দলের চক্রান্তে, অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হোলে তার বিরুদ্ধেও দ্বিধাহীন প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুলতে হবে।

যদি বলেন যে প্রতিবাদ পত্রস্থ কোরবে কে, তাহোলে বলি, প্রতিবাদ যদি তেমন মোক্ষম হয় তাহোলে পত্রস্থ করবার মত পত্রিকা না থাকলে নতুন পত্রিকার জন্মলাভ হবে। সেদিন দূরে—কিন্তু অনেক দূরে নয়।

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

"এমার্সন বলেন গোলাপবাগান কার ?—আমার ; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করান ; সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমল শোভা কাহারও একার নয়।" কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শক মাত্রেই উপভোগ করতে পারেন। কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় করবেন, জমি কিনবেন, ঘর তুলবেন ; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কারো একার নয়। পাঠক মাত্রেই তার সৌন্দর্য্যরস উপভোগ করতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিস।

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন্ চ'লে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ্ ও ষড়্দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটীস্ প্লেটো ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী। যিনি ধনী তিনি স্ত্রী-পরিবারকে সুখে রাখেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড়জোর আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমীদারী কেনেন, আর পাটা কবুলত লেখেন। তাঁর জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিন্তাজগতের কথা স্বতন্ত্র। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন তা'তে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলেব সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তাঁরা মহাঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।

এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেসমাত্র হচ্ছে। আমাদের মুস্কিল এই যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়্‌তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরানী,—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই। পোষ্ট আফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভার্‌সিটির ছাপটাকেই সার বুঝেচেন। যা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়্‌ছে।

আমেরিকায় ৪৮টী ষ্টেট্ আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একটি বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট্ ইউনিভার্‌সিটিও আছে। জাপানেও তাই,—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে মেলে, ঐ সব দেশে তেম্‌নি সৎপুস্তকরাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তি হচ্ছে। সকলেই তা বিনামাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় কর্‌তে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন—দরিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের সূচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই সূচনার প্রধান লক্ষণ। ঐ সব দেশে জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয় নি। পরীক্ষা পাশই আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাষ্ট´ ক্লাস (First class) এম-এ পাশ ক'রেও কেউ রিসার্চের (Research) দিকে ঘেঁসে না। কারণ তা'তে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে উৎসাহ কোথায়? তাই বলি প্রায় কোনো গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল হয় নি এই লেখা পড়ায়; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।

আপনারা কার্নেগীর নাম শুনেচেন। তিনি স্কট্‌লণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিলি কর্‌তেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমেরিকার পিট্‌স্‌-বার্গে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা টাকা দিয়ে একজন নয়—একদল লোক মিলে তাঁর কারখানা কিন্‌লে। তিনি টাকা নিয়ে স্কট্‌লণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর আয় বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে গবর্ণমেন্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই। দেশে

ফিরে এসে তিনি গ্ল্যাসগো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে Workingmen's Institute অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যামন্দির ও গ্রন্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব পাঠাগারে নানারকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়,—মদ নয়; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের পাঠাগারের জন্যে কার্নেগী অনেক বড় সহরে সাড়ে সাত লক্ষ' করে টাকা দিয়েছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। সেসব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা ক'র্‌ছে। যাঁরা মাটির নীচে খনিতে কাজ করে তারাও-কাগজ পড়ে। চাকরাণী, মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বল্লেন—জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সব জায়গায় জ্ঞানস্পৃহা কত বলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়্‌বার ইচ্ছে আছে তার কেন্‌বার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষ বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিন্‌বে, নানা রকম বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। মান্দ্রাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণ স্বরূপ—গণেশ কোম্পানী ও নটেশন্‌ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্‌ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বই-এর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় কর্‌ছেন। কিন্তু তা ত নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে Text book ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়; কিন্তু নটেশন্‌ Text book বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান্‌ না। তাঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান্‌; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রভৃতি নানাপ্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান হন্‌ তা নয়, সৎপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দূর করেন। তাই বলতে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা

যায় "People's Library" প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। বাংলাদেশে "টেক্স্‌ট্ বুক কমিটি"র—অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের উপায় নেই। এখানে রসায়ন-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার জন্যে "ল্যাবোরেটরী" চাই। কিন্তু ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণীবিজ্ঞান" লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাট্‌তি হ'লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন সেখানা 'টেক্স্‌ট্ বুক কমিটি'র (Text Book Commitee) অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টার পূর্ব্ববাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন ; ব্যস্‌, এক নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।

বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যর্ তারকনাথ ও স্যর্ রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। দুটি ল্যাবারেটরীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২০০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী কজন পাই? অনেক সময় কাঁদ্‌তে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফিরছে। তবে কোকিল একবার ডাক্‌লেই যে বসন্ত সমাগত হয় এমন ভাব্‌লে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের Chemical Journal-এ অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ ৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্ম্মানীতে ৫০০০, ইংলণ্ড আমেরিকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত য়ুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন। আর আমরা? এই কবির কথায় বিংশতি কোটি—এখন ত্রিশ কোটি মানুষ, আমরা কি করছি? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্যে টানাটানি করেন; আজ সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল; কিন্তু এক মুর্গী কবার জবাই হয়? অন্ততঃ ত্রিশ কোটির মধ্যে ত্রিশ জন (chemist) রাসায়নিক হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে বিশ্রাম কোথায়? শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হচ্ছেন—

"আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য

চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া—সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেছে! ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্শ্বে দুইটি আল্মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য ?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এ সব পুস্তক কারা লয় ?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিনচারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ ?'

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরূপে ?

আমি—লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়া না দিয়া এ পাড়া হইতে উঠিয়া যায়, তাহাই হইলে বই কি করিয়া পাইবে ?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, "তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? এ যে আমাদের বই ? উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হবে।"

আমি—মনে কর যদি না দেয়!

তাহারা হাসিয়া কহিল, 'সে হইতেই পারে না। বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে—ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।"—

আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু আনা। দেখ্‌বেন মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হ'য়ে যাবে।

জগতে দেখা যায় যাঁরা বিদ্যাভ্যাস প্রকৃত করেছেন তাঁরা অনেকেই Self-taught অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। ডাক্তার জন্‌সনের মত বিদ্বান বিরল। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়্‌তেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায়, রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডিগ্‌বি সাহেবের কাছে ইংরেজী পড়্‌তে আরম্ভ করেন, আর্‌বী পার্শী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজীনবীশরা অবাক্। দেশে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ্‌ হিবার সেই চিঠি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড আমহার্ষ্ট্‌কে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হয়—এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ করে বিশপ্‌ হিবার বলেছিলেন "Real curiosity অর্থাৎ বিস্ময়ের বস্তু।" তাই বলি যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না—নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল Dr. Ray, D. Sc. তবে বুঝতে হয় এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা হচ্ছে। তার পর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা কর্‌লেন, D. Sc. বল্‌লে সেটাত স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ডিগ্রীটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে সুবর্ণ পদক পেয়েছি ব'লে গর্ব্ব করেন; এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তারবাবু ১৮৭২ সালের অর্জ্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপ্‌সন্ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন্ না। আলোচনা না কর্‌লে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকার লোকে এ তা ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কী গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হ'য়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়্‌তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মস্‌গুল্‌ হ'য়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিষ। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন কর্‌তে লোকের যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে—তারই বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাক্‌তে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রয়েছে। আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল। উপন্যাস পাঠের সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট, ডিকেন্স, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তাঁরা উপন্যাস পাঠে গল্পাংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ কর্‌তে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই; যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আজ-কালকার সাময়িক পত্রিকাগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী" অথবা বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনের" মত সাময়িক পত্রিকা আর ত দেখি না। নূতনের মধ্যে এই মাসের "প্রবাসী"তে "মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে Aeroplane বা উড়োজাহাজের ও arctic exploration বা মেরু সন্ধানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল ক'রে এর খোঁজ নেয় না।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" কথাটা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আমি বুঝতে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ল্যাবোরেটারীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্যে ১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন—এদেশে এক-শ' অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'—প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাঁদের ত

আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেজে বার্ষিক দু' হাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হয় তাঁরাই বা কি করেন? বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন করবার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাই না; দু-একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু যারা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত অর্থাৎ যাঁরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন তাঁদের দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে চালান্, দুনিয়ায় আর কোনো দিকে চেয়ে দেখেন্ না। চর্ম্মকারের কাছে যেমন Nothing like leather অর্থাৎ দুনিয়ার চাম্‌ড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেম্‌নি তার Special subject, বিশেষ বিষয়টি—Vibration of the Violin string বেহালার তার অনুরণন বা অন্য কিছু। (সভায় সায়ান্স কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ রমণ উপস্থিত ছিলেন।) আমার এক ছাত্র আছেন; তাঁর খ্যাতি য়ুরোপে পৌঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন D. Sc.। একদিন ছাত্র-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে তাঁকে বল্লাম, "আমার ত বয়স হ'ল। B. C. P. W. অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিকাল আমার মেয়ে, আর ছাত্রেরা আমার ছেলে! এখন বুড়া বয়সে দেখ্‌চি আমার King Lear রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গনেরিল আবার কেউ বা রেগান।" ছাত্র ত শুনে অবাক্—বল্লেন, তারা কে? দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন রসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্যে বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা থেকে ভুগোল নির্ব্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষায় কাজে লাগ্‌বে না, সুতরাং আমাদের দুলাল্‌রা আর ভুগোল পড়্‌বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ (Map) টাঙ্গান রয়েছে; পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম বার্লিন কোথায়? সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইলো। আমার একজন সহাধ্যাপক, তিনি M. Sc-তে Figure of the Earth অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভুগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণ কর্‌তে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর কন্‌স্টান্টিনোপল্ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়াতে লাগ্‌লো। ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভুগোল, প্রাকৃতিক ভুগোল আগে শেখে; পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য

প্রভৃতির কথা জান্‌বার আগ্রহ তাদের খুব। আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোনো খবরই রাখে না।

বিলাতে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ জন কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়্‌তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। আরে পাশ্‌ করলেই মাটি! কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল সৃষ্টি! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম. এস্‌-সি বা বি. এস্‌-সি. "অনার্স"এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, মাসিক ৫০ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০ টাকা রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে 'গোপালভোগ' 'ক্ষীরভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজকার করে। এ বিষয় আর কত বল্‌বো! এখন অর্থাগমের নূতন পথ খুল্‌তে হবে, শুধু পাশ করলে চল্‌বে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫ টাকা পেতেন তিনি এখন ১০০০ টাকা পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। 'Knowledge is power', "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" শুধু মুখে ব'ল্‌লে কি চলে? বিদ্যার জোরে য়ুরোপ এত করলে; আমরা কি পাশকরা ছাড়া কিছুই করতে পারি না? লেখা পড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারি না? যদি এম্‌নি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার করতে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ কোথায়? কলিকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় অর্দ্ধেক অ-বাঙ্গালী (non-Bengalee)—অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়—মাড়বারী—ভাটিয়া—দিল্লিওয়ালা—হিন্দুস্থানী—ওড়িয়া—চীনে প্রভৃতি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। ব্যবসা বল—বাণিজ্য বল—যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে আছি—আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে ক্লিষ্টদেহে দিন কাটাচ্ছি।

বড়োদা লাইব্রেরী

জ্ঞানপিপাসু

আমরা সমগ্র ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা যে সকল অধিকার ও সুখসুবিধার জন্য রাজদরবারে বৎসরের পর বৎসর আবেদন করিতেছি, সেই সমস্ত অধিকার ও সুখসুবিধা বড়োদার প্রজারা বিনা আবেদনে তাহাদের নিজেদের রাজার নিকট হইতে ক্রমশঃ একটির পর একটি লাভ করিতেছে। "রাজা" শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রজারঞ্জক ; গায়কোয়াড়ের রাজা নাম অন্বর্থ হইয়াছে।

মানুষের সব চেয়ে বড় অধিকার জ্ঞানলাভ ; জ্ঞানেই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে ; জ্ঞানেই মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। জ্ঞান আপামরসাধারণ সকলের সম্পত্তি। এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে আমরা এতদিন নিজেদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলাম—ব্রাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে অব্রাহ্মণের জ্ঞানের অধিকার নানা বাধায় খণ্ডিত ও খর্ব্ব ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সাম্যবাদী পাশ্চাত্য জাতির উপর আমাদের রাষ্ট্রশাসনের ভার গিয়া পড়িল। রাষ্ট্রশাসনে সুবিধা হইবে বলিয়া এবং তদানীন্তন কালের কতিপয় সজ্জন রাজপুরুষের চেষ্টায় ভারতে অবাধ শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই পুণ্যকর্ম্ম জাতীয়কলঙ্কমোচন প্রয়াসী দুইজন ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়া জনহিতের কারণ হইতে পারিয়াছে—সেই দুই মহাপুরুষ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। মহানদীর যাত্রা পথে যেমন বহু উপনদীর ক্ষীণজলধারা সম্মিলিত হইয়া মহানদীর বেগ ও প্রসার বর্দ্ধিত করে তেমনি কালে কালে ও দেশে দেশে বহু সজ্জন মনীষী এই জ্ঞানবিস্তারব্রতের উদ্‌যাপন বিষয়ের সহায় হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোখলের প্রস্তাবিত সার্ব্বজনীন অবশ্যশিক্ষা সম্বন্ধে যে আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন হইয়া আছে, যাহার জন্য দেশের হিতকামী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, সেই অবশ্য শিক্ষার বিধি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বড়োদা রাজ্যে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা হইতে মুক্ত ও উদ্ধার করিতে যত্নপর হইয়াছে।

মহারাজ গায়কোয়াড় কেবলমাত্র অবশ্যশিক্ষার বিধান করিয়াই শান্ত থাকেন নাই। ক্ষুধা জাগাইয়া খাদ্যেরও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করিতেছেন। জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাজারাজড়ারা বিলাতভ্রমণে যান ঘরের পয়সা পরকে দিয়া একটু ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি লুটিতে। মহারাজা গায়কোয়াড় য়ুরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া প্রজাহিতের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে লাইব্রেরী যে কিরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের কেন্দ্র তাহাই দেখিয়া গায়কোয়াড়ের ইচ্ছা হয় যে তিনিও নিজের রাজ্যে এই সুব্যবস্থা করিবেন। স্কুল, লাইব্রেরী, ম্যুজিয়াম—সমস্তই পরস্পরসাপেক্ষ, সকল-গুলি না থাকিলে কোনোটিই সম্পূর্ণ হয় না। এই বোধ ভারতবর্ষে প্রথমে মহা-রাজের মনে জাগিয়াছে।

'হুজুর'-হুকুম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বড়োদার শিক্ষাবিভাগ বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকায় গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও সংরক্ষণের আয়োজন আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে একশত আন্দাজ পল্লী লাইব্রেরী পরস্পর বিযুক্তভাবে গ্রামে গ্রামে ছড়ানো ছিল—তাহাকে মিত্রমণ্ডল বলিত। মিত্রমণ্ডল লাইব্রেরী সরকারী সাহায্যেই চলিত। যে গ্রাম বৎসরে ২৪ টাকা চাঁদা তুলিতে পারিত সেই গ্রাম বৎসরে ২৪ টাকা সরকারী সাহায্য পাইত এবং লাইব্রেরীর স্থায়ী তহবিলের জন্য ২৫ টাকা এককালীন চাঁদা তুলিতে পারিলে সরকার হইতে ২৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইত। গত বৎসরের শেষে বড়োদার রাজ্যে এইরূপ ২০০টি মিত্রমণ্ডল ছিল।

এই বীজটিকে দেশব্যাপী ফসলে পরিণত করিবার জন্য মহারাজা আমেরিকা হইতে একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বর্ডেনকে নিযুক্ত করেন। বর্ডেন বড়োদায় আসিয়া দেখিলেন যে বড়োদা শহরেই কতকগুলি বেশ বড় লাইব্রেরী রহিয়াছে। মহারাজার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের লাইব্রেরীতে ২১০০০ বাছা বাছা বহুমূল্য পুস্তক আছে। শ্রীসয়াজী লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ১৬০০০; ইহা মহারাজার ভ্রাতা শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গায়কোয়াড়ের সম্পত্তি; তিনি লোকহিতের জন্য ইহা সাধারণের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন; এই লাইব্রেরী প্রাচ্য পুস্তকের সংগ্রহের জন্য খ্যাত। তার পর বড়োদা কলেজ লাইব্রেরী। ইহা ছাড়া বিদ্যাধিকারী, দেওয়ান, কৃষি-অধ্যক্ষ, পূর্ত্তপতি, সামরিক বিভাগ ও ম্যুজিয়ম প্রভৃতির কার্য্যালয় সংলগ্ন লাইব্রেরী আছে। পর্দ্দা পাঠাগারের পুস্তকসংগ্রহও মন্দ নয়। বিঠল মন্দিরে প্রায় ২০০০ বই ও পুঁথি আছে। এই সমস্ত লাইব্রেরীর মোট পুস্তক সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার; ইহা ভিন্ন সরকারী লাইব্রেরীতে ১০ হাজার বই আছে।

বড়োদা রাজ্যে পঞ্চায়েৎ, ম্যুনিসিপালিটি ও সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত আরো অনেক লাইব্রেরী আছে। বড়োদা জেলায় ১৪টি লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা

১৪১৩৯। কড়ি জেলায় ১১টি লাইব্রেরী ও ৬৭৭০ পুস্তক। নওসারি জেলায় ৯ লাইব্রেরী, ১২৬৬৮ পুস্তক। আমরেলি জেলায় ৬ লাইব্রেরী ৬০১৮ পুস্তক। মোট ৪০টি লাইব্রেরীতে প্রায় ৪০ হাজার বই। ইহা ছাড়া খুচরা ১৯১টি লাইব্রেরীতে মোট ২৫ হাজার পুস্তক সংগৃহীত আছে। সর্ব্বমোট ২৪১টি লাইব্রেরীতে ২ লক্ষ পুস্তকের সংগ্রহ বড় সামান্য সংগ্রহ নহে।

বর্ডেন সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রস্তাব করিলেন যে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের লাইব্রেরীটিকে কেন্দ্র লাইব্রেরী করিয়া অন্যান্য লাইব্রেরীকে উহারই শাখা করিতে হইবে। কেন্দ্র লাইব্রেরীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী থাকিবে—তাহার ঘরে ঘরে পুস্তকাগার—পাঠাগার, বেক্ষণাগার, পর্দ্দা পাঠাগার, শিশু পাঠাগার, বক্তৃতা কক্ষ, লাইব্রেরী স্কুল ও কার্য্যনির্ব্বাহক আপিস থাকিবে। ইহাতে বেখরচায় সাধারণের পাঠাধিকার থাকিবে; এবং সরকারী বা সরকার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যেসব বহুমূল্য ঐতিহাসিক দলিলদস্তাবেজ আছে সে সমস্ত এই গৃহেই সংগৃহীত থাকিবে। এই কেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে নূতন পুরাতন পুস্তক অন্যান্য লাইব্রেরীতে যোগান হইবে এবং এই লাইব্রেরী হইতে চলন্ত লাইব্রেরীর গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরাইয়া আনা হইবে।

কেন্দ্র লাইব্রেরীর কর্ম্ম হইবে—(১) বড়োদা শহরে একটি সুপুষ্ট ও হাল ফ্যাশান দুরুস্ত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা (২) লাইব্রেরী স্কুল করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনার আর্ট শিখানো। (৩) সাময়িক পত্র সমূহ হইতে বিশেষ বিশেষ সংবাদ ও তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তত্ত্বমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা। (৪) গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের মধ্যে লাইব্রেরী স্থাপনের উপকারিতার বোধ জন্মানো। এই সমস্ত কাজে দশ বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকা লাগাইতে হইবে।

মহারাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কেন্দ্র লাইব্রেরীর জন্য কলাভবন ও লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের সম্মুখে ৩।৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতী-ভবন—আকারে ও গুণে—হইবে। এই লাইব্রেরীর ঘরে সময়ে সময়ে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, বেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা বিবিধ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকেরাও যাহাতে বঞ্চিত না হন তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। আমরা যেখানে যে কাজ করি শুধু পুরুষদিগকেই মনে রাখিয়া, স্ত্রীলোকের যে সমাজে অধিকার তুল্য, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। কলিকাতায় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে স্ত্রীলোকের জন্য কোনো ব্যবস্থাই নাই, ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। শিশু-

দিগেরও পাঠের ক্ষুধা অসাধারণ, জানিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে আমরা স্কুলরূপ জেলখানায় বেত্রহস্ত মাষ্টার ওয়ার্ডারের জিম্মায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত, তাহাদের জন্য আর কোনো ব্যবস্থার আবশ্যকতা আমরা মনেও করি না। বড়োদার লাইব্রেরীতে শিশুদের জন্যও ব্যবস্থা থাকিবে, সমাজের কোনো অংশকেই ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই।

এই লাইব্রেরীতে গবেষণাগার ও বেক্ষণাগার প্রভৃতিও থাকিবে এবং বিশেষজ্ঞ ছাত্রগণ সেখানে নির্জনে নির্বিঘ্নে সকল রকম সুবিধা পাইবেন এমন ব্যবস্থাও হইবে।

বর্তমানে ২৫০০০ বই লইয়া এই লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। এ বৎসর পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১৩০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৫০০ টাকায় সাময়িক পত্র কেনা হইবে। কি মাসেই নূতন বই কেনা হইতেছে।

গত মার্চ মাস হইতে লাইব্রেরী স্কুল খোলা হইয়াছে। ৭ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী সরকারী বৃত্তি লইয়া শিক্ষা পাইতেছেন। ইঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী কর্ম্মচারী রূপে গণ্য হইবেন। ছাত্রদের মধ্যে একজন এম. এ., তিনজন বি এ। ছাত্রীদের মধ্যে একজন হিন্দু, দুজন খৃষ্টপন্থী।

গ্রাম্য লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারী হুকুম হইয়াছে যে—কোনো গ্রাম বাৎসরিক ৫০ টাকার অধিক চাঁদা তুলিতে পারিলে প্রান্তপঞ্চায়েত ও কেন্দ্র লাইব্রেরী প্রত্যেকে সমপরিমাণ চাঁদা দিবে; কোনো গ্রাম এককালীন ২৫ টাকা তুলিতে পারিলে কেন্দ্র লাইব্রেরী ১০০ টাকা মূল্যের দেশভাষার পুস্তক কিনিয়া দিবে।

যে শহরের জনসংখ্যা ৪০০০ বা ততোধিক, সেই শহর বাৎসরিক ৩০০ টাকার সংস্থান করিলে শহরের ম্যুনিসিপালিটি, প্রান্তপঞ্চায়েৎ ও কেন্দ্র লাইব্রেরী সম পরিমাণ টাকা দিবে। শহরের লাইব্রেরী ৭০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাইতে পারিবে, তদূর্দ্ধ নহে।

লাইব্রেরী মন্দিরের জন্য যত টাকার প্রয়োজন তাহার তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা দিলে বাকি টাকা প্রান্তপঞ্চায়েৎ ও কেন্দ্র লাইব্রেরী দিবে।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সকল লাইব্রেরী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের অধিগম্য হইবে।

কেন্দ্র লাইব্রেরী মধ্যে মধ্যে বাছা বাছা বই দিয়া একটি চলন্ত লাইব্রেরী সাজাইয়া উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে পাঠাইবে; এবং সেইসব বই

গ্রামবাসীরা পড়িয়া শেষ করিলে সে লাইব্রেরী গ্রামান্তরে চলিয়া যাইবে এবং আর এক নূতন লাইব্রেরী সে গ্রামে আসিবে। এইরূপে গ্রামে বসিয়া কেন্দ্র লাইব্রেরীর সমস্ত নূতন জ্ঞান সম্পদ ভোগ করিবার সুবিধা গ্রামবাসীরও ঘটিবে।

পাঁচ ছয় মাস পর্যন্ত কেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে পাঠকদিগকে পুস্তক বিলির সংখ্যা ছিল দৈনিক ২০ হইতে ৩৬ খানি। গত সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছে ১৫৩ খানি; এক রবিবারে হইয়াছিল ২৮৭ খানি। অক্টোবরে যে দিন সবচেয়ে কম বিলি সেদিন ১৪০, এবং সবচেয়ে বেশি বিলি ৩০৫, সমস্ত মাসে বিলি ৪৪৭৫। নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; সেপ্টেম্বর মাসে নূতন পাঠক হইয়াছিল ৩২৫ জন; অক্টোবরে হইয়াছে ২৪৬ জন; সর্ব্বমোট পাঠক ১৮৩১ জন।

গ্রাম্য ও চলন্ত লাইব্রেরীর চাহিদাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

জনবন্ধু গায়কোয়াড় যে আদর্শ আমাদের সমক্ষে স্থাপন করিতেছেন এই আদর্শানুযায়ী সুখসুবিধা আমরা আমাদের ব্রিটিশ রাজসরকারের নিকট দাবী করিতেছি--এ দাবী গ্রাহ্য হইবে কিনা ভগবান জানেন। ইংরেজ রাজসরকার আমাদের এই অভাব মোচন করুন আর না করুন, আমরা নিজেরা যতটা পারি ততটা আমাদের করিয়া তোলা উচিত। ম্যুনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন; এই সকল প্রতিষ্ঠান ও আমাদের দেশের বড় বড় রাজা মহারাজা জমিদারেরা যদি এই আদর্শে কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল করা হয়। প্রজার প্রদত্ত অর্থ লইয়া কেবল মোটর গাড়ী হাঁকাইয়া অপব্যয় করিবার অধিকার জমিদারদিগের নাই। তাঁহারা ন্যায়ত ধর্ম্মত প্রজাহিত করিতে বাধ্য। সব চেয়ে দায়িত্ব বেশি ইংরেজ রাজ-সরকারের। বড়োদার শুভানুষ্ঠান আমাদের রাজসরকার, দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার ও জনসাধারণের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলে গায়কোয়াড়ের চেষ্টা সার্থক ও দেশ ধন্য হইবে।

শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগার

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী স্থাপন করা আজকাল অনেকটা ফ্যাশানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-গ্রামে বা যে-পাড়ায় দু'চার জন উৎসাহী লোক আছেন, সেখানে সখের থিয়েটার, বারইয়ারি বা ব্রীজ্ ক্লাবের মত লাইব্রেরীরও একটা থাকা চাই। জন-শিক্ষার বিস্তারকল্পে লাইব্রেরীর সংখ্যা যত বাড়ে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার মূলে এ উদ্দেশ্যটি আদৌ থাকে না; হাল্কা নাটক-নভেল প্রভৃতি পাঠে যাহাতে অলস অবসরটুকু আরামে কাটানো যায়, প্রায়শঃ সেই উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ পল্লী-গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। আমেরিকা ও য়ুরোপের অনুসরণে সম্প্রতি আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার-আন্দোলন সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও গ্রন্থাগারকে জন-শিক্ষার বাহন বলিয়া ভাবিতে শিখেন নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদান কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেই গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাঁহারা দায়মুক্ত হইলেন। যাঁহারা একটু বেশী উৎসাহী, তাঁহারা বড়জোর একটা বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে কোন বড়লোককে ধরিয়া আনিয়া সভাপতির পদে বসাইয়া দেন; এবং আনুষঙ্গিকভাবে নৃত্য-গীত বা হাসি-তামাসা ও কিঞ্চিৎ 'মিষ্টি মুখের' ব্যবস্থা করিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিজেদের 'জয়-জয়কার' জাহির করেন। সম্বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা জন-শিক্ষার কতটুকু প্রসার হইয়াছে, সে হিসাব তাঁহাদের নিকট কেহ চাহে না এবং উহা প্রদান করাও তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলিকে মুষ্টিমেয় মস্তিষ্কবিলাসীর বাসনা কেন্দ্র ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না, এবং উহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণও বিশেষ কিছু সাধিত হয় না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে জন-শিক্ষা বিস্তারের বহুবিধ ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার সহিত অক্ষরজ্ঞান বা 'কেতাবতী' বিদ্যার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, গ্রন্থপাঠ লব্ধ জ্ঞান ভিন্ন মানুষ যে আদৌ শিক্ষিত হইতে পারে না, এ ধারণা নিতান্তই ভুল। নিরক্ষর জনশ্রেণীর মধ্যেও উচ্চভাব বা চিন্তার বিকাশ আমাদের

দেশে কোন দিনই অপ্রতুল ছিল না। বাংলার আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বহু জ্ঞানী, ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও বাংলার নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক রুচিসম্মত ভব্যতাবোধ যথেষ্ট না থাকিলেও অসভ্য তাহাদিগকে কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। বাংলায় নিরক্ষরতার পরিমাণ শতকরা যতই হউক না কেন, কাণ্ড-জ্ঞানবর্জ্জিত গুর্খা বা হিংস্রপ্রকৃতি আফ্রিদির মত লোক, বাংলার অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারকরা একজনও আছে কি না সন্দেহ। আজ সাম্প্রদায়িক কলহের বিষে বাংলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাই বাংলায় অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরোচিত উৎপীড়নের নিত্যাভিনয় দেখিতে পাইতেছি,—শিক্ষার অভাবে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি চলিতেছে—কিন্তু পঁচিশ বছর পূর্ব্বেও বাংলার এই পাপের কথা কেহ মনেও ধারণা করিতে পারে নাই। পরস্পরের মাথায় লাঠি মারিতে, একজনের ঘরে আগুন দিতে, অসহায়া নারীর উপর অত্যাচার করিতে, তখন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অন্তর কাঁপিয়া উঠিত। যে-ধর্ম্মভাব, যে-মনুষ্যত্ব তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল,—মানুষের চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, তাহার বাহন ছিল সে-যুগের বাংলার যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, পাঁচালী, জারি, কীর্ত্তন, গাজীর গীত, আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ ও সিদ্ধসাধকদের গীতাবলী। কাল-প্রবাহে জীবন-সংগ্রামের প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙালীর লোক-শিক্ষা বিস্তারের এই সহজ ও সচ্ছল উপায়গুলি একে একে লোপ পাইতে বসিয়াছে,—সুতরাং লোক-সমাজে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।

সভ্যতার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। দেশ ও কাল ভেদে সভ্যতার রূপ পরিবর্তিত হয়। এক দেশের শিষ্টাচার হয়ত অপর দেশে অভব্য বলিয়া পরিগণিত। শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার শিষ্টসমাজে যে রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, আজিকার শিক্ষিত বাঙালীর নিকট তাহা অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও ঘন ঘন রূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে। বিভিন্ন ভৌগলিক সীমার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্যদেশ ত' দূরের কথা এই ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের বাংলা দেশের কৃষ্টি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষার বিচার করিতে হইবে তাহার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। বাংলার নিরক্ষর সম্প্রদায় বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত নহে; সুতরাং অশিক্ষিত তাহাদিগকে বলা যায় না। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, বাংলার লোক-শিক্ষা বিস্তারের সহায় ছিল, বাংলার লোক-সাহিত্য,—যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি। এই শ্রেণীর সাহিত্য লিপিবদ্ধ বা লিখিত পুস্তকরূপে প্রত্যেকের সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও, শ্রুতির ন্যায় মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র চলাচল করিত। সুখের বিষয়, বাংলার জাতীয় জাগৃতির দিনে আজ আবার শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এই সকল জাতীয় সম্পদের উপর পতিত হইয়াছে। শহরের রঙ্গমঞ্চেও তাই 'রায়বেঁশে' নৃত্যের অভ্যুদয় দেখিতেছি, রেডিও-র সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালীর গৃহে গৃহে আবার পাঁচালী ও কথকতার প্রচার ঘটিতেছে, জাজ্-ব্যাণ্ড হইতে ঢোলসানাই-এর উপর আবার বাঙালীর মমতা-বোধ জাগিতেছে।

জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ভৌগলিক সীমার লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এক দেশের কৃষ্টি ও ভাব-ধারা প্রবল বেগে অপর দেশের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং সভ্যতার মধ্যে সাঙ্কর্য্য দেখা দিতেছে। ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছুই নাই; যুগ যুগ ধরিয়া এই ভাবেই সভ্যতার রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া আসিতেছে। বাহিরের দানে ভিতরের ঐশ্বর্য্য চিরদিনই বাড়িয়া উঠে। আদিম, আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, হুন, আফগান, তাতার সকলেই ভারতের কৃষ্টি-ভাণ্ডারের নূতন নূতন সম্পদ দান করিয়াছে। পাশ্চাত্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে নব-সভ্যতার উদয় হইয়াছে, ভারত ধীরে ধীরে উহাকেও আপন করিয়া লইতেছে। এই নব-সভ্যতা ও শিক্ষা প্রধানতঃ 'অক্ষর-জ্ঞান'- (Literacy) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে 'কেতাবতী' বিদ্যার প্রয়োজন। তাই দেশের সর্ব্বত্র নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বহুদিন পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষা-বিস্তারের একমাত্র কেন্দ্র। এখনও অধিকাংশ লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তারতম্য অনুসারে শিক্ষার লঘুগুরু ভেদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যাঁহাদের আদৌ বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নাই, এরূপ কয়েকজন মনীষীর গভীর জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করায় লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। লোকে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে আরও একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্র আছে,—এই শিক্ষা-কেন্দ্রের নাম গ্রন্থাগার। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারকে 'বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যা দেওয়াও অসমীচীন নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে যে আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়,

যে সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়,—উহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সকলের উপযোগীও নহে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির অনুযায়ী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই,—এবং তথায় উহার প্রবর্ত্তন করা সম্ভবও নহে। উচ্চশিক্ষার প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট সফলকাম হইলেও জনশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা অনেকটা সংকীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় ও তদধীন স্কুল-কলেজসমূহে দিন দিন বেতনের হার যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রগৃহের সন্তানদের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন করা বিলাসিতায় পরিণত হইয়াছে। টেক্সট্ বুক বা পাঠ্যপুস্তক প্রায় প্রতি বৎসরই বদলাইতেছে। বর্ষশেষে নূতন নূতন পুস্তকের ফর্দ দেখিয়া অভিভাবক-গণের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে। 'অন্য পরে কা কথা', অঙ্কের পুস্তকগুলিও প্রতি বৎসর নব নব রূপে দেখা দিতেছে। অথচ উহাদের যে কি পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধন হইতেছে তাহা ত' ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বার-তের বছর পূর্ব্বেও যে বাড়ীতে একখানা যাদব চক্রবর্ত্তীর এরিথ্‌মেটিক্, কে, পি, বসুর এ্যালজেব্রা, গৌরীশঙ্কর দে, বা হল্ এণ্ড ষ্টীভেন্স-এর জিওমেট্রি থাকিত, সে বাড়ীর চার-পাঁচটি ছেলে পর পর উহা পড়িয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হইয়া যাইত। অথচ এখন দেখুন, এ বৎসর গৃহস্থ একটি ছেলের জন্য ২০ টাকা খরচ করিয়া যে পুস্তকরাশি ক্রয় করিলেন, পর বৎসর বা দুই এক বৎসর পরে দ্বিতীয় ছেলেটির জন্য তাহার একখানিও কাজে লাগিল না। শিক্ষার নামে বই-এর যে বিরাট কারবার এক শ্রেণীর লোক ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, তাহা বন্ধ করিবার শক্তি কি শিক্ষা-বিভাগে কাহারও নাই?

প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারের পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি আর একটি প্রধান অন্তরায়। গুণগ্রাহিতার ফলস্বরূপ যে পরীক্ষা পাশের বিধান ও ডিগ্রীর প্রবর্তন হইয়াছিল, উহা এখন বহু কুফল প্রসব করিতেছে। এ যেন 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়'। বিদ্যার্থীর পক্ষে এক একটি পরীক্ষা যেন এক একটা ব্যাধি বিশেষ। এই ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পাঠ্য পুস্তকরূপ তিক্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষা পাশের উদ্বেগ ও আতঙ্কে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যহানি ত' বটেই, শিক্ষারও অর্দ্ধেক আনন্দ উবিয়া যায়। পাঠ্য-তালিকার বাহিরে থাকিয়া যে গ্রন্থ পাঠকের রসানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে টেক্সট্ বুক-এর পর্য্যায়ভুক্ত হইলে উহাই আবার বিদ্যার্থীর মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে। অথচ এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। কারণ, ব্যক্তিগত

প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা—বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সহজ ও সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ আমাদের মতানুযায়ী গঠন করিবার সুবিধাও নাই,—উহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব তৃতীয় পক্ষের হস্তে ন্যস্ত। তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সংস্কার সাধন করিতে তাহারা দিবে কি না তাহাও সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশবাসীর শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতার জন্য আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—শিক্ষার প্রসারের জন্য আমাদিগকে বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বা গ্রন্থাগারের শরণ লইতে হইবে।

গ্রন্থাগারের সহায়তায় জন-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আরম্ভ হয়। তথায় উহার সফলতা দেখিয়া য়ুরোপও ঐ পন্থা অবলম্বন করে। য়ুরোপের মধ্যে আবার সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদা রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। সম্প্রতি ব্রিটিশ-ভারতে এবং অন্য কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিচালনে নূতন প্রণালী অবলম্বনের আবশ্যকতা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন।

অনেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে এই বলিয়া গৌরব করিতে শোনা যায় যে, তাঁহাদের গ্রন্থাগারে দশ হাজার কি বিশ হাজার বই আছে। কিন্তু এই বিপুল গ্রন্থরাশির মধ্যে কতগুলি এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর পুস্তক যে সাধারণ কর্ত্তৃক পঠিত হয় তাহাই বিবেচ্য। পুস্তকের সংখ্যা দ্বারা গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা চলে না। গ্রন্থাগারের উৎকর্ষ নিরূপিত হয় পুস্তক নির্ব্বাচনের দ্বারা এবং পাঠক-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-চর্চার আগ্রহ কতটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা। গ্রন্থমাত্রেই গ্রন্থাগারে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের 'সাধারণ পাঠাগার' নামে পরিচিত গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, বাজারে যে-পুস্তক নূতন বাহির হইল, গ্রন্থাগারের নবক্রীত পুস্তক-তালিকায় তাহার স্থানলাভ ঘটিয়াছে। উহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার কদাচিৎ কেহ করেন কি না তাহাও সন্দেহ।

আদর্শ গ্রন্থাগারে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ থাকা আবশ্যক, যেন কোনও শ্রেণীর জ্ঞান-লিপ্সু বিমুখ হইয়া ফিরিয়া না যান। অকারণ অর্থ ব্যয়ে এক এক শ্রেণীর বহু গ্রন্থ না রাখিয়া উহার মধ্যে যে-গুলি উৎকৃষ্ট, উহাই সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে যিনি গ্রন্থাধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার দায়িত্ব

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই প্রকৃত গ্রন্থাধ্যক্ষ বলিয়া কেহ নাই। পাড়ার রামা শ্যামাকে ধরিয়া পুস্তক আদান-প্রদানের 'অনারারি' কাজ করাইয়া লইতে পারিলেই লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যথেষ্ট কাজ করা হইল। যাঁহারা আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছেন, দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের পুণ্য কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত বিবেচনা করি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাধ্যক্ষ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা গ্রন্থাগারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

কলিকাতার মত বড় সহরে বা তৎসন্নিহিত পল্লী-সমূহ রেডিও, সিনেমা প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনশিক্ষা-বিস্তারের অনেকটা সহায়তা হইতে পারে, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে ইহার অনুরূপ কার্য্য হিসাবে দীপ-চিত্র সহযোগে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা সাধারণ-গ্রন্থাগারেরই করা উচিত। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক পল্লী-গ্রন্থাগারের সহিত এক একটি ছোট-খাট চিত্রশালা খুলিতে পারিলে খুব ভাল হয়। ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহের আবশ্যক নাই, লাইব্রেরীরই একাংশে ইহা অবস্থিত হইতে পারে। এই চিত্রশালায় পল্লীর শিল্পজাত দ্রব্য, দেশ-বিদেশে মনীষীগণের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী, মৃত্তিকা বা প্লাষ্টার নির্ম্মিত নানা দেশীয় জীবজন্তুর মডেল ও স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক প্রাচীর-পট প্রভৃতি রাখিতে হইবে। এই সকল বস্তুর দ্বারা লোকের চিত্ত যতটা আকৃষ্ট হয় ও লোকে যত সহজে এক এক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। আমাদের আরও মনে হয় যে, পল্লী-গ্রন্থাগারে নাটক নভেল প্রভৃতি যথাসম্ভব কম রাখিয়া জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও সাময়িক পত্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। পাঠাগারের পক্ষে সু-সম্পাদিত সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাময়িক পত্রগুলি একাধারে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, অর্থনীতি, রাজনীতি, গল্প-উপন্যাস ও বিবিধ তথ্যের আকর। মানুষের কাল্‌চার বা অনুশীলনকে (?) বাঁচাইয়া রাখিতে সাময়িক পত্রের তুল্য কার্য্যকরী অপর কিছুই নাই।

নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান প্রবর্ত্তনের সুবিধা যদি না-ও ঘটে, তথাপি তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের সুফল হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। গ্রন্থাধ্যক্ষ বা তৎপ্রতিনিধি কোন যোগ্য ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে যদি কোন ভাল ভাল বিষয় তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনান এবং পঠিত বিষয়গুলি সরল ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তবে তাহারা বর্ণজ্ঞানহীন হইয়াও অনেক কিছু শিখিতে পারিবে।

আমাদের দেশের লোক-শিক্ষার প্রাচীন উপায়গুলিকে (অর্থাৎ যাত্রা, কথকতা, পাচালী প্রভৃতি) পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র উহাদের দ্বারা বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন মিটিবে না। যন্ত্র-প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সহিত মিল রাখিয়া আমাদিগকে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন পদ্ধতিকে অবলম্বন করিলে চলিবে না, জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আজ যে-সব বস্তুর নিত্য প্রয়োজন লোক-শিক্ষার তালিকায় তাহাদেরও স্থান থাকা চাই। এক কথায় বর্তমান জগতের সকল আন্দোলন, সকল চিন্তাই যেন আমাদের দেশবাসীর মনের মধ্যে স্থান পায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কেন্দ্র স্বভাবতঃই সংকীর্ণ, উহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য আমাদের থাকে, তারপর শিক্ষার জন্য আমাদিগকে আসিতে হয় এই 'বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যলেয়ে'— গ্রন্থাগারে। তা' সে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক, বা সাধারণ প্রতিষ্ঠানই হউক। জ্ঞানের বিপুলতা ও বৈচিত্রের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের জন্য বিদ্যার্থীকে আর কয়খানিই বা গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়? আর কতটুকুই বা জ্ঞান তাহার দ্বারা অর্জ্জন করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার সূচনা, তাহার পরিপুষ্টি হয় গ্রন্থাগারের বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারে।

আর একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।

সর্ব্বসমেত আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, বোধ হয় হাজারের উপর হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবলমাত্র শিশু, মহিলা ও শ্রমিকদের জন্য বিশিষ্ট কোন গ্রন্থাগার আছে কি না জানি না। আমরা মনে করি যে, প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এইরূপ এক একটি বিভাগ থাকা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা-ক্ষেত্রেও অধিকারী-ভেদ আছে। সকল শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং বিশিষ্ট শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ প্রভৃতি থাকার সার্থকতা আছে। অবশ্য যে সকল নারী উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলা-বিভাগের আবশ্যক নাই; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ অন্তঃপুরিকারাই স্বল্প-শিক্ষিতা। মহিলা ও শিশু-বিভাগের পুস্তক-নির্ব্বাচন বিশেষ বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। শিক্ষাকে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিলাস (Luxury of tne brain) মনে করিলে চলিবে না, উহাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং যাহার দ্বারা আমাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই আমাদিগকে করিতে হইবে।

জাতীয় জীবনের সহিত যে শিক্ষার যোগ নাই, উহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না,—ইহা বিজাতীয় ও ভয়াবহ। এই জাতীয় শিক্ষা প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে পারে শুধু জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মনে কোন মহৎভাব, বড় কল্পনা স্থায়ী হইতে পারে না; সুতরাং জাতিও জাতি হিসাবে বড় হইয়া উঠিতে পারে না। সবল দেহ ও শিক্ষিত জন—ইহাই হইল জাতির প্রধান সম্পদ—জাতীয়তার একমাত্র ভিত্তি। তাই চিন্তাশীল ভারতনেতা স্বর্গত লালা লাজপত রায় বহুস্থানেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, মুক্তিকামী ভারতের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু তিনটি—(১) Milk for the children (শিশুদের জন্য দুধ); (২) Food for the adults (বয়স্কদের জন্য খাদ্য); (৩) Education for all (সকলের জন্য শিক্ষা)।

মুনীন্দ্র দেব রায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আমল হইতে আমাদের কলিকাতা করপোরেশান প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে, এবং সাধারণ পুস্তকাগারের সাহায্য জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। এটা বাংলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাই শুনিয়া ব্যথিত হইলাম—ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে কলিকাতা করপোরেশান সাধারণ পুস্তকাগারে দানের বহর কমাইতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। নাগরিকদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার জন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। সেই জ্ঞানের পথ সঙ্কোচের ব্যবস্থা শুনিলে বস্তুতঃই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

অর্থ নৈতিক অবসন্নতা কেবল বাংলা বা ভারতে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ অবসন্নতা ঘটিয়াছে। সে সব দেশে অন্য বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইতেছে বটে কিন্তু শিক্ষোন্নতি-কল্পে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের উল্লেখ করিতেছি। সেখানে Public Works, Civil Works এবং Relief Administration-এর তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ এবং উন্নতি কল্পে ব্যয়ের বরাদ্দ অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অপরদিকে জ্ঞান-বিস্তারের এই অভিনব যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইতেছে। কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার একটু আভাস দিতেছি। Public Works Administration-এর অধীন লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় জন্য এই বিভাগ হইতে শতকরা ত্রিশ টাকা লাইব্রেরীকে দান স্বরূপ দেওয়া হইতেছে এবং বাকী শতকরা সত্তর টাকা দীর্ঘকালের জন্য অতি সহজ কিস্তিতে লাইব্রেরীকে হাওলাৎ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। Civil Works Administration ৪০ লক্ষ নরনারীকে অন্যূন তিনমাসের জন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য চল্লিশ ক্রোড় ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। বেকারদের মধ্যে অর্দ্ধেক এবং সরকার হইতে আহার্য্য সাহায্য বা dole যাহারা পাইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক লোককে এই সব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেকারদের যুক্তরাজ্যের কর্ম্ম

নিয়োগ (United States Employment) আপিসে নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের মধ্য হইতেই লোক লওয়া হয়। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিছু নির্ম্মাণ কার্য্য থাকিলে তাহাই Civil Works Administration দ্বারা পরিচালিত হয়। গৃহ সংস্কার, গৃহ চিত্রণ, বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ, কাগজের কাজ, ছাদ সংস্কার, আসবাবপত্র মেরামত আর আধুনিক প্রণালীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের আঞ্জাম Civil Works-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লাইব্রেরী বোর্ডকে তাহাদের যে যে কার্য্যের আবশ্যক তাহার একটা ফর্দ্দ (project) Civil Works-এর কর্ত্তাদের দিতে হয়।

আবার Federal Emergency Relief Administration-এর হাত দিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত আরও নানারূপ কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। আশু শিক্ষা সংক্রান্ত ফর্দ্দের মধ্যে ১। পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা উন্নতি সাধন ২। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ক্লাস স্থাপন ৩। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কার্য্যকরী বা vocational শিক্ষার ব্যবস্থা ৪। শ্রমশিল্পের পুনঃ সংস্থান। ৫। বয়স্কদের জন্য সাধারণ ভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত ৬। শিশুদের খেলাধূলার সঙ্গে শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পরিচালক (Commissioner of Education) এসব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণে এই রকম সব কাজের জন্য ঘণ্টা বা দৈনিক হিসাবে সচরাচর যে মজুরী দিয়া থাকেন সেইরূপ জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী (living wage) এই সব কাজের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর দাখিলি ফর্দ্দের (project) জন্য যে যে বিষয়ে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তাহার তালিকার উল্লেখ করিতেছি :—

১। সমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ এবং সুবিধার পরিমাণ বা survey.

২। সকল বয়স্ক লোকের শিক্ষাকল্পে পুস্তক সরবরাহ।

৩। স্থানীয় লাইব্রেরীতে পাঠককে উপদেশ দিবার লোক নিয়োগ।

৪। লোক ধরিয়া ধরিয়া লাইব্রেরীতে পাঠের সুযোগ এবং সুবিধা বুঝাইয়া তাহাদিগকে লাইব্রেরীতে পুস্তক ব্যবহার শিখাইবার উপদেষ্টা নিয়োগ।

৫। পাঠচক্র বা study circle স্থাপন।

৬। জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মীর ব্যবস্থা।

৭। বিশেষভাবে বয়স্ক এবং বেকারদের টানিয়া আনিয়া পুস্তকের সহিত

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়াইবার ব্যবস্থার জন্য লোক নিয়োগ। বেকার বা যাহারা অল্প-স্বল্প কাজ করিয়া কোনও রকমে জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য দীর্ঘকাল লাইব্রেরী খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লাইব্রেরী সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতে করাইয়া লওয়া হইতেছে যেমন গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) নির্ঘণ্ট বা কতকগুলি লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যুক্ত তালিকা প্রস্তুত এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কার্য্য, পুস্তক বাঁধাই, মানচিত্র, সংবাদপত্র এবং মুদ্রিত দ্রব্য সংরক্ষণ, নব প্রণালীতে পুস্তক তালিকা প্রণয়ন, পুরাতন কার্ড পাল্টাইয়া নূতন কার্ড স্থাপন, টাইপের, ফাইলের আসবাব-পত্রের তালিকা, সংগৃহীত পুস্তক নূতন করিয়া সাজাইয়া রাখা, গল্প কথন, ছবি বাঁধাই, তালিকা সংগ্রহ প্রভৃতি। এইসব কাজের প্রস্তাব স্থানীয় সাহায্য সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট পেশ করিতে হয়—প্রস্তাবকালে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন কাজ দোকর না হয় এবং নিত্যনৈমিত্তিক লাইব্রেরীর কাজের যেন ক্ষতি না হয়। এই সব কাজে যে সব লোক নিযুক্ত করা হয় তাহাদের কাজ দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেবল স্থানীয় সাহায্য সমিতির একজন সভ্যের সুপারিশ পত্র দাখিল করিতে হয়। মেয়েদের জন্যও নানারূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে? লাইব্রেরীয়ানের কাজ শিখাইবার জন্য যুক্তরাজ্যের অনেক বিদ্যালয় তো আছেই, তাছাড়া প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় কলেজ মাত্রেই লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করার আবশ্যকতা আছে। সেজন্য লাইব্রেরী অপেক্ষা সেদেশে লাইব্রেরীয়ানের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই সব নূতন ব্যবস্থায় কোনও লাইব্রেরীয়ানই এখন আর বেকার অবস্থায় নাই—লাইব্রেরীর কোনও না কোনও বিভাগে কাজ জুটিয়া গিয়াছে। এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে সকল দিক দিয়া লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে, লাইব্রেরীর প্রসার এবং কার্য্যকারিতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সদাকর্ম্মনিরত লোক পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিবার বেশী সাবকাশ পান না। এখন কাজ কর্ম্ম কমিয়া যাওয়ায় লোকের অবকাশ কাল বাড়িয়া গিয়াছে। এই সুযোগে জনশিক্ষার এবং দেশের লোকেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য শ্রমশিল্পের ও হাতে কলমে কাজ শিক্ষা করিবার নূতন নূতন প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইতেছে, আর তাহার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বহু জ্ঞানবান শিল্পী প্রস্তুত হইতেছে। জগতে অর্থ নৈতিক অবসন্নতা কিছু চিরস্থায়ী হইবে না, যখন ব্যবসা বাণিজ্য মাথা

তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন এইসব বিশেষজ্ঞগণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এবং নব নব আবিষ্কার দ্বারা স্বীয় দেশকে গরীয়ান করিয়া তুলিবে। যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরী-গুলির পাঠক সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইতেছে যে লাইব্রেরীতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না,—লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের পক্ষে চাহিদামত পুস্তক সরবরাহ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানসিক অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার প্রতিকার কল্পে নরনারী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আবার অবসর ও অর্থাভাব চিত্ত-বিনোদনের অন্যন্তোপায় স্বরূপ পুস্তকের দিকে লোককে আকৃষ্ট করে। যাহার চাকুরী যায় সে ভাবে কিসে অন্য কাজ শিখিয়া জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে, যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে, সেজন্য লাইব্রেরীতে পুস্তকের আশ্রয় লয়। সাধারণের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং চিন্তাধারার উন্নত করিবার জন্য পুস্তকাগারের উন্নতিকল্পে অকাতরে দানের সার্থকতা সে দেশের লোক ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। জ্ঞান প্রচারের এই সহজ প্রতিষ্ঠানগুলির তাই এত সমাদর—সেগুলি সৌষ্ঠবশালী এবং সমৃদ্ধ করিবার তার এত প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এখন আমেরিকা যুক্ত-রাজ্য ছাড়িয়া বিলাতের কথা বলি।

এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে বিলাতে লোকের জ্ঞানস্পৃহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা মূল্যবান পুস্তকের অভাব দূরীকরণের সুব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দানবীর কার্ণেগী ট্রাষ্টের সাহায্যে National Central Library-র গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। আমাদের সম্রাট সাম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই গৃহের দ্বারোদঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই National Central Library বিলাতের বহু লাইব্রেরীকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে।

জগতে নানাবিষয়ে পুস্তকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে কোনও লাইব্রেরীর পক্ষে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ সংগ্রহ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের সংখ্যা তিন কোটি বিশ লক্ষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। British Museum জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী; তাহারই পুস্তক সংখ্যা ৪০ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ প্রতি ৮ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল ১ খানি মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ণিংহাম, গ্লাসগো প্রভৃতি সহরে খুব বড় বড় লাইব্রেরী আছে বটে, কিন্তু British Museum-এর পুস্তকের তুলনায় ইহাদের পুস্তক সংগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আর ছোটখাট লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ কমবেশী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ তো

থাকিবেই। পাঠকের পুরা চাহিদা পূরণ করা সব লাইব্রেরীর পক্ষে সম্ভবপরও নয়। তাছাড়া যে সব নূতন পুস্তক প্রতিবর্ষে বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যাও এত বেশী যে তাহার সামান্য ভগ্নাংশের স্থান কয়টা লাইব্রেরীতে দিতে পারে?

লাইব্রেরীগুলির মধ্যে যদি মূল্যবান পুস্তকের লেন দেন চলে তাহা হইলে সব রকমের পাঠকের চাহিবার পূরণ কতকটা সম্ভবপর হয়। একমাত্র সহযোগিতার দ্বারা সব অভাব পূরণ হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডে পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা পুস্তক লেন দেনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। National Central Library-কে কেন্দ্র করিয়া সুষ্ঠুভাবে এই লেন-দেন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই National Central Library-তে এক লক্ষাধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে গ্রন্থপঞ্জী bibliography সংক্রান্ত সংবাদ বিভাগ আছে। আর সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তকের যুক্ত (union list) তালিকা প্রস্তুত করা আছে। তাহার পুস্তকের সংখ্যা দশ লক্ষ। বিলাতে যে সকল লাইব্রেরী আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পুস্তক লেন দেন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় তাহারা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত বা affiliated হয়। যুক্ত তালিকায় এই সব লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তক স্থান পাইয়াছে। এই সব লাইব্রেরী outliers আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ১৩০, আর পুস্তক সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ।

National Central Library-র হাত দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ক (Special) লাইব্রেরীর যত কিছু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ আছে পাঠকদের তাহা সহজলভ্য করা হইয়াছে।

বিলাতে ৩২টি কৌন্টিতে (County) যে সব লাইব্রেরী আছে সেগুলি পাঁচটি কেন্দ্রভুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরে কর্ণওয়াল (Cornwall), পশ্চিমে মিড্‌ল্যাণ্ডস্ (Midlands) দক্ষিণে ওয়েল্‌স্ সমেত পূর্ব্বদিকের কাউন্টিগুলিতে যে ২২২টি লাইব্রেরী আছে সেগুলিকে লইয়াই কেন্দ্রগুলি গঠিত হইয়াছে। পাঁচটি কেন্দ্রের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—Regional Library System—আবার এই পাঁচটি National Central Library-র সহিত সংযুক্ত আছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে যত লোক আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা তিন জন লাইব্রেরী এলাকার বাহিরে বাস করে। তাহাদের নিকটস্থ যে লাইব্রেরী আছে, তাহা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীই হউক, কৌন্টি লাইব্রেরীই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ক লাইব্রেরীই (Special Library) হউক,

সেইখানে লিখিলেই বই যোগান হইয়া থাকে। যদি ঐসব লাইব্রেরীতে কোনও বই না পাওয়া যায় তাহা যত দুষ্প্রাপ্য বই-ই হউক না কেন, National Central Library যেখানে সেই বই আছে তাহা আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। National Central Library-তে প্রত্যহ এইভাবে বাহির হইতে ২০০ হইতে ৪০০ পুস্তক যোগাইবার চাহিদা আসিয়া থাকে। গত বর্ষে ৬১, ৬৩০ খানি পুস্তক এই লেনদেনের সাহায্যে আনাইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ১৩টি বিভিন্ন দেশের ২৯টি লাইব্রেরীর সহিত পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

National Central Library বাহির হইতে পুস্তকের চাহিদা পাইলে প্রথমে দেখেন তাঁহাদের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না; যদি না থাকে যুক্ত পুস্তক তালিকা দেখিয়া আর কোনও লাইব্রেরীতে সেই বই আছে কি না দেখা হয়; যদি তালিকায় না থাকে কোথায় সে বই পাওয়া যাইতে পারে তখন তাহার খোঁজ খবর লওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ক বই আবশ্যক হইলে তৎ তৎ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে Outlier লাইব্রেরীতে চাহিদা পাঠান হয়। এইরূপ ৮০টির উপর বিশেষ বিষয়ক Special Outlier-এর সহিত National Central Library যুক্ত আছে এবং তাহাদের সংগৃহীত পুস্তকের নির্ঘণ্টও পৃথক ভাবে রাখা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিষয়ক (Special) Outlier-এ সাধারণ বিষয়ক Outlier-এ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হইয়া থাকে।

আবার Outlier-এর পুস্তক তালিকায় সে পুস্তক না থাকিলে ৫টি regional bureaux-এ সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হয়। Regional এলাকার ভিতর যে ২২২টি লাইব্রেরী আছে তাহাদের লইয়া একটি যুক্তপুস্তক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের একখণ্ড National Central Library-তে রাখা হইবে, তাহাতে কাজের আরও সুবিধা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের চাহিদা আসিলে সেগুলি সপ্তাহে দুইবার ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লাইব্রেরীতে পাঠান হইয়া থাকে।

বিদেশীয় পুস্তক যাহা বিলাতে পাওয়া যায় না তাহার চাহিদা আসিলে যে দেশ হইতে সেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেই দেশের লাইব্রেরী কেন্দ্রকে সেই বই পাঠাইবার জন্য লেখা হয়। আবার সে সব দেশের চাহিদা আসিলে National Central তাহা যোগাইয়া থাকে।

গুরুতর বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা সম্বন্ধেই এই সব ব্যবস্থা আছে। সস্তা বই বা নাটক নভেল এভাবে যোগান হয় না।

স্কটল্যাণ্ড (Scotland) এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটেও (Irish Free State) regional scheme প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিতেছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য এখন Scottish Central Library এবং Irish Central Library অন্যস্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান বই আনাইয়া দিয়া থাকে। এই দুইটী দেশের Central Library বিলাতের regional bureaux-র মত National Central Library-র সহিত সংযোগ রাখিয়াছ। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বেসরকারী ভাবে regional system প্রচলিত আছে। বেলফাষ্ট্ সাধারণ পাঠাগারের হাত দিয়া National Central Library-র সহিত পুস্তক লেন দেন চলিয়া থাকে।

এই সব পুস্তক যোগানর জন্য বা খবরাখবরের জন্য কোনও খরচা লাগে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকগ্রহীতাকে পুস্তক পাঠান এবং ফেরৎ আনার ডাক খরচা দিতে হয়। বিশেষ National Central Library সম্বন্ধে এতটা বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য হইতেছে—কলিকাতায় ঐ ভাবের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করা। কলিকাতা করপোরেশান যদি একটী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতার সব লাইব্রেরী তাহাতে সংযুক্ত হয় এবং পরস্পর পুস্তক লেন দেনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মূল্যবান পুস্তক ক্রয়ের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। সে টাকায় অন্য বিষয়ে লাইব্রেরীর উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন এখন বিলাতে বোর্ড অফ্ এডুকেশনের সভাপতি। তিনি বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশানের নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বলেন যে, সে দেশে অন্যান্য সকল বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে বটে কিন্তু কেবল পাঠাগারগুলির বরাদ্দ না কমাইয়া বরং স্থানে স্থানে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্যে লাইব্রেরীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে; কলিকাতা করপোরেশানকে আমরা ভারতের আদর্শস্থানীয় দেখিতে পাই। এখানে আদর্শ পাঠাগার যাহাতে পরিচালিত হয় তাহার জন্য বরাদ্দ না কমাইয়া বরং বাড়ানই আবশ্যক। কলিকাতায় যত পাঠাগার আছে সব সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিৎ। পরস্পরের মধ্যে পুস্তক বিনিময় প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছে সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লাইব্রেরীগুলি কেবল বরাদ্দের টাকা —কতকগুলি বই কিনিয়া তাহার খরচ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না;

এই দুর্দ্দিনে তাহারা কিরূপে করদাতাদের কাজে আসিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আর অপেক্ষাকৃত বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ আবশ্যক। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জানিতে চান, তাঁহারা লাইব্রেরী বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য ক্লাস খুলিতে প্রস্তুত আছেন কি না। সিণ্ডিকেট একটি কমিটির উপর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের ভার দেন। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের ক্লাস খুলিবার পরামর্শ দেন। সিণ্ডিকেট সেই পরামর্শ মত গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীয়ান শিক্ষা ক্লাস খুলিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। খুব সম্ভব গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে বড় বড় লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ সম্ভবপর হইবে।

পরিশেষে আর এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আজকাল সাহিত্যের নানা আবর্জ্জনা আসিয়া বাণীমন্দির কলুষিত করিতেছে। লঘু সাহিত্যের বা light literture-এর দোহাই দিয়া trash literature বা আবর্জ্জনা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, বাণীমন্দিরের পবিত্রতা যাহাতে ক্ষুন্ন না হয়, সেজন্য সকলে অবহিত হউন। কেহ কেহ বলেন চাহিদা বুঝিয়া মাল না যোগাইলে লাইব্রেরী টিকিবে কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সাধারণের রুচি উন্নত করিবার গুরুভার প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে লইতে হইবে—কর্ম্মক্লিষ্টের চিত্তবিনোদনের উপযোগী চিত্তোৎকর্ষসাধক সাহিত্যের (recreative literature) অভাব নাই তাহার দিকে লোকের চিত্ত যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এরূপ পুস্তকের স্থান লাইব্রেরী নহে। কলিকাতা করপোরেশানের বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্ম-কারক (Executive Officer) কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ করিতেছিলেন যে কলিকাতার বেশীর ভাগ লাইব্রেরীর পুস্তক দাদনের বহি (Issue Registers) দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে, গুরুতর বিষয়ক পুস্তকের (Serious reading) পাঠক দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, অপরদিকে নাটক নভেলের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার বোধ হয় গুরুতর বিষয়ের পাঠক বাড়াইবার জন্য নাটক নভেল ছাড়া আর সব বই কিনা চাঁদায় পাঠককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে ২।১টি লাইব্রেরীতে পরীক্ষা করিয়াছি; তাহার ফল মোটের উপর সন্তোষজনক দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব বোধ করায় শ্রীপ্রমিলচন্দ্র বসু নামক জনৈক উৎসাহী যুবককে আমরা বরোদা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এপ্রিল মাসেই প্রত্যাবর্ত্তন

করিবেন। আমরা যাহাতে তাঁহাকে কাজে লাগাইতে পারি ও তাঁহার সাহচর্য্যে কতকগুলি কর্মী তৈয়ারী করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সকল লাইব্রেরীই সকাল ও বৈকাল তো খোলা থাকা চাই-ই, তাছাড়া দুপুর-বেলা যাহাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে সেখানে লইয়া যান এবং গ্রন্থাগারিক তাহাদের পাঠাগারের ব্যবহার শিখান তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঠাগারগুলিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যায়াম প্রভৃতি পল্লীর সকল সদনুষ্ঠানের এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য শিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইবে। আর প্রত্যেক লাইব্রেরী সহিত যাহাতে শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শৈশব হইতে পাঠানুরাগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে—তবেই পাঠানুরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তকের মত সৎসঙ্গ আর কোথায় মিলিবে? জগতের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু চিত্তরঞ্জক, যা কিছু স্পৃহনীয়—সবই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ আছে,—গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশুদ্ধ আনন্দের স্থান জগতে আর আছে কি? যুগে যুগে কত মহাপুরুষের উদ্ভব এবং বিলয় ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ধারা এখানে আটক পড়িয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের শিক্ষার স্থান—সে শিক্ষা পাইতে হয় কড়া শাসন এবং নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়া। আর গ্রন্থাগারের শিক্ষার কালাকাল নাই,—ইহা আজীবন শিক্ষার স্থান,—স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সঞ্চয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পাঠচক্র থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশু বিভাগে তেমনি গল্পের ক্লাস বড় লোভনীয় বস্তুতে দাঁড়াইয়া যায়। শিশু হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের এমন সহজ উপায় আর নাই। গল্পে আশ্রয় লইয়া ইতিহাস, জীবন চরিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী করা যাইতে পারে। খেলাধুলার মধ্যে দিয়াও কত শিক্ষানীয় বস্তু সহজে বোধগম্য করা হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যদি জাতিকে বড় করিতে হয়—মানুষের মত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। গোড়ার পত্তন ভাল করিতে হইবে - গোড়ায় গলদ থাকিয়া গেলে আর উপায় থাকে না, সেজন্য শিশুদের বাদ দিলে চলবে না,—তাহাদের জন্যও প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভি. আই. লেনিন

বহু সংখ্যক নগণ্য বুর্জোয়া শ্রমিক যারা জ্ঞানের অন্বেষণে উৎসাহী তারা পুরনো পদ্ধতিকে ভেঙ্গে ফেলে কিন্তু নূতন কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ বা শৃঙ্খলা-বদ্ধমান পদ্ধতির প্রস্তাব করল না। জন প্রতিনিধি সংসদে (Council of People's Commisars) প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদে আমার এগুলো পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে শিক্ষিত মানুষ ও গ্রন্থাগার বিভাগের মধ্যে সংগতি রক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং এই সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ থেকে এই ক্ষেত্রে অবস্থার গুরুত্ব আমি অনুধাবন করেছিলাম।

এটা বাস্তব যে, শুভেচ্ছা বাণীতে কোন কিছু খারাপ নির্দেশ করা খুব একটা মামুলি ব্যাপার ছিল না। আমি আশা করি আপনারা এইসব গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত, এবং আমার পর্যবেক্ষণ যে খুবই দুঃখজনক ছিল, তা বলাতে আপনারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। যখন আমরা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকেদের চালনা করার প্রশ্ন তুললাম, তখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল, আমাদের বিপ্লব থেকে আগত উজ্জ্বল জয়, যা কিনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবের সীমা থেকে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়নি। এটা ঠিক আমাদের বর্ত্তমান শক্তি বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সুবিধাজনক শক্তি ছিল নগণ্য বুর্জোয়াশক্তি এবং তাদের মূলমন্ত্র ছিল সেই পুরাতন কথাটি—প্রত্যেকে নিজের জন্য এবং ভগবান সবার জন্য—এটা খুব অভিশপ্ত পুঁজিবাদী শ্লোগান যা কখনও কোনও কিছু পরিচালনা করতে পারে না কিন্তু কোলচক (Kolchak) এবং বুর্জোয়াকে পুনঃস্থাপন করতে পারে। যদি আমরা দেখি যে আমরা নিরক্ষরদের শিক্ষিত করার জন্য কি করছি, তবে আমার মনে হয় আমরা এই উপসংহারে পৌঁছব যে আমরা খুব অল্পই কাজ করেছি এবং আমাদের এই ক্ষেত্রে আবশ্যিক কর্ত্তব্য প্রাকৃতজন সম্বন্ধীয় (Proletarion) তত্ত্বের শৃঙ্খলা স্থাপনে যে প্রয়োজন, তা অনুধাবন করা।

এই ব্যাপারটা যা কাগজে লেখা রয়েছে, তা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু জনগণকে এই মুহূর্তেযে কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে,

তা হল প্রত্যেকটি ব্যক্তির কর্তব্য হবে বিভিন্ন নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তোলা। এটাই আমাদের ফরমান ছিল কিন্তু বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই হয়নি।

যখন জন-প্রতিনিধি-সংসদে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম যে আমরা আমাদের শৈল্পিক অনুন্নয়ন সম্পর্কে ক্রমাগত যে সমস্ত অভিযোগ শুনতে পাই, তা নিন্দার যোগ্য, তা হল কম সংখ্যক পুস্তক এবং যথেষ্ট পরিমাণে কিছু উৎপাদন করার অক্ষমতা। আমি এই অভিযোগগুলিকে যুক্তিযুক্ত বলেছিলাম। আমাদের অবশ্যই কোন জ্বালানি নেই। ফলে কারখানাগুলি অচল। আমাদের অল্প সংখ্যক কাগজ আছে ফলে আমরা পুস্তক প্রকাশ করতে পারিনা। এ সবই সত্য কিন্তু এটাও সত্য যে সমস্ত পুস্তক সহজলভ্য আমরা তাও পাই না। এখানে কৃষকের সরলতা ও অসহায়তা লক্ষ্য করে কষ্ট পাই, যখন দেখি কোনো কৃষক কোনো গ্রামের জমিদারের গ্রন্থাগার তছনছ করে, তারপর তার কাছ থেকেই কেউ বইগুলো কেড়ে নেবে এই ভয়ে সে দৌড়ে চলে যায়। কারণ রাষ্ট্রের সম্পত্তি বিতরণ করার মানসিকতা সে মনে মনে পোষণ করে না, যা কিনা সমস্ত শ্রমিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ সম্পত্তি।

অজ্ঞ কৃষকদের এরজন্য দোষ দেওয়া যায় না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, ততক্ষণ এটি বেশ আইনানুগ এবং একটি অপরিহার্য্য স্তর, যখন একজন কৃষক গ্রন্থাগারের বইপত্র নিজের কাছে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে এই কাজ করত না যদি সে জানত যে রাশিয়ার সমস্ত গ্রন্থাগার একত্রিত হয়ে একটি গ্রন্থাগারে পরিণত হবে এবং পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেশী হবে ফলে যাঁরা লেখাপড়া জানেন তাঁদের মনের চাহিদা মিটবে এবং যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁদের এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যাবে।

বর্তমানে আমরা অবশ্যই এই বিশৃঙ্খলা, মহাবিশৃঙ্খলা এবং হাস্যকর বিভাগীয় কোন্দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। এটা অবশ্যই আমাদের প্রধান কাজ হবে। আমরা অবশ্যই সাক্ষরদের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত করে তুলব। আমরা অবশ্যই সহজলভ্য পুস্তকসমূহ ব্যবহার করব এবং সমস্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করব, যা সমস্ত মানুষকে প্রতিটি লভ্য পুস্তকের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে। অবশ্যই সেখানে সমকক্ষ আর কোনো সংগঠন থাকবে না, কেবল একইরূপ একটি পরিকল্পিত সংগঠন ছাড়া। এই একটি সামান্য ছোট ব্যাপার আমাদের বিপ্লবের

একটি মৌলিক কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করবে। যদি এটা এই কার্যকে চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, যদিও এটা রাশিয়ার মহাবিশৃঙ্খলার এবং অপটুতার মধ্যে একটি প্রকৃত প্রণালীবদ্ধ; একইরূপ শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যর্থ হয়, তখন এই বিপ্লব শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের বিপ্লবে পরিণত হবে। কারণ প্রকৃত জনসম্বন্ধীয় বিপ্লবের মূল বিশেষত্ব হল এই ধরণের শৃঙ্খলা, যা সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে আছে। যার জন্য সমস্ত বুর্জোয়ারা পুরনো পদ্ধতিকে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল এবং কৃষকদের কৃষির উন্নতিতে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল, যা কিনা আগের বিপ্লবের মতই একই ধনতন্ত্রবাদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

বস্তুতঃ এখন আমরা আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টি বলে অভিহিত করি। আমরা যেন অবশ্যই অনুভব করতে পারি এখন আমরা কেবলমাত্র বহিবাধা দূর করেছি এবং পুরোনো ধ্যান ধারণাকে ভেঙ্গে ফেলেছি। কিন্তু বিরাট সংখ্যক জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রাথমিক কাজ-এর সম্মুখীন আমরা কি হতে পেরেছি? আঠারো মাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা হল, আমরা অবশ্যই সঠিক পথটা গ্রহণ করব যার মাধ্যমে অপ্রতুল কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অজ্ঞতা এবং বর্বরতা জয় করতে পারব। যা থেকে এতদিন আমরা বঞ্চিত ছিলাম।

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা

ফণিভূষণ রায়

● শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি

সাধারণভাবে শিক্ষা বলিতে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তির সাহায্যে কোনও অনয়াত্ত অভিজ্ঞতাকে আয়ত্তাধীন করাকে বুঝি। জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা শিক্ষিত করিয়া তোলা সমাজের স্বার্থে প্রয়োজন। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাই বিভিন্ন সমাজ বহু বিচিত্রভাবে একাধিক জনের এই আহৃত অভিজ্ঞতাকে অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ শিক্ষা গ্রন্থ মাধ্যমে বিতরিত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যত বিপুল ও জটিল হইয়া উঠিতে থাকে জ্ঞানদাতা বা জ্ঞানালাভেচ্ছুর ব্যক্তিগত যোগাযোগ যত অসহজ হইয়া উঠিতে থাকে জ্ঞান তত গ্রন্থাশ্রয়ী হইয়া উঠিতে থাকে এবং জ্ঞান বিতরণও গ্রন্থমাধ্যমে পথ খুঁজিয়া লয়।

কাগজ, ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশের বহুল প্রচলনের পর বর্তমানে মানব সমাজের জ্ঞানভাণ্ডার প্রায় সর্বতোভাবে গ্রন্থাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বর্তমান সমাজে জ্ঞান বিতরণে গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই জটিল পরিস্থিতির যথাযথ অনুধাবনের জন্য শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বা আসল লক্ষ্য কি তাহা জানা প্রয়োজন।

● শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য কি

শিক্ষা বিজ্ঞানের মতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা। বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান সঞ্চয় এই পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থেই প্রয়োজন। নচেৎ শুধুমাত্র জ্ঞানসঞ্চয় শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বিভিন্ন শিক্ষার্থীতে বিভিন্ন হইতে পারে এবং সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিবার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। সেইজন্য সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় মোটা মাপের সামাজিক মানুষ গড়িবার দিকে প্রবণতা থাকিলেও শিক্ষার আসল লক্ষ্য থাকে স্বতন্ত্র মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিকে

উপযুক্তভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার স্বতন্ত্র রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ ব্যক্তি মানসের বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্য কখনোই কেবল মাত্র প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পাঠক্রমকে অনুসরণ করিয়া সাধিত হইতে পারে না। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করিতে হইলে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যে তাহারা যেন মোটামাপের মানুষ গড়ার মধ্যেই মাপের বা ছাঁচের বাইরের মানুষকেও উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই ভূমিকাকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন করিবার জন্য শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক ভূমিকার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

● শিক্ষাকার্য সম্পন্ন করায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্রন্থাদি ও সমাজের ভূমিকা

কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত বা জ্ঞানযুক্ত হইবার জন্য কয়েকটি সক্রিয় এবং নিক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারা শিক্ষাকার্যে পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত কিন্তু পারস্পরিক ভূমিকায় লক্ষ্যণীয় তারতম্য আছে।

● শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শিক্ষাথী কোনও শিক্ষকের নিকট হইতে বা কোনও গ্রন্থ হইতে অন্যের আহৃত অভিজ্ঞতাকে স্বচেষ্টায় বা অপরের সাহায্যে আত্তীকরণ করিয়া থাকেন। আপাত-দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা শুধু গ্রহণ করিবার ভূমিকা। কিন্তু শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষাকার্যকে কখনোই সার্থক বা ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া বিষয়টির প্রতি তাদের সহজাত আকর্ষণ থাকিবার কোন বিশেষ কারণ নাও থাকিতে পারে।

সাধারণভাবে বয়সভেদে; অনেকক্ষেত্রে বয়স ব্যতীতও শিক্ষার্থীর মনের গঠন বা পরিপূর্ণতা বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। ফলে বিভিন্ন বিষয়কে গ্রহণ করিবার বা আয়ত্তে আনিবার ক্ষমতা সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান না হওয়াই স্বাভাবিক।

● শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীর পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ইনি সজীব এবং সক্রিয় জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে নিজের বক্তব্যকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত

করিবার বা বিভিন্নভাবে অলঙ্কৃত করিয়া বক্তব্যকে চিত্তাকর্ষক করিবার ক্ষমতা ইহার থাকা সম্ভব এবং থাকা বাঞ্ছনীয়। বক্তব্যের এই পরিবেশন নৈপুণ্যই তাঁহাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চারণে সাহায্য করে।

শিক্ষণীয় বিষয়ে ইনি শিক্ষার্থী অপেক্ষা অবশ্যই অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কাজেই সেই বিষয়ের তত্ত্ব বা তথ্যের খবর বা সেই তত্ত্ব বা তথ্যকে আয়ত্ত করিবার ব্যাপারে অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া ভাবিবার কারণ আছে। শিক্ষক বিভিন্ন-ভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সঞ্চারণে নিজেকে ক্রমান্বয়ে গৌণ করিয়া তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষকের ভূমিকা যতদূর সম্ভব নিহিত হওয়া উচিত শিক্ষণীয় বিষয়ের তত্ত্ব বা তথ্যের খবর বা যোগান দেওয়ায়, দুরূহ অংশের উপযুক্ত উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ায় এবং বিচার বিতর্কে অংশগ্রহণ করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনকে ক্রটিহীন হইতে সহায়তা করায়। বর্তমানে শিক্ষণীয় বিষয় এত জটিল ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছে যে কোনও শিক্ষকের পক্ষেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে সম্পূর্ণ-ভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষার্থী স্বচেষ্টায় কোন সূত্র হইতে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া যে কোন শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য।

● গ্রন্থাদির ভূমিকা

গ্রন্থাদি সমস্ত পূর্বগামীদের চিন্তা বা জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। শিক্ষকের সজীবতা বা সক্রিয়তা গ্রন্থে সম্ভব নয়। গ্রন্থের বক্তব্য বা বর্ণনাভঙ্গী তাহার রচনার সময়েই নির্দিষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিক্ষার্থী মান বা প্রয়োজন অনুযায়ী বক্তব্যকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত বা নূতনভাবে অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা গ্রন্থাদিতে থাকে না। কাজেই কোনও বক্তব্যকে নূতনভাবে চিত্তাকর্ষক করিয়া পরিবেশন করার ক্ষমতা গ্রন্থাদিতে অনুপস্থিত। তবুও বর্তমান সমাজে গ্রন্থই মানুষের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার একমাত্র ভাণ্ডার যাহা হইতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েই প্রয়োজন মত ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য। অনিবার্য কারণেই সমাজ জীবনেই গ্রন্থের ভূমিকা তাই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের ব্যবহারকে সহজ সরল এবং বহুল করিবার উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব এই শিক্ষা কার্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত সকলের উপরই বর্তিবে।

● সমাজের ভূমিকা

সমকালীন সমাজ স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আয় ও তাত্ত্বিক জ্ঞানকে অনুশীলন করার সুযোগ করিয়া দেয়। বিশেষ করিয়া ফলিত বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে এই ধরনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এই অনুশীলন ব্যতীত কেতাবী জ্ঞানকে স্বাভাবিক সমাজ জীবনের জ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব নয়।

● বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক অনুপূরকতা

শিক্ষা জগতের সব কয়টি অংশ একত্রভাবে কাজ করিয়াই লব্ধ জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর প্রকৃত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অবশ্য আপেক্ষিক ভাবে অংশগুলির পারস্পরিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটির, শিক্ষক এবং গ্রন্থের, পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই দুইটির একে অপরের অনুপূরকের মত, যদিও উভয়ের ভূমিকায় যে প্রভেদ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অনুপূরকদ্বয়ের একের ভূমিকা বাড়িতে থাকিলে অপরের ভূমিকা কমিতে থাকিবে। শিক্ষকের ভূমিকা অতি প্রবল হইলে পুস্তকের স্থান নগণ্য হইয়া যাইতে পারে আবার শিক্ষক নিজেকে গৌণ করিয়া তুলিলে গ্রন্থ প্রধান ভূমিকায় আসিতে থাকিবে। তবে আপেক্ষিক অর্থে পারস্পরিক অনুপূরক হইলেও তাহারা একে অপরের স্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। শিক্ষক গ্রন্থের স্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ কোনও শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে গ্রন্থ জগতের বিপুল জ্ঞানরাশিকে এবং অপরিসীম তীব্র গতিতে ক্রমবর্দ্ধমান এই জ্ঞানজগতকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। গ্রন্থের পক্ষেও শিক্ষককে সর্বতোভাবে অপসারণ করা দুরূহ। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে নূতন করিয়া গড়িতে গ্রন্থের অপারগতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সে কথা বাদ দিলেও বর্তমানের বিশাল এবং বিদ্যুৎগতিতে ক্রমবর্দ্ধমান গ্রন্থ জগতে নিজের রুচি প্রয়োজন এবং সামর্থমত সঠিক গ্রন্থকে সম্পূর্ণভাবে স্বচেষ্টায় নির্বাচিত করিয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া যাওয়া যে কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে অসম্ভবই বলা চলে। যে কোনও ধরনের সহায়কের তা তিনি বিষয় শিক্ষকই হউন বা গ্রন্থাগারিকই হউন সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ জগতের বিশাল অরণ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া অকল্পনীয়—আশি বা নব্বই বছরের সাধারণ জীবনে অসম্ভব। গ্রন্থভুক্ত

তত্ত্ব বা তথ্যের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনে সহায়তা করাই শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা উচিত।

● শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তনে বিভিন্ন অংশের ভূমিকা

মানব সমাজের শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় শিক্ষাকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত এই বিভিন্ন অংশ বিভিন্নকাল বিভিন্নভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। স্বভাবতই শিক্ষা বিজ্ঞানের চিন্তাধারার বিবর্তনের সঙ্গে এই গুরুত্ব প্রদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

যখন গ্রন্থের প্রবর্তন যথেষ্ট প্রবল ছিল না তখন গুরুই ছিলেন শিক্ষাকার্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গুরুর চিন্তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। বিদ্যা যদিও কোনও শিক্ষণকে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত তথাপি শিক্ষা পদ্ধতির ফলে এই শিক্ষাকার্য গুরুকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরকালে যখন জ্ঞানের রাজ্য জটিলতর হইয়াছে কাগজ, ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে গ্রন্থের প্রবর্তন সহজ হইয়াছে তখন শিক্ষাজগতের চিন্তাবিদেরাও নূতন করিয়া ভাবিয়াছেন। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষকের উপস্থিতি বা প্রভাবে অস্বাভাবিক জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ফলে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবর্তিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পথেই গ্রন্থাগারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, গ্রন্থাগারের আবশ্যিক ব্যবহারের চিন্তা ক্রমশ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থবিজ্ঞানে ক্রমশ সমাজ সচেতনতা যত কাজ করিয়াছে তত শিক্ষা জগতে এই উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সমস্ত শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহাকে সমাজ জীবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া। কাছেই শিক্ষাদানকে জীবন কেন্দ্রিক করার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক সময়ে কোন নূতন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে বর্জন করিতে হইয়াছে। আবার অনেক সময়ে পুরানো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়ভাবে পরিমার্জিত পরিশুদ্ধ হইয়া নব কলেবরে বিরাজ করিতে থাকে। শিক্ষা পদ্ধতির জগত লক্ষ করিলে এই পরিশুদ্ধ পুরাতনের সহিত নূতনের সহাবস্থান সহজেই চোখে পড়ে।

বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতিতে তাই শিক্ষার্থীর জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেন না পরন্তু তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং সেই জন্যই নিজেকে ক্রমান্বয়ে গৌণ করিয়া তোলার চিন্তা করেন। নিজেকে প্রকৃষ্টভাবে গড়িয়া তোলার জন্য গ্রন্থাগারের

মধ্যে সংগঠিত যুগান্তরের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে আহার করা অবশ্য প্রয়োজন এবং ইহার কোনও বিকল্প নাই বলিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুপারিশ করেন। সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা জীবনের জন্যেই প্রয়োজন বলিয়া বর্তমানের শিক্ষাদানকে জীবনকেন্দ্রিক করার চিন্তা শিক্ষাবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক চিন্তা। বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি তাই শিক্ষককে সহায়ক করিতে চায়, জ্ঞান আহরণকে গ্রন্থাগারমুখী এবং জীবনকেন্দ্রিক করিতে চায়।

● বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অপরিহার্যতা

বর্তমান সমাজে বিভিন্ন অংশ বা বিভিন্ন বিষয় এত দ্রুততার সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে যে গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতীত তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষের আয়ত্ত জ্ঞানের প্রভাবে পড়িয়া সমস্ত সমাজও আজ অতি দ্রুতগতিতে বদলাইয়া চলিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রাখিবার জন্য মানুষের তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞানের প্রয়োজনও আজ আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আজ সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, বিংশ শতাব্দীর উপযোগী জীবন ধারণকে সম্ভব করিবার জন্য তত্ত্ব জ্ঞান এবং তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ উপযুক্তভাবে পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধনশীল একটি জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোনোও বিকল্প নাই, এই জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবস্থার প্রয়োজন শুধু সাধারণের জন্য নয় এইরূপ ব্যবস্থা জীবনের বা সমাজের প্রত্যেক অংশের উপযুক্ত বিকাশ এবং অগ্রগমনের জন্যই প্রয়োজন।

● শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অপরিহার্যতা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন একই ভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কোনোও শিক্ষকবৃন্দের পক্ষেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণ বিকল্প হিসাবে কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্য উপযোগী করিয়া দেওয়া হয় তবে সমাজের প্রয়োজনে জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দেওয়াও এই শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া উচিত। নচেৎ শিক্ষক মহাশয়ের দয়ায় চামচের মুখে বিতরিত, শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনগঠনের উপযোগী হইবে না, বৃহত্তর জীবনের জন্য ও তৈয়ারী করিতে পারিবে না।

● আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

আদাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে তাহার

সহিত আমাদের কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কাজেই যাহা নাই তাহাকে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠে না। কলেজগুলিতে কিছু কিছু গ্রন্থাগার আছে বটে কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে তাহা অবশ্যপাঠ্য পুস্তকগুলির (textbook) ঋণ কেন্দ্রের কাজ করে। শিক্ষাপদ্ধতি এবং নোটবই উভয়ে মিলিয়া শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা আবাসগৃহ, আসবাব, গ্রন্থ ইত্যাদির বিচারে হতাশ হইবার মত নয়। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবহারকে আবশ্যিক করিবার কারণ নিহিত নাই বলিয়া এখানেও গ্রন্থাগার মূলতঃ আবশ্যিক পাঠের ঋণ কেন্দ্র। বাজারের ক্রয়লভ্য নোট এবং শিক্ষক মহাশয়ের ক্লাসে প্রদত্ত নোট উভয়ে মিলিয়া শিক্ষার্থীর পাঠস্পৃহাকে যতদূর সম্ভব দাবাইয়া রাখে।

● বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও তাহার পরিণাম

ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে শিক্ষা কার্যে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে কমিশন অবহিত ছিলেন। কি উপায়ে শিক্ষাকার্যে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব একাধিক কমিশনের সুপারিশে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্যক্ষেত্রে এই সুপারিশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ফলে শিক্ষাজগৎ এখনও এক শতাব্দীর অধিক পুরানো পদ্ধতিকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কমিশনের এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে বিশেষ কোনও চেষ্টার খবর আমাদের কাছে নাই। সম্ভবতঃ ইহার মূল কারণ এই যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগারমুখী বা গ্রন্থাগারাশ্রয়ী করিতে হইলে বর্তমান কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন তাহা করিবার মত লোকবল বা মনোবল আমাদের নাই। হয়তো সেই কারণেই এই সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতেও আমরা উৎসাহিত বোধ করি নাই।

● শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করার উপায়

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করা প্রকৃত অর্থে একটি নূতন ধরনের ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য কর্মধারা। এই কর্মধারাকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে বিভিন্ন বিষয়কে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রচলন করা প্রয়োজন।

ইহার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের এবং স্তরের নির্দ্ধারিত শিক্ষণীয় অংশগুলিকে (syllabus) নূতনভাবে বাছিতে হইবে এবং সাজাইতে হইবে। শিক্ষা পদ্ধতিকেও বিষয় এবং স্তর অনুসারে নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে।

এই ব্যাপক পরিবর্তনকে সফল করিয়া তুলিবার মত আদর্শের এবং সঙ্কল্পের জোর গড়িয়া তুলিতে দীর্ঘদিনের সময় লাগা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করিয়া আমাদের মত অচলায়তনের দেশে যেখানে যে-কোন পরিবর্তনকেই ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। তবে এই বিষয়ে যে সক্রিয় চেষ্টা হয় নাই তাহা বলা চলে না। কারণ মাদ্রাজের South India Teachers Union's Council of Education Researeh (SITUCER) বিভিন্ন Seminar এ তাঁহাদের বক্তব্যকে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু কথায় বলে একটি মাত্র কোকিলের স্বর বসন্তের আগমনের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিতে পারে বটে কিন্তু বসন্তের আবির্ভাবকে ঘোষণা করিতে একটি ক্ষীণ স্বর যথেষ্ট নহে। তবুও SITUCER-এর Seminar গুলিতে Library Centred Education (LCE)-এর কার্যপদ্ধতি এবং মূল্যায়নের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

● শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করায় শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করিয়া তুলিতে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়াংশের পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, শিক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মনে সহজ এবং সুস্পষ্ট উপলব্ধি সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য প্রত্যেক কাজকে প্রকৃত অর্থে জীবন কেন্দ্রিক করিয়া তোলা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর এই পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিতে হইলে একদিকে শিক্ষার্থীকে নিজ জ্ঞান আহরণে সাহায্য করিতে হইবে অপরদিকে এই জ্ঞান আহরণ যথাযথ হইল কিনা বিচার বিতর্কের মাধ্যমে তাহা স্থির করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

শিক্ষকের কর্তব্য তাই দ্বিবিধ হইয়া পড়িবে। প্রথম ভূমিকায় শিক্ষক পথ প্রদর্শক। কোন কোন গ্রন্থাদি হইতে বিবেচ্য বিষয়ের তত্ত্ব, বই, তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে শিক্ষক তাহা পূর্বে নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থী সাধ্যমত জ্ঞান আহরণ করিবার পর বিচার বিতর্কের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে সম্ভবমত ত্রুটিহীন করিয়া তোলার দায়িত্ব শিক্ষাকে বর্তাইবে।

বর্তমানের Lesson planning এর ধারা বদলাইয়া topics and discussion planning-এ পরিণত হইবে। শিক্ষার স্তরভেদে এই বিষয় নির্বাচন এবং আলোচনার ধারার পরিবর্তন আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাবিজ্ঞানের

বহু গ্রন্থেই বহু ধরনের আলোচনাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ আছে। প্রয়োজন মত তাহাদের কাজে লাগানো খুব কষ্টকর হইবে না।

শিক্ষাপদ্ধতি এইভাবে পরিবর্তিত করিলে সময় কিছু লাগিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইতেই হইবে। হয়তো বর্তমানের ফ্যাক্টরীর সিফট প্রথায় চালু বিশালকায় শিক্ষায়তনগুলির বিশালকায় ক্লাশগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। হয়তো শ্রম লঘুকর নোটবই বা প্রশ্নোত্তরমালা বা একের ভিতরে বহু জাতীয় গ্রন্থগুলি দুর্বিপাকে পড়িবে। কিন্তু সমাজ হইতে খাদ্যের ভেজাল দূর করিতে কোমল হইলে চলে না।

● শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

বর্তমান সমাজে বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন মানের গ্রন্থের প্রকাশ এত দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে কোনও বিদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও আপন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কাজেই প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সকলের পক্ষেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গ্রন্থাগারিকের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পক্ষেও এ প্রয়োজন স্বাভাবিক।

শিক্ষককে বিষয় নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্দেশ দিবার এবং তালিকা প্রণয়ন করিয়া দিবার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। যে-কোনও বিষয়ে প্রয়োজন মত Pre-course study, Parallel study এবং Post course study-র উপযুক্ত গ্রন্থাদি নির্বাচন করিয়া গ্রন্থাগারিকও শিক্ষকের দায়িত্ব আংশিকভাবে পালন করিতে পারেন। কাজেই শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক যৌথভাবে শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সমস্ত কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুতভাবে সফল হইয়া উঠিতে থাকিবে।

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থের প্রতি সহজাতভাবে আকর্ষিত নয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই আপাতদৃষ্টির অনাগ্রহকে অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের প্রতি পাঠকের মনকে নানাবিধভাবে আকৃষ্ট করার কৌশল গ্রন্থাগারিকের নিত্য ব্যবহারের অস্ত্রস্বরূপ। কাজেই একজন দায়িত্ব সচেতন গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করিতে নানাভাবেই সাহায্য করিতে পারেন।

● শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকের মিলিত কার্যক্রম

কার্যতঃ শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকের মিলিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়া গ্রন্থাগারমুখী

শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলা যাইবে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রকৃত অর্থে সার্থক করিতে হইলে এই কার্যক্রম এখনই প্রণীত হইতে থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য। এ পরিবর্ত্তনকে একদিনে কার্যকর করিয়া তোলা অসম্ভব। কাজেই এ কর্ত্তব্যকে একাধিক পর্যায়ে কার্যকর করিয়া তোলার দায়িত্ব এই শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকদের সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

● আমাদের শিক্ষা সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের কোন দ্বিতীয় পথ নাই

জাতীয় জীবনে শিক্ষা আজ উত্তরোত্তর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। সকলের মনেই বর্তমানে শিক্ষাধারা সম্বন্ধে গভীর অশ্রদ্ধা আসিয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ ব্যাপক গণ-টোকাটুকির অভিযান একদিনের জন্যও চলিতে পারিত না। শিক্ষার্থীর সমস্ত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র আজ অবশ্য পাঠ্য-পুস্তকগুলির (Text book) বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ। ক্লাস রুমে শিক্ষক মহাশয় ইহার কম বেশী অংশ শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। সেই ব্যাখ্যা আত্তীকরণই শিক্ষার্থীদের কাজ হইয়া দাঁড়ায়। এ পথেও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমকে লাঘব করিবার জন্য নানা ধরনের নোট বা কোচিং ক্লাসের কুটীর শিল্প দেশ জুড়িয়া চালু আছে। শিক্ষার এই উপহাসিত সংস্করণ গ্রহণ করিবার পর একমাত্র ভয়ের বাধা থাকে শিক্ষান্তের "বরাৎ", পরীক্ষায়। এই বাধাকে অপসারণ করিবার কৌশল আজ গণ-টোকাটুকির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের মাঝে দাঁড়াইয়া আমরা আজ কতদূর বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সঙ্কটকে কাটাইয়া উঠার চেষ্টা হইতে বোঝা যায়। মেকি শিক্ষা বিতরণের এই ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারিক এবং সমাজ সচেতন সাধারণেরা এই ধ্বস নামার সাক্ষী হইয়া থাকিতেছে মাত্র। হয় ইতস্ততঃ পলেস্তারা দিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখিতেছি, না হয় ঘোষণা করিতেছি যে "সমস্ত ঢালিয়া সাজাইতে হইবে"—অর্থাৎ বর্তমানে তাকাইয়া দেখা ছাড়া করিবার কিছুই নাই। এ ধরণের উক্তি বা চিন্তা অন্তরের বিশ্বাস হইতে উদ্ভুত নয়; সমস্যাকে এড়াইয়া চলার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সমস্যা আমাদের কারো ঘরকেই রেহাই দিবে না বা এড়াইয়া চলিবে না। সময়মত সাবধান হইলে উপযুক্ত কর্মধারা গ্রহণ করিলে দুর্দ্দশার তীব্রতা কমিবেই। আমরা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইব। উপনিষদের ঋষির ভাষায় বলিতে হয় "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

গ্রন্থাগার ও গবেষণা

যোগেশচন্দ্র বাগল

কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বৎসরের ভিতরে সভা-সমিতি-সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণ বিদেশে গমনান্তর তথাকার গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। সরকারের সামাজিক শিক্ষা বিভাগ সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের একটি প্রকৃষ্ট উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই গ্রন্থাগারকে। প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলায়—সহরে ও পল্লীতে যে সকল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের অর্থ সাহায্যও করিয়া আসিতেছেন। আজিকার দিনে জনশিক্ষাকল্পে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

জনশিক্ষা ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ব্যপদেশে গ্রন্থাগার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আর একটি ব্যাপারেও ইহার আবশ্যকতা অত্যধিক। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভাণ্ডার যে সব গ্রন্থে বিধৃত তৎসমূদয়ের সমাবেশ হয় এখানে। জ্ঞান ত্রিবিধ—কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান ও লোকজ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। আবার এই ত্রিবিধ জ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রও হইল এই স্থল। কাজেই শিক্ষার্থী ও গবেষক উভয়েরই তীর্থস্থান স্বরূপ গ্রন্থাগার বিরাজ করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইহা কতখানি উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। গবেষণা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা কত তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতে প্রয়াস পাইব।

বাংলাদেশে কতগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে তাহার মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাদে অতি অল্পই শতবর্ষের পুরাতন। এই সকল গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে কতগুলি পারিবারিক গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠে। পারিবারিক গ্রন্থাগারের পক্ষে উত্থান ও বিলয় যত দ্রুত ও স্বাভাবিক, সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে তেমনটি সচরাচর ঘটে না। এইজন্য পারিবারিক গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থাদি যত তাড়াতাড়ি সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়, ততই মঙ্গল। আবার যে সকল পুরাতন গ্রন্থাগার আছে তাহারও পরিমার্জন ও সংগঠন এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনা

ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। নহিলে এতদিন যে রকম হইয়াছে, সেইরূপই বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র বিনষ্ট হইবে। বাংলার এবং বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এরূপ আশঙ্কায় কারণগুলি আগে নিবেদন করি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহকরূপে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রসিদ্ধি। তিনি ঐ সময়ে বহু প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে ছিলেন। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বলিয়া পরবর্তীকালে তাহার ভাগ্যে নিন্দা প্রশংসা দুই-ই জুটিয়াছে তিনি যদি আর কিছু নাও করিতেন। একমাত্র শব্দকল্পদ্রুমের সংকলয়তারূপেই তিনি অমর হইয়া রহিতেন। রাজা রাধাকান্ত স্বকীয় গ্রন্থাগারে সে যুগের ইংরাজী-বাংলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সমসাময়িক ইংরাজী বাংলা, সংস্কৃত পুস্তক এবং বহু অমুদ্রিত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাহার মুদ্রিত বিবরণ তো রাখিতেনই, উপরন্তু ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সভায় কার্যবিবরণের নকল দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহার প্রতিলিপি প্রভৃতিও নিজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে—কলিকাতার দেড়শত, সওয়া শত বৎসরের পুরোনো বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এই দু তিনটি বাদে তাহাদের কার্যবিবরণী মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় কোথাও আছে বলিয়া জানি না। কাজেই নানা কারণে গ্রন্থাগারটি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহাসিক উপকরণের খনিবিশেষ। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখান হইতে এ বিষয়ে আশাতীত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি বাঙালী জাতির একটি বিশেষ সম্পদ।

কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে আমরা প্রথম এখানে যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই ইহার ভগ্ন দশা। ইহার পূর্বে কোন কোন সুধী ব্যক্তি এখানে যাতায়াত করিতেন কিন্তু তাঁহারা এখানকার এতাদৃশ উপকরণ প্রাচুর্য সম্বন্ধে হয়ত ততটা অবহিত ছিলেন না। গ্রন্থাগারটি প্রধানতঃ এক বেয়ারার তত্ত্বাবধানে থাকিত। সপ্তাহান্তে দ্বার খুলিয়া সে ঝাড়পোঁছ করিত। গ্রন্থাগারিকও একজন ছিলেন। প্রতি রবিবার তিনিও হাজিরা দিতেন। কিন্তু হাজিরা পর্যন্ত। তিনি একবার দেখা দিয়াই বড়শীর ছিপ হস্তে প্রাঙ্গনের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে চলিয়া যাইতেন। গ্রন্থাগারটির পশ্চিম দিকে পুষ্করিণী, তাহার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। গ্রন্থাগারের বারান্দা হইতে একনাগাড়ে অনেকদূর দৃষ্টি যাইত।

আমরা পুরাতন বইপত্রাদি ঘাঁটিয়া দ্বিপ্রহরে চলিয়া আসিতাম। গ্রন্থাগারিকের বড়শির ছিপ কিন্তু অবিরাম মৎস্যকুলকে আকর্ষণ করিয়াই চলিত। আমাদের চোখের সামনেই খেলার মাঠ তুলিয়া দেওয়া হইল, পুষ্করিণী বুঁজিয়া গেল। * * পঁচিশ বৎসর পূর্বে আর পরে এ স্থানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন তবে গ্রন্থাগারটির অবশেষ এখনও সেখানে আছে। কত বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু গ্রন্থাগারিকের একবার দর্শন দিয়াই মাছ ধরিতে বসিবার দৃশ্য এখনও চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে।

* * *

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকাদির খোঁজে একবার কাশিমবাজারে যাই। মহারাণী স্বর্ণময়ী একটি সুন্দর গ্রন্থাগার নিজ প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যুগের বহু সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তক—বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় আজ যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এখানে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত ছিল। ভক্তিভাজন স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষের মুখে শুনিয়াছি যে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম দিককার ফাইল নষ্ট হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী নিজস্ব গ্রন্থাগার হইতে ইহার এক একটি দান করিয়াছিলেন। বড় আশা করিয়া কাশিমবাজারে গিয়াছিলাম। কিন্তু গিয়া কি শুনিলাম! গ্রন্থাগারটির মূল্যবান পুঁথিপত্র আর পাইবার উপায় নাই, প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। * * *

ইহার কিছুকাল পূর্বে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহরমপুরের রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে পুস্তকাদির খোঁজে যাই। সে লাইব্রেরীটিও বেশ সমৃদ্ধ। একটি প্রকোষ্ঠের আলমারী খুলিয়া দেখা গেল, উই আর ইঁদুর পাল্লা দিয়া বই পত্র নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। একখানির পাতা খুলিয়া দেখিলাম মুখার্জিস ম্যাগাজিন। সে যুগের বিদ্বান মনীষী ও সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সাময়িক পত্রখানি বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এখানির আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? রামদাস সেনের এই গ্রন্থাগারটি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দান করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

কলিকাতা হইতে তের মাইল দক্ষিণে চাংড়ীপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে বহুবার যাইতে হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি ছোট। কিন্তু একটি বিষয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়ীপোতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সে সময়ের প্রচলিত সংবাদপত্র হইতে এখানির নতুন স্বর, নতুন আদর্শ, ভাষার পরিপাট্য ততোধিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশেই নাকি তিনি এখানি প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিকখানি দীর্ঘকাল নানাভাবে স্বদেশের সেবায় নিরত ছিল। অন্যান্য পত্রিকার মতন এখানির ফাইলও দুষ্প্রাপ্য মাত্র। চাংড়ীপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতেই সোমপ্রকাশের বহু বৎসরের ফাইল রক্ষিত আছে। তবে প্রথম কয়েক বৎসরের ফাইল এখানেও পাওয়া যাইবে না। সোমপ্রকাশের অমূল্য ও দুর্লভ ফাইলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে এগুলিও বেশীদিন হয়ত থাকিবে না।

চুঁচুড়ার ভূদেব লাইব্রেরীর কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুধু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শিক্ষাবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন চৌখোস সাংবাদিক। তৎ সম্পাদিত শিক্ষা দর্পণও একখানি অভিনব ধরণের সাপ্তাহিক ছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, সাহিত্য নানা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইত। * * সমালোচনা ব্যপদেশে সংবাদপত্র, সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাহাকে অবশ্যই পাঠ করিতে হইত। এইরূপ কতকগুলি পত্র পত্রিকার ফাইল ভূদেব লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিমূলক বিস্তর পুস্তকও এখানে রহিয়াছে। এ লাইব্রেরীর পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা হইতে বহু নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই অত্যাবশ্যক অমূল্য গ্রন্থাগারটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিম পর্ষদ ও শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন। এই পত্রিকাখানির সম্পূর্ণ ফাইল চুঁচুড়াতেই তাঁহার পুত্রের আনুকূল্যে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারেও এখনও পর্য্যন্ত এমন সব অমূল্য আকর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রহিয়াছে যাহা সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির গবেষকদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

সংবাদপত্র প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি কথা বলিয়া রাখি। কেননা বহুস্থানে যে সব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল দেখিয়াছি যে-কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যুগের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের কলিকাতাস্থ বাসভবনে তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রীয়টের বহু বৎসরের ফাইল বিশেষ অনাদৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। কৃষ্ণকুমার

মিশ্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'র প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল তাহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পুত্রের তত্ত্বাবধানে আছে। কিন্তু এমনি আর কতদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্রের হেপাজতে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' হিন্দু পেট্রীয়ট, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'এর ফাইল রহিয়াছে। এগুলি দেখিবার সুযোগ বড় একটা ঘটে না, শুনিয়াছি মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পারিবারিক গ্রন্থাগার দুর্লভ পুস্তক সমৃদ্ধ। কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতেছে। কোন কোন উৎসাহী গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত সংবাদপত্রের ফাইলগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হইতে পারেন। অনেককালপূর্ব পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার ফাইলও এখন পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন একটি বিষয়ের উপর আমি জোর দিতেছি এবং গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। কোন যুগের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে সমসাময়িক পুস্তক-পুস্তিকা আবশ্যক। কিন্তু সে সময়কার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলি হইতে সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে তথ্য সম্ভার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাই এমনটি আর কিছু হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মনীষী বলিয়াছেন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হইলে লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকার ফাইল না ঘাঁটিয়া উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দী যেমন বিশ্বের পক্ষে, তেমনি ভারতের পক্ষেও একটি গৌরবময় যুগ। পরাধীন অবস্থায়ও যুগ প্রবর্তক রামমোহন হইতে কত প্রতিভাবান শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারক সাহিত্য বিজ্ঞান সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক এবং রাজনৈতিক কর্মীর যে উদ্ভব হইয়াছিল আগেকার' দিনে, এই স্বাধীন পরিবেশের ভিতরেও ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এই সকল নেতার উৎসাহে উদ্যোগে বহু শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, এবং সর্বশেষে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ জাতির রেনেসাঁ বা পুনরুজ্জীবনের যুগ। পরবর্তী প্রচেষ্টাসমূহ জাতিকে অধিকতর সঞ্জীবিত এবং সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই সকল আয়োজন-উদ্যোগের তথ্যপূর্ণ কাহিনীর পরিচয় মিলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক যথাযথ ইতিহাস রচনায় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা একেবারে অপরিহার্য।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী এইদিক হইতে আমাদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক ও বিশেষ মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। গত শতাব্দীর সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র—বিশেষতঃ ইংরেজী

পত্র-পত্রিকাগুলি এখানে সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তবে এ বিষয়েও যে সময়ে সময়ে কতকটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এখানে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হইলেও কোন কোন পত্রিকার ফাইল ধারাক্রমে ক্বচিৎ পাওয়া যাইবে তথাপি একটি বিষয়ে সুবিধা আছে। ১৮৫০-৬০ সনের মধ্যেকার পত্র-পত্রিকার বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করা এক সময়ে বর্তমান লেখকের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ সময়কার প্রয়োজনীয় ইংরেজী সংবাদ-পত্র কোন একখানি ধারাবাহিভাবে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল। আপনি 'বেঙ্গল হরকরা' বা 'ইংলিশম্যানের' সব ফাইল পাইবেন না, তবে ঐ সময়কার 'মর্ণিং ক্রনিকল', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সিটিজেন' প্রভৃতি এবং বাংলা কোন কোন পত্রিকার দ্বারা ফাঁক পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থাগার ভারাক্রান্ত হয়। তখন স্থান সঙ্কুলানে বা যত্নপূর্বক সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে। তখন কর্তৃপক্ষ কাজেই কিছু বই বাদ দিতে বা ছাটকাট করিতে বাধ্য হন। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে 'Weed out' বলে। কি কি বই বাদ দিতে হইবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত' কর্মীর মর্জির উপর ইহা কমবেশী নির্ভর করে। হয়ত এক সময়ে যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে, পরে অনেকে তাহা অতি প্রয়োজনীয় বোধ করিতে পারেন। এইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহা একদা বিবেচিত হইয়াছিল কালে আবার তাহা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। এইজন্য কোন একটি সাধারণ নীতি বা মান সম্মুখে রাখিয়া ঝাড়াই বাছাই করিলে অতটা বিপদে পড়িতে হয় না। কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনার কিরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এখানে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কয়েকটি ইংরেজী পত্র-পত্রিকার (যেমন, সাপ্তাহিক 'এনকোয়ারার', মাসিক 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু') উল্লেখ ১৯০৪ সনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ক্যাটলগে আছে। ঐ সময়কার সমাজ-জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানিলাম—এগুলি এখন আর পাওয়া যাইবে না, কারণ 'weed out' করা হইয়াছে। সে যুগের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণ এবং সভ্যগণ কর্তৃক পঠিত বা কথিত থাকিত। সদস্যগণের তালিকা ও কোন কোনটিতে নাম-ঠিকানা-পেশ সমেত

রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পুস্তকের শেষে দেওয়া হইত। সে যুগের একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের একত্রে বাধানো তিন বৎসরের রিপোর্ট ও প্রবন্ধ-পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটিতে ছিল এবং তাহা হইতে প্রচুর 'নোটস্' লিখিয়া লইয়া পুস্তকে ও প্রবন্ধে ব্যবহারও করিয়াছি। কিন্তু এখন আর এ অমূল্য বস্তুটির খোঁজ মিলিতেছে না। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। বাংলার উচ্চশিক্ষার ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিক্কার মিনিটস্ ও ক্যালেণ্ডারগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ সকল মিনিটস্ ও ক্যালেণ্ডার সাহিত্য-পরিষদে ছিল; কিন্তু এক সময়ে কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 'weed out' করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর হইতেই এগুলি সেখানে ছিল। বিভিন্ন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে এবং পরিষদের কোন কোন কর্তৃকপক্ষকে নানাস্থানে ইহার জন্য অনুসন্ধানও করিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রথমাবধি ঐগুলি পাইবার উপায় নাই। সরকারী ভূ-তত্ত্ববিভাগের পক্ষ হইতে শতা ব্দীযাবৎ ভারতের খনিজ সম্পদে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অনুসন্ধান চলিয়াছে। এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুসন্ধানের কথা বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে বিভাগীয় Records বা পুস্তকে বিধৃত। সাহিত্য-পরিষদে ইহার এক সেট এক সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানাভাবের ওজুহাতে কর্তৃপক্ষ 'weed out' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে খোঁজ করিতে গিয়া ঐ কথাই শুনিতে পাই। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না।

বাংলাদেশে জাতীয়-শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির লিখিত উপকরণ বিশেষভাবে সংগৃহীত রহিয়াছে কলিকাতার চারিটি প্রতিষ্ঠানে—এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাদে অন্য তিনটির কোনটিই শুধুমাত্র নিছক গ্রন্থাগার নহে; আমরা এখানে শুধু গ্রন্থাগার অংশের কথাই বলিতেছি। এই চারিটি প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের সমাজ-জীবন আলোচনা-গবেষণার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পল্লী গ্রন্থাগারগুলির (কলিকাতা ও মফস্বলের) কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। এসব স্থলেই আলোচনা-গবেষণার বহু তথ্য বা উপকরণ হয়ত মিলিবে। কিন্তু এমন কতকগুলি সর্বজনগম্য কেন্দ্র আবশ্যক, সেখানে পরবর্তীকালে স্নাতক যুবকগণ ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে

রত থাকিতে পারেন। বিভিন্ন দিক হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয়কে শক্তিমান ও সক্রিয় করিয়া তোলা জাতির এবং রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর 'ন্যাশনাল' কথাটি নানা কারণেই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু জাতির দিক হইতে এই সার্থক প্রতিষ্ঠানটির কার্য আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করা একান্ত প্রয়োজন। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদর্শে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া জগতের বিভিন্ন অংশ হইতে পুঁথিপুস্তক এবং শিল্প-দর্শনাদি সংগ্রহ পূর্বক ইংরেজ জাতি ইহাকে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছে। অনেকে হয়ত জানেন না, কার্ল মার্কস এই বৃটিশ মিউজিয়ামে নিয়মিত অধ্যয়ন দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে আমরা মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তকে সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। রিপোর্ট পুস্তিকা বা পত্রিকা তাহা যত ক্ষুদ্র বা অকিঞ্চিৎকরই হউক, সবই এখানে সংরক্ষিত থাকিবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'weed out' এর কোন প্রশ্ন থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কি সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ সম্যক অনুসৃত হইলে উভয়ই ক্ষুদ্রতর আকারে হইলেও আমাদের জাতীয় ভাষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়-কেন্দ্ররূপে গণ্য হইতে পারে। অমুদ্রিত পুঁথির বিষয় এখানে অন্য কিছু বলিব না। ইহার গুরুত্বও যে কত তাহা বর্তমানে বিশেষ উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলিতে, বহুতর অপচয় সত্ত্বেও এখনও যে অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার অবশিষ্ট আছে তাহা গবেষকগণের সহজ লভ্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সরকার আইন বলে যেমন স্মরা দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ভার লইয়া থাকেন সেইরূপ আইন করিয়া দুর্লভ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার আগার পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি সাধারণগম্য ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে পারে না?

গ্রন্থাগার ও গণ-সংগঠন

শিবশঙ্কর মিত্র

গ্রন্থাগার সম্পর্কে আজকাল আমাদের দেশের গণ-সংগঠনগুলির নেতাদের উদাসীনতাকে কশাঘাত করার সময় এসেছে। গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ উঠলে এঁরা সবাই, তা ব্যক্তিগতভাবে হোক আর সমবেত ভাবে হোক, বেশ সমীহ করে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা তাঁদের এতটুকু ভাঙে না। না ভাঙবার কারণও আছে। এক কথায় যদি কারণটি খুঁজতে হয় তাহলে বলতে হবে —গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের সকলের ধ্যান-ধারণা সেই মান্ধাতা আমলে পড়ে আছে। ফলে গ্রন্থাগারের মত এক মোক্ষম হাতিয়ারকে রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠনগুলি আমাদের দেশের সামাজিক বিপ্লব বা সামাজিক বিবর্তনের কাজে লাগাতে পারছেন না।

পত্র-পত্রিকা নিশ্চয় এক মহা মোক্ষম হাতিয়ার। সামাজিক চেতনার পরিবর্তনে এই হাতিয়ারের মোক্ষমতা নিয়ে এরা সকলেই খুবই সচেতন এবং সে বিষয়ে সকলেই সক্রিয় বলা যেতে পারে। এই হাতিয়ার নিশ্চয় খুবই ধারাল। কিন্তু শুধু ধারে তো কাটে না, ভারও লাগে। পত্র-পত্রিকা জনসাধারণের মনে আবেগ আনে, উদ্দামতাও আনে, কিন্তু উদ্যোগ আনবার ক্ষমতা এর সীমিত। সে জন্য ধারের সঙ্গে ভারও লাগে। পুস্তক-পুস্তিকাই সেই ভারের কাজটা করতে সক্ষম—মানুষের মনে মূলে নাড়া দিতে পারে। বদ্ধমূল সব ভ্রান্ত ধারণাকে উপড়ে ফেলতে হলে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনাই প্রকৃত হাতিয়ার। প্রধানতঃ এই হাতিয়ারের সম্ভার হলো গ্রন্থাগার, তা সে যত ছোটই হোক না কেন।

পুস্তক-পুস্তিকা সম্পর্কে গণ-সংগঠনগুলি সজাগ নয় -তা মোটেই না। তা যদি হতো, তাহলে তাঁরা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করবার এবং বিক্রী বা বিলি করবার জন্য এতো ব্যগ্র হতেন না। কিন্তু একটা বিষয় হয়তো তাঁরা অতো তলিয়ে দেখেন না। পুস্তক মাত্রেরই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, পড়বার ও জানবার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে। কিন্তু পছন্দমত অনেকগুলি বই যখন কারও আয়ত্তের মধ্যে এসে সারি বেঁধে একত্রে দাঁড়িয়ে পাঠককে আকর্ষণ করে তখন সে আকর্ষণ হয়ে ওঠে দুর্নিবার। গ্রন্থাগারের এই বিশেষ মূল্য গণ-সংগঠনগুলির

জানা থাকলেও তাঁদের অনুধাবনের মধ্যে নেই। তা না হলে তাঁদের এ সম্পর্কে এতটা উদাসীনতা দেখা যেতো না।

গ্রন্থাগার বলতে আমরা কি বুঝব সেটাই সবার আগে পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। কেননা, গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের মনে একটা বিকৃত ধারণা আছে—হাজার হাজাই বই থাকবে, নানা ধরণের কেটালগ থাকবে, বই লেন-দেনের নানা বৈজ্ঞানিক পন্থা থাকবে, উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রন্থাগার-কলাকুশলী থাকবে, পড়ার হলঘর থাকবে, টেবিল-চেয়ার-আসবাবপত্র থাকবে—এ সব না থাকলে কি গ্রন্থাগার! এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষের একটি কথা উল্লেখ করার মত। তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সর্বস্বতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন,—না, ও-সব অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, যেখানে এবং যখনই শিক্ষক ও ছাত্র মিলিত হচ্ছেন সেটাই আমার বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈজ্ঞানিকের এই মূল্যবোধ নিয়ে গ্রন্থাগারের বেলায়ও বলা চলে—না, ও-সব অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর বড় কথা নয়। যেখানে এবং যখনই পুস্তক-সম্ভার ও পাঠকদের একত্রিত করা সম্ভব হচ্ছে সেটাই আমাদের প্রকৃত গ্রন্থাগার। নাই বা থাকলো নানা প্রথায় তৈরি কেটালগ, নাই বা থাকলো নানা সূক্ষ্ম বিষয়ে নথিভুক্ত করা সারি সারি সজ্জিত পুস্তক-রাশি,—পুস্তক আর পাঠককে একত্রিত করার ব্যবস্থা আছে কিনা সেটিই বড় কথা, গ্রন্থাগারের সেটিই মূল কথা।

গ্রন্থাগারের গোড়ার কথাটা স্পষ্ট করে বলা হলেও আরেকটি বিষয়েও মস্ত বড় ফাঁক ও ফাঁকি আছে। এই ফাঁক ও ফাঁকির জন্য রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠনগুলির উদাসীনতা দেখা দেবার অন্যতম কারণ। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য কি? পশ্চিম দুনিয়া ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে এসেছে ও এখনও বলে—গ্রন্থাগার হবে সর্বমতের পূজারী। পশ্চিম দুনিয়া বলতে বলছি—যারা চায় দুনিয়াটা যেমন আছে তেমনি থাকুক, যারা পরাধীন আছে তারা পরাধীনই থাকুক. যারা মালিক আছে তারা মালিকই থাকুক, যারা ইতর তারা ইতরই থাকুক—দুনিয়াটা বদল হলে যে তাদেরই দুর্ভোগ! তাই, গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ঠিক হয়েছে,—গ্রন্থাগার হবে নিরপেক্ষ। জ্ঞানের ভাণ্ডারকে নিরপেক্ষ তো হতেই হবে! পাঠক যে বিষয়ে জানতে চায়, সে বিষয়ের সমস্ত জ্ঞান-সম্পদ তার সামনে তুলে ধরতে হবে। সে চাইলে তো কথাই নেই, না চাইলেও পরোক্ষভাবে তার প্রয়োজনীয় সে-সম্পদের

সন্ধান দিতে হবে। এটম্‌-বোমার সাহায্যে কতভাবে মানুষকে মারা যায় সে জ্ঞানেরও সন্ধান দিতে হবে গ্রন্থাগারকে। কেননা গ্রন্থাগার নিরপেক্ষ !

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নামে এমনিধারা উদ্দেশ্য নিয়ে কি ধূম্রজালই না সৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিম দুনিয়ায়। আসলে কিন্তু এই নিরপেক্ষতা মোটেই নিরপেক্ষতা নয়। নিরপেক্ষতার ভান করে এই সব দেশের অধুনা চালু সামাজিক ব্যবস্থাকে স্থিরতা দেবার পরোক্ষ সাহায্য মাত্র।

কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে নিছক জ্ঞান বিতরণের পবিত্র কর্তব্য ছাড়াও সত্যসত্যই আরেক উদ্দেশ্য আছে গ্রন্থাগারের। সমাজ বিবর্তনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা তার এক মহান দায়িত্ব। বিখ্যাত এক গ্রন্থাগারিক (সেয়ার্স) কোন এক গ্রন্থাগারের জন্য কুশলী কর্মী বাছাই করার সময় প্রার্থীকে দুটি প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কি মানুষকে ভালবাস ? তুমি কি বই ভালবাস ? এইখানেই গ্রন্থাগারের মহান দায়িত্বের মূল্য উৎস। মানুষকে ভালবাসলেই তার আপন মর্যাদা ও আপন অধিকারের অভিযানে মানুষকে ঋজু হয়ে দাঁড়াবার সাহায্যের কথা আসে, মানুষের কাছে তার সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তির পথের সন্ধান ও সূত্র তুলে ধরবার কথা আসে।

গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা আমাদের দেশের আধুনিক গণ-সংগঠনকারীদের কিন্তু ভুলবার কথা নয়। পরাধীনতার যুগে আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের একদা বড় ভিত ছিল গ্রন্থাগার। সে গ্রন্থাগার যত ছোটই হোক না কেন, ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রায় সকল শহর ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে। অনেক স্থায়ী গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল অবশ্যই ; তাদের ঘর ছিল, আলমারি ছিল, বইও হাজারের উপরে উঠেছিল এবং নিয়মকানুন পালনের জন্য বিধিবদ্ধ খাতাপত্রও ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে গ্রামে ও শহরে যে প্রায় ৪০০০ হাজার গ্রন্থাগার নথিভুক্ত আছে, তার মধ্যে ৬০০শ'র মত গ্রন্থাগার পত্তন হয়েছিল ১৯৪০ সালের মধ্যে এবং তা বাঙলার স্বাধীনতা ও বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, তখন গোটা বাঙলায় বিপ্লবী সংগঠনগুলি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হাতে হাতে মোট যে গ্রন্থাগার পেঁছে দিয়েছিল তার সংখ্যা অপরিমেয়। এই গ্রন্থাগারগুলি কলেবরে ছিল বোধ হয় নগণ্য—হয়ত মাত্র ৫০, ৬০ বা খুব বেশি হলে ১০০ খানা বই। কিন্তু এই গ্রন্থাগারের পাঠক ? সে যুগে স্কুল কলেজের এমন কোন যুবক ছিল না বোধহয় যার হাতে এই বই পেঁছয়নি। মনে পড়ে পূর্ব বাঙলার সুদূর গ্রামান্তরে বসে

১৯২৬ সালে এমনি এক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে 'Problems of Leninism' পড়েছিলাম প্রথম। এই গ্রন্থাগারগুলির আসবাবপত্র বলতে ছিল—কাপড়ের পুঁটলি; না হয় বড়জোর একটা টিনের বাক্স।

তা হোক, পাঠক ও পুস্তককে একত্র করাই যদি গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, মানুষকে আপন মর্যাদায় উঠে দাঁড়াবার সূত্র যোগানই যদি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অন্যতম দর্শন হয়, তাহলে এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলির অবদান অসামান্য। এই যুগে দৌলতপুর সত্যাশ্রম গ্রন্থাগার, বরিশালের শঙ্করমঠের গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগরের সাধনা-গ্রন্থাগার, শান্তিপুরের কল্যাণসঙ্ঘ গ্রন্থাগার প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থাগারগুলি হয়ে উঠেছিল গোটা বাঙলায় বিপ্লবী চিন্তাধারার বাহক এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলির কেন্দ্রবিন্দু। এদের স্মৃতি আজও অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভুলে যাবার কথা নয়।

চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'Library on the backs' আন্দোলন আজও ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চীনের পশ্চিমাঞ্চলে 'লঙ মার্চের' ৬০০০ মাইল দীর্ঘ অভিযানে পাহাড়ী অঞ্চলের উপত্যকায় বিপ্লবী চীনেরা পিঠে বেঁধে চলমান গ্রন্থাগার পৌছে দিয়েছিল অগণিত মানুষের কাছে।

পুঁটলিতে বাঁধা গ্রন্থাগার অথবা পিঠে বাঁধা গ্রন্থাগারই অনেকখানি উদ্দীপ্ত করেছিল ভারতে ও চীনে পরাধীন মানুষের স্বাধিকারের সংগ্রামে ও আন্দোলনে। আপন দেশের ঐতিহ্যে প্রাপ্ত এমন ক্ষুরধার হাতিয়ার কেন যে আধুনিক গণ-সংগঠনগুলির কাছে অবহেলিত হয়ে আছে তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

কথা উঠতে পারে, আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ তো নিরক্ষর। তাদের কাছে গ্রন্থাগার পৌছে দেবার কথা তুলে লাভ কি! তার সোজা উত্তর—এই নিরক্ষতা দূর করাও যে গণ-সংগঠনগুলির এক মহা দায়িত্ব। আর যারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ এক-আধটুকু করেছেন, তারা জানেন বিনা গ্রন্থাগারে নিরক্ষরতা দূর করা যায় না। বয়স্করা যেমন তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন, তেমনি তাড়াতাড়ি ভুলেও যান, যদি না তাঁদের বইয়ের খোরাক জোগানো যায়।

গণ-সংগঠনকারীদের আরেকটি কারণে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বিষয়ে আগ্রহী ...ভাবিক। এমনিভাবে ছোট ছোট চলমান গ্রন্থাগার দূর-দূরান্তে মানুষের ... দেবার কাজ সংগঠিত করতে গেলেই গণ-সংগঠনগুলি নিজেও

অধিকতর সংগঠিত হয়ে ওঠে। দূর দূরান্তের বিচ্ছিন্ন ঘাঁটিগুলি নিজেও মজবুত হয়ে ওঠে, তেমনি কেন্দ্র ও অন্যান্য ঘাঁটিগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতাও কমে আসে একটা দৈনন্দিন সাধারণ কাজের সূত্রে। রুশ-বিপ্লবের প্রথম যুগে লেনিনের 'ইস্ক্রা' সম্পর্কে এ বিষয়ের উক্তিগুলি স্মরণে রাখলে আমাদের সঠিক পথের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে 'what is to be done ?'।

আমাদের দেশ এখন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে। সমাজতন্ত্রের চেতনা প্রায় সর্বব্যাপক হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে, প্রায় সবাই আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলে। সমাজতন্ত্র কী এবং কোন্ পথে—তা নিয়ে নানা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা চলেছে নানাভাবে। সেইজন্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজ ও তার বৈজ্ঞানিক পথ দ্রুত তুলে ধরা আবশ্যক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। এ কাজের অন্যতম হাতিয়ার গণ-সংগঠন এবং পুস্তক-পুস্তিকা। আর গ্রন্থাগার সেই পুস্তক-পুস্তিকার বাহক। সেই জন্যেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে উদাসীনতাকে কষাঘাত করার সময় এসেছে।

চিত্তরঞ্জন দাশ

এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ এটা এমন একটা আন্দোলন যা দেশের এক প্রাথমিক প্রয়োজনের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনারা এ বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থলে এবং কংগ্রেস সপ্তাহে আপনাদের তৃতীয় সম্মেলন আহ্বান করে বিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছেন। এর ফলে আপনাদের আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে এবং আমাদের দেশের অধিক সংখ্যক চিন্তাবিদ্ ও দরদী আপনাদের এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন, যা অন্য উপায়ে সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, যখন দেশ ও জাতির স্বার্থে সমগ্র জনশক্তি নিয়োজিত, যখন তীব্র আন্দোলন এবং কঠিন সংগ্রাম চলছে, তখন আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিপথে থাকা একান্ত আবশ্যক, কারণ আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য জাতিগঠন, কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা দখল নয়। স্বরাজ সম্বন্ধে এই মতবাদই আমি বরাবর পোষণ করে এসেছি এবং যাঁরা স্বরাজ বলতে কেবল স্বায়ত্বশাসন, এমনকি সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝান তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। জনসাধারণ যাতে জাতিগঠনের কাজকে সহজ উপায়ে সম্ভব করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই একজন রাজনীতিকের কর্তব্য এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে হাতিয়ার বিশেষ। আমাদের কর্তব্য মহান, কিন্তু কঠোর। রাজনৈতিক অক্ষমতার জন্য আমাদের দেশে জাতিগঠনের কাজ স্বাধীন দেশগুলির থেকে অধিকতর কঠোর, কারণ জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্য আমরা আমাদের প্রয়োজনমত নিয়োগ করতে পারি না। সুতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের পরিকল্পনাগুলি হওয়া উচিত আত্মনির্ভরশীলতা-মূলক এবং আমার মনে হয় একথা আমাদের ভালভাবে বোঝা দরকার যে আমাদের একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য স্বাবলম্বী হওয়া এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সাহায্য ছাড়াও নিজেদের সম্পদকে কাজে লাগানো আজ কতখানি প্রয়োজন।

আপনাদের আন্দোলন এখন শৈশব অবস্থায় আছে। সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের বয়স তিন বছর বলেই আমি একথা বলছি না, আমার একথা বলার কারণ এই যে, বাস্তব ফলাফলের মূল্যায়ণে দেখা গেছে যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আজও যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। এখন জাতির গৌরবময় অতীতের কথা বলা ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্বসূরীদের কীর্তিকলাপের উল্লেখ আরও ক্ষতিকর। কিন্তু আমরা আমাদের অতীত বিদ্যাপ্রীতির কথা স্মরণ না করেও পারি না। বারাণসী, তক্ষশীলা অথবা পাটলীপুত্রের মত মহান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতেই যে কেবল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল তা নয়, ভারতের প্রতিটি মন্দিরেই ছিল জ্ঞানের অধিষ্ঠান। গ্রীসের মত ভারতবর্ষেও সর্বসাধারণের সমাবেশের স্থানগুলি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। জনসাধারণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই সমস্ত জায়গায় মিলিত হয়ে গ্রামের বিদ্বান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। যখন গ্রীস ও রোমে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা নির্বাপিত হয়েছিল এবং অজ্ঞতার অন্ধকার ইউরোপকে ঢেকে ফেলেছিল, তখন আলোর জন্যে ইউরোপকে তাকাতে হয়েছিল প্রাচ্যের দিকে এবং এই প্রাচ্য-সংস্কৃতি বিশেষ করে, মুসলিম-সংস্কৃতিই ইউরোপের নবজাগরণে সাহায্য করে ইতিহাসে আধুনিককালের সূচনা করেছিল। কেবলমাত্র সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেই সে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে পথ দেখিয়েছিল ত' নয়, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী খলিফারা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু আজকে আলোর জন্যে আমরা তাকিয়ে আছি পশ্চিমের দিকে এবং সত্যের খাতিরে ও নিজেদের স্বার্থেই আজ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুসংগঠিত করার দিক থেকে আমরা অনেক পশ্চাদপদ্। পশ্চিমী শিক্ষাপদ্ধতি পুরোপুরি আমদানী করার এবং এখানকার মত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তার অন্ধ অনুকরণ করার পক্ষপাতি আমি নই। অন্যদিকে ইউরোপে এমন ব্যবস্থা আছে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশংসার যোগ্য। বর্ধিত জনসংখ্যা, মুদ্রণযন্ত্র প্রসূত প্রকাশনের সংখ্যাধিক্য, পৃথিবী দূরতম স্থানগুলির মধ্যে এবং ভারতবর্ষের শহর ও গ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার মত যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি কারণে জনশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং পুরানো পদ্ধতিতে এর সমাধান আর সম্ভব নয়। আর একটা কথা

এই যে আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুযোগ স্বাভাবিক কারণেই অনেক কমে গিয়েছে। ইউরোপে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি স্বয়ং-শিক্ষার পথ সুগম করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগারের অভাব এইটাই প্রমাণ করে যে, আমরা আমাদের জনসাধারণকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছি। গ্রন্থাগারগুলি কেবলমাত্র পুস্তক-ভাণ্ডার নয়। শুধুমাত্র যাঁরা বিদ্যা অর্জনের জন্যে আসেন তাঁদের জন্যেই নয়, স্থানীয় সর্বসাধারণের জন্যেই গ্রন্থাগারগুলি পাঠ্যাভ্যাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদিও প্রায়শই গ্রন্থকারদের বিদ্রূপ করা হয়, কিন্তু ভাল গ্রন্থের প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য এবং আশাকরি মিল্টনের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিলে কেহই গ্রন্থকীট হওয়াকে দোষারোপ করবেন না। সেই উক্তিটি হল, "একটি ভাল গ্রন্থ একটি মহান আত্মার জীবশোণিতস্বরূপ যা আগামী জীবনের জন্যে সংরক্ষিত হয়।" অবশ্য একথা ঠিক যে যদিও প্রতিনিয়ত অনেক অকেজো বই মুদ্রিত হচ্ছে, কিন্তু ভাল এবং তথাকথিত বাজে বইয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সীমারেখা টানা সব সময় সম্ভব হয় না।

আমি আপনাদের আন্দোলনের সঠিক সাফল্য কামনা করি এবং আন্তরিক-ভাবে আশা করি যে আমাদের শহর ও গ্রামগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে আপনাদের এই আন্দোলন যথাযোগ্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। জ্ঞানের দরজা বন্ধ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। জ্ঞান যে ক্ষমতা আমাদের দিয়েছে তা প্রত্যেকের আয়ত্বাধীন করে তোলাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

লাইব্রেরী আন্দোলন

সুশীলকুমার ঘোষ

লাইব্রেরী আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন। যাহাতে শিক্ষার বীজ জনসাধারণের মনে অতি সহজে বপন করিতে পারা যায় তাহার প্রচেষ্টা লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষিত সমাজে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে অল্প আয়াসে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সভ্য জাতি মাত্রেই এখন বিশেষ সচেষ্ট।

কোন আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহা একাকী করাও চলে, পরকে লইয়া করাও যায়। তবে যে কার্য্য পরকে লইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে একাকী তাহা লইয়া থাকিলে চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে ফুটাইতে চাই, তাহা পরিপুষ্টির জন্য লোকমতের প্রয়োজন। যে প্রথা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার কামনা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনসাধারণের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে চালাইতে হইলে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে কোন আদর্শ কোন এক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা যেরূপ কার্য্যকরী হয়, স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেরূপ ফল কামনা করা দুরাশা মাত্র। এইজন্য দেখা যায় সমবেত চেষ্টায় Froebelian Movement-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ Kindergarten পদ্ধতি দ্বারা বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্য Shakespeare S১ciety একত্র সমাবেশে অমর কবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী আলোচনার জন্য ও ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত অতীত মহিমা জাগ্রত রাখিতে বিশেষ ব্যস্ত। আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেছে কিসে লাইব্রেরীর সাহায্যে আপামর জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা যায়। লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য আমাদের দেশেও গ্রন্থালয় পরিষদ (Library Association) বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত অল্পদিন হইলেও বরোদা,

মহীশূর, মাদ্রাস প্রভৃতি দেশে ইহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "নিখিল ভারত গ্রন্থালয় পরিষদ" নাম দিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় গ্রন্থালয়গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ বাঙ্গালা দেশে লাইব্রেরীগুলির অবস্থার উন্নতিবিধান ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার লইয়াছে। যেখানে লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়ের সংখ্যা অল্প সে স্থানে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং যে স্থানে গ্রন্থালয় আছে, তাহার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা গ্রন্থালয় পরিষদের কর্ত্তব্য। ইহা কার্য্যেও পরিণত করিতে হইলে, প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ স্থাপন করা অতীব আবশ্যক। ঐ জেলা গ্রন্থালয়ের কার্য্য হইবে জেলার মধ্যে কতকগুলি লাইব্রেরী বা রীডিং রুম আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আর কোথায় কোথায় নূতন গ্রন্থালয় (Library) বা পাঠাগার (Reading Room) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধীনে অধুনা চারিটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ কার্য্য করিতেছে, একটি হুগলী জেলা, একটি মৈমনসিংহ, একটি নোয়াখালিতে আর একটি ২৪ পরগণায়।

লাইব্রেরী আন্দোলন এই কথাই দেশবাসীকে জানাইতে চায় যে লাইব্রেরীগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। পড়াশুনার চর্চ্চা, গবেষণার কার্য্য প্রভৃতি, যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান বলিয়া দিয়া সাধারণকে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি লাইব্রেরীর অন্যতম কার্য্য হওয়া উচিত। যাহাতে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক ছবি, chart, map motto বরোদা রাজ্যের লাইব্রেরীগুলির দেওয়াল পরিশোভিত করিয়া থাকে। যেন তাহারা অলক্ষ্যে পাঠক পাঠিকার হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সে motto-গুলি লাইব্রেরীর সভ্যতার নীরব ভাষায় বলিয়া দিতেছে —"যদি আনন্দ চাও, বই পড় আনন্দ পাইবে"। "যদি শিক্ষা চাও, বই পড় শিক্ষা পাইবে।" "যদি মানুষ হইতে চাও, বই পড় মানুষ হইবে"। বরোদা মহারাজের Library Department আমেরিকার মত, প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী পুস্তক সরবরাহ করে। বিনা আয়াসে বিনা পয়সায়, ঘরে বসিয়া যাহারা বই পায়, তাহারা বই না পড়িয়া ছাড়ে না। এইরূপে ক্রমশ পাঠের নেশা জমিয়া গেলে, তাহারা আপনই পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করিবে এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পুত্র-কন্যাদের পুস্তকপাঠে উৎসাহ দিবে।

মহীশূর রাজ্যের সাধারণ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আরও চমকপ্রদ। সেখানে লাইব্রেরীগুলিকে এরূপ এক আকর্ষণের কেন্দ্র করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সকলেরই মন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অতি সযত্নে ঐখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালোর Central Public Library-তে যে সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক লাইব্রেরীর আদর্শ হইতে পারে। তথায় আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রকার লোককে সুবিধা দিবার জন্য লাইব্রেরীটি এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত :—পাঠাগার বা Reading Room ; Lending Section ; Children's Department (তরুণ বিভাগ) ; Ladies' Department (মহিলা বিভাগ) ; Reference Section ; এমন কি স্নানাগার ও ভোজনাগার পর্য্যন্ত। মহীশূরবাসীদের শিক্ষা প্রচার স্পৃহা এত প্রবল যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা Vernacular language-এর সাহায্যে শিক্ষা প্রচার করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নানাপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্বসাধারণের সুবিধামত Classification-এর পদ্ধতি এবং বিষয় অনুসারে পুস্তক বিভাগ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণামূলক পুস্তক তাহারা প্রায়ই প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন প্রতি মাসে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলিকে পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। লাইব্রেরী পরিচালনা সুকৌশলে সংসাধিত করিবার জন্য, নিয়মিতরূপে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধারণ পাঠাগারে কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, এখনও দেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উচিৎ মত রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি অতি সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিৎ। ব্যক্তিবিশেষের যত্ন বা আগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ পাঠাগারগুলি যদি এ সকল সংরক্ষণের ভার লয়, তাহা হইলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ কালের কবল হইতে রক্ষা পায়। কোথায় কোন গ্রামে, লোকচক্ষুর অন্তরালে কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণের গোচর করিতে পারা বা পুনরায় সুবিধা করিয়া দেওয়া ততোধিক লোকহিতকর। এই সংবাদ ও প্রকাশের ফলে

গবেষণাকারী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রয়োজনমত পড়াশুনা করিয়া সেইগুলি হইতে নানা তথ্য আহরণ করিতে পারেন। সেগুলি পুনঃপ্রচারে উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। নব জীবন লাভ করিয়া উহারা নানাবিধ জ্ঞানরত্নের অপূর্ব আকরস্বরূপে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধনের নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া ও সযত্নে সংরক্ষণ ও সুবিধামত প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

লাইব্রেরীর কাজ পড়াশুনার নেশা জাগানো। যাহার যেদিকে রুচি সেই মত পুস্তক তাহাকে দিতে পারিলে জনসাধারণ লাইব্রেরীর দিকে ছুটিয়া আসিবে। আত্মার সন্তুষ্টিবিধান যাহার নিকট হইতে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, মানব-মন সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুবকহৃদয় কাব্যকলা, সাহসিকতা, উন্মাদনা, ভ্রমণেচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মনোবৃত্তির অধিক বশবর্তী বলিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানব মনের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া অধুনাতম শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ যাঁহারা সম্প্রতি Behaviourist আখ্যা পাইয়াছেন তাঁহারাও এ সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অতএব বুঝিতে পারা যায়, যুবকদের পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল পুস্তকে পূর্বলিখিত প্রবৃত্তি বিশদরূপে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি লাইব্রেরীতে সংগৃহীত করিতে পারিলে, যুবকদের দল লাইব্রেরীর নেশা কোনও মতে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তিকে যদি লাইব্রেরীয়ান করা যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু আগন্তুকের পাঠেচ্ছা, লাইব্রেরীতে আসিলে, ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। কোন্ পুস্তকে কি কি সংবাদ পাওয়া যায়, সাধারণভাবে তাহা লাইব্রেরীয়ানের জানা যেরূপ প্রয়োজন, কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কোন্ কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, লাইব্রেরীয়ানকে তাহারও সদুত্তর দেওয়া চাই। সেইখানে লাইব্রেরীয়ানের কৃতিত্ব।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলন

তিনকড়ি দত্ত

ভারতের লাইব্রেরী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের স্পেন গমনের কথা শুনিয়া অনেকেই আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলনের ও সংঘের সম্বন্ধে সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিকের হাতে গড়া দেশ জেকোশ্লাভাকিয়ার কথা আপনারা বোধ হয় জানেন। সেখানেই প্রথম ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলন (International Conference of Librarians and Book-Lovers at Prague) আহুত হয় ও বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সমিতির (National Library Associat.on) একযোগে কাজ করিবার জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়। পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও আন্তর্জাতিকজ্ঞান সমৃদ্ধি সংসদের (International Institute of Intellectual Co-operation) সহিত সহযোগিতা করাই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যুক্ত রাষ্ট্রের আটলান্টিক সিটিতে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের পঞ্চাশৎ বার্ষিক জুবিলী অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনকে অনুরোধ করা হউক এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া অন্যান্য দেশের প্রতিষ্ঠানের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে।

তৎপর বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে এডিনবরা সহরে ব্রিটীশ লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের জুবিলী অধিবেশন হয়। সেখানে ১৩টি দেশের প্রতিনিধি সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সমিতি (International Library and Bibliographical Committee) গঠন করেন। স্থির হয় যে পাঁচ বৎসর অন্তর আন্তর্জাতিক সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। ১৯২৯ বা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সম্মিলন আহুত হইবে।

ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্ট প্রথম সম্মিলন ইটালিতে আহ্বান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তদনুসারে প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার

সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ১৫ জুন তারিখে ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্টের সেনেট কক্ষে এক সহস্র প্রতিনিধি, রোমের শাসনকর্তা ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের উপস্থিতিতে সিগনর মুসোলিনী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :—

"Italy looks forward to a greater diffusion of knowledge and culture by means of the most careful preservation of literary artistic and historical treasures.

I see here convened the representatives not only of the culture of European nations, but also those from America and from Far East I see prominent persons in the bibliographical field and directors of the richest and most celebrated libraries of the world, especially the cordial support of His Holiness Pope Pius XI, a master in this field of studies."

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে পোপ একাদশ পায়স পূর্ব্বে ভাটিকান গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং তিনি গ্রন্থাগারের প্রতি সবিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন।

সিগনর মুসোলিনী সম্মিলন উপলক্ষ্যে রোম, নেপল্‌স্, ফ্লোরেন্স, বোলোনা, মডেনা ও ভেনিস সহরে যে পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিষয় বলেন : –

"There have been organised numerous bibliographical exhibits which will give you a complete historical picture of the cultural and artistic development of Italy throughout the centuries.

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সমিতির সাধারণ অধিবেশন নিম্নলিখিত স্থানে হইয়াছে :—

১ম অধিবেশন—রোম, ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৮ খ্রীঃ; ২য় অধিবেশন—রোম, ফ্লোরেন্স ও ভিনিস, জুন ১৯২৯ খ্রীঃ; ৩য় অধিবেশন—ষ্টকহলম, ২০শে আগষ্ট ১৯৩০ খ্রীঃ; ৪র্থ অধিবেশন—চেলটেনহাম, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩১ খ্রীঃ; ৫ম অধিবেশন—বার্ণ, ৯ই জুন ১৯৩২ খ্রীঃ; ৬ষ্ঠ অধিবেশন—চিকাগো, ১৪ই অক্টোবর

ও অ্যাভিগনন, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৩ খ্রীঃ; ৭ম অধিবেশন—মাদ্রিত, ২৮শে মে ১৯৩৪ খ্রীঃ।

বর্ত্তমানে সমিতিতে ২৪টি রাষ্ট্রের নাম আছে। ভারতবর্ষও এবার যোগদান করিল। আশা করা যায় যে জাপান ও চীনের ন্যায় ভারতবর্ষও বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে ও ভারতীয় প্রতিনিধি কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সম্মিলনে যোগদান সফল হইবে।

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন

বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি বহুকাল যাবৎ। এবিষয়ে এখনও অনেকের মন মান্ধাতার আমলের ধারণায় আচ্ছন্ন। একশ্রেণীর মতে গ্রন্থাগারিক হবেন নিরীহ গোবেচারা পণ্ডিত গোছের ব্যক্তি—তালা-চাবিমারা কদাচ ব্যবহৃত বইপত্তরের কড়া পাহারা দেওয়াই হবে যাঁর কাজ।

আর এক দল আবার গ্রন্থাগারিকের পাণ্ডিত্য থাকারও কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁদের মতে গ্রন্থাগারিকের বইয়ের মলাটটা পড়বার মত বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। বার্লিনের লর্ড মেয়র এই মতটিরই কথা বলছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও যদি এ ধারণা বদ্ধমূল থাকে তাহলে তার জন্যে গ্রন্থাগারের হর্তাকর্তা পরিচালকরাই দায়ী হবেন—কারণ তাঁরাই নির্ধারিত করেন গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত লোক হবেন, না শুধু মোটামুটি লিখতে পড়তে জানা লোক হবেন। এ বৃত্তিজীবিদের সেজন্যে দোষারোপ করা চলে না। মেয়র মশায়ের ভাষণ তিরিশ বছর আগের এক ঘটনার কথা আমায় মনে পড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমাকে নিয়োগের সময় ঘটে। কমিটির জনৈক সদস্য আমার গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি জবাব দিই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপনা করি। তাতে তিনি বলেন—অঙ্কের অধ্যাপক দিয়ে কোনও কাজই হবে না। তাঁদের ধারণা ছিল যে গ্রন্থাগারিক এমন একজন হওয়া দরকার যিনি পোকামাকড়ের উৎপাত দমনে সিদ্ধহস্ত। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে মারাত্মক পোকামাকড়ই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যখন দেখলাম যে সে চাকরির আমার কোনও আশা নেই, তখন মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম যে, কমিটি চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে পোকামারার আবশ্যিক গুণ থাকা চাই—কথাটা জানিয়ে দিলে ভাল করতেন।

যাক, সে-সব দিন চিরতরে বিদায় নিয়েছে। ইতোমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সমাজ-জীবনে এ-বৃত্তি নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। জ্ঞান-বিদ্যা গ্রন্থাগারিকের অবশ্যই থাকা চাই—এতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না—তবে তাঁর পারদর্শিতা থাকা চাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে। হ্যাঁ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলে একটি

বিজ্ঞান বিদ্যমান—গত দু'পুরুষ ধরে তা গড়ে উঠেছে। এবিষয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিজীবিরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাদি করেছেন। গ্রন্থাগারিকের সমুদয় ধ্যান-ধারণা, সময় ও শ্রম অতিবাহিত হয় নানা সুব্যবস্থিত পদ্ধতির উদ্ভাবনে, যাতে সর্বসাধারণ গ্রন্থাগারমুখী হয় ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থরাজির সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বড় গ্রন্থাগারে বইপত্তর চুরি-চামারির জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে এজন্যে বিশেষ ধরণের লোক নিযুক্ত থাকে। তাব জন্যে গ্রন্থাগারিককে তলব করা হয় না। ঠিক তেমনি পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে ঝাড়ামোছার কাজের জন্যে বড় গ্রন্থাগারে ভিন্ন লোক থাকে। পৌরভবন তদারক করতে যেমন মেয়রকে ডাকা হয় না, গ্রন্থাগারের সর্বধরণের কাজে গ্রন্থাগারিককে সক্রিয়ভাবে আশা করাও তেমনি অসঙ্গত।

একটা কথার পুনরুক্তি করি যে আজকের সমাজ-জীবনে ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সর্বোচ্চস্থানীয়। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ই তার একটা প্রমাণ।

মানুষের গ্রন্থ ব্যবহারের সকল বাধাই দূর করতে হবে। তার জন্যে পাঠকদের সরাসরি তাক থেকে নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী বই বেছে নেবার সুযোগ দিতে হবে। অবাধ-অধিগম্য (Open Access) ব্যবস্থা সম্মেলনের একটি আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা চালু করুন—এটাই এ সম্মেলনের অভিমত। আমার পরবর্ত্তী বক্তা অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার উপযোগী গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ সম্পর্কে বলতে উঠবেন। প্রসঙ্গতঃ বলি যে আগেকার আমলে যখন গ্রন্থাগার ভবনের প্ল্যান করা হ'ত সে সময় গ্রন্থাগারিকরা হতেন এক একজন সুদক্ষ গ্রন্থ-রক্ষক। বইপত্তরও থাকত কম। সাক্ষর লোকের সংখ্যা সে সব দিনে কম ছিল বলে পাঠক সংখ্যাও ছিল খুব কম। বলা বাহুল্য সে যুগে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে যেসব গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয় বর্তমানে তা অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তরায় হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা চালু করার সদিচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই গৃহ সম্পর্কিত অসুবিধার দরুণ তা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। আমার পরে যে বক্তা আসছেন তাঁকে তাই আগে থাকতেই এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঞ্চম নীতির (Fifth Law of Library Science) সার কথাই হ'ল যে গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধনশীল

প্রতিষ্ঠান, আর বর্ধন বলতে বোঝায় পরিবর্তন। পরিবর্তন প্রগতিমূলক ও স্থায়ী হবে একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনশীল— স্রোতস্বিনীব ন্যায় তার কর্মপ্রণালী প্রবাহিত।

আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যে গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আজকের দিনে আমাদের নব পরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে তা একেবারেই অচল— একথা আপনারা খুব ভাল ভাবেই অনুভব করেন। তাই বলি যে এখন যেসব গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হচ্ছে তা যেন এমন ভাবেই হয় যাতে এগুলি একশ' বছর পরে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তার প্রতিবন্ধক হিসেবে না দাঁড়ায়। তার জন্যে বাড়ীগুলো হয়ত আপাতদৃষ্টিতে শ্রীহীন ঠেকতে পারে। তবে এখন যেসব বিধি বন্দোবস্ত হবে তা বেশ কিছুকাল বিস্তর সমস্যার সুরাহা করে দেবে অন্ততঃ আগামী দিনের সম্ভাব্য পরিবর্তন এখনই আমরা যতটা আঁচ করতে পারছি। তা'বলে ভবিষ্যতে কি অদল বদল হবে তার স্বরূপ এখনই সুনিশ্চিতভাবে আন্দাজ করা সহজ ও সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চম নীতি সম্ভাব্য পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহ নির্মাণের উপদেশ দেয়। আগেকার আমলের প্রাসাদোপম গ্রন্থাগার গৃহ ইতস্ততঃ অব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় প্রায়ই। সেজন্যে মনে হয় যে গ্রন্থাগার গৃহের মেয়াদ শ'খানেক বছরের হলেই যথেষ্ট, তার জন্যে খরচও খুব বেশী পড়বে না আর একশ' বছর বাদে যদি বর্তমান গৃহটি নূতন অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন ঘটে তাহলে অর্থ অপচয়ের প্রশ্ন মনকে বিশেষ পীড়া দেবে না। পঞ্চম নীতির সার কথাই হচ্ছে যে, Build small and live big, build cheap and live rich.

মানসিক উৎকর্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এ উপলক্ষে না বলে থাকতে পারলাম না। কারণ যে বিশেষ সময়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তা খুবই স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখন ভারতে বুদ্ধের ২৫০০তম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভারতের মহান সন্তান্ গৌতমের নীতিকথা বিখ্যাত গ্রন্থ ত্রিপিটকে সংকলিত। জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে এই গ্রন্থ দেশ-দেশান্তরে চলে গেছে—প্রেম, প্রীতি ও শান্তির ললিত বাণী বহন করে নিয়ে গেছে জাপান হতে জর্ডান, সুমাত্রা থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে। তুর্কীস্থানে মরুভূমির নীচে অবলুপ্ত একদা সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে সম্প্রতি বহু অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থরাজির অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধ ও

বিশ্বমানবতার বাণী বিকীর্ণ করাই বর্তমানকালের গ্রন্থাগারিকের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থ জ্ঞানের আলোক বহন করে। তমসাচ্ছন্ন মানব মনে জ্ঞানালোকের প্রজ্বলন; আন্তর্দেশিক হিংসা, ভীতি, বৈরিতা ও অশান্তির নিরসন সাধন ও সর্বদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহ-অবস্থান মনোভাবের উন্নতির শ্রেষ্ঠতম সহায়ক হল গ্রন্থ। তাই আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে কুশলী গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পদমর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়।

সমাজ ও মানবতার দৃষ্টিকোণে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ইতিকর্তব্য বেদের একস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত আছে :

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।

গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় কলাকৌশল

সতীশচন্দ্র গুহ-ঠাকুর

শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশে নানাবিধ শিক্ষায়তন, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলে-মেয়ের সংখ্যাধিক্য হইলেই যে প্রকৃত শিক্ষা অগ্রসর হয় না, এ কথা বোধ হয় আজকালকার দিনে কেহ অস্বীকার করিবেন না। জ্ঞানের পিপাসা যদি না বাড়িল, বিদ্যার সহিত বিদ্যার্থীর চিরজীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না ঘটিল, তবে ত শিক্ষা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিষ! গ্রন্থাগার ও নিরীক্ষণাগার প্রভৃতির ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠে,—পাস করার ভিতর দিয়া নহে। স্কুল-কলেজ এবং পরীক্ষা ছাত্রের ঔৎসুক্য বাড়াইয়া দিবে মাত্র।

কিন্তু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের জন্য আমাদের দেশে যতটা আগ্রহ চেষ্টা ও অর্থব্যয় দেখিতে পাই, গ্রন্থাগার ও পঠনাগারের জন্য তার সিকি ভাগও পাই না। যে-সকল গ্রন্থাগার দেশের ভিতর রহিয়াছে, তাহার একটা তালিকা পর্য্যন্ত আমরা দিতে পারি না। কিন্তু স্কুল-কলেজগুলির সব রকমের বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ সংগৃহীত হয়। সমবেত চেষ্টার অভাবে গ্রন্থাগার-পরিচালন একটা কষ্টকর ব্যাপাই বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা স্কুল-কলেজ পরিচালন অপেক্ষা সহজসাধ্য, অথচ উপযোগিতায় ইহার ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত। স্কুল-কলেজ মানুষকে ছাড়িতে হয়, কিন্তু লাইব্রেরী কখনও ছাড়িতে নাই।

বরোদা-রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড় ঐ কথাটি উপলব্ধি করিয়া নিজ রাজ্যে বহু অর্থসাপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী-স্থাপনের দিকে বেশী মন দিলেন। সেই লাইব্রেরীগুলির ভিতর দিয়া কত-ভাবে বরোদা-রাজ্যের জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে মানসিক উন্নতিসাধন করিতেছে, নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য বা অপরবিধ বৃত্তির পরিপোষক কত নূতন তথ্য পাইয়া অনুশীলনাদি দ্বারা লাভবান হইতেছে। তার পর, কথা-সাহিত্যাদির ভিতর দিয়া নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অক্ষরজ্ঞানহীন দিনমজুরও চিত্রাদি দেখিয়া কত শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিতেছে।

এবম্বিধ উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের ভিতর কেন যে ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে না, তাহার নানাবিধ কারণ রহিয়াছে। সকল দিক্ দিয়া সেগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। সে-সকল বাধা কর্ম্মিগণের কলা-কৌশলের অভাবে ঘটিতেছে, আজ কেবল তাহারই কয়েকটি মাত্র আলোচনা করিব। এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে না, কর্ম্মিগণই সমবেত হইয়া এগুলির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দুই

বিভিন্ন দেশের ক্যাটালগ বা গ্রন্থাগার সূচি-পত্রাদি একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে, এক একটা পদ্ধতি অনুসারে সেগুলি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম দেশে ইউরোপ ও আমেরিকায় ত ইহার এক পরম্পরাক্রতু বা ট্রেডিশন সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে যে-কোন একটা লাইব্রেরীর ক্যাটালগ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইলে অপর যে-কোন লাইব্রেরীর নিয়ম-কানুন এবং ক্যাটালগ বুঝিতে কাহাকেও বড়-একটা বেগ পাইতে হয় না। বর্ণানুক্রমিক সূচীতে সে দেশে উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নাটক খুঁজিতে গিয়া কেহ প্রথমে 'উইলিয়ম' নাম হাৎড়াইবে না,—সকল লাইব্রেরীই 'সেক্সপীয়র, উইলিয়ম' এইভাবে বর্ণানুক্রম করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের 'গীতা-রহস্য' গীতা বিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে রাখা হইবে বটে, কিন্তু কোনো গ্রন্থাগারে উহা তিলক, বালগঙ্গাধর, এই অনুক্রমে রাখা আছে, আবার কোনো গ্রন্থাগার—বা 'বালগঙ্গাধর তিলক" এই ভাবে রাখিয়াছে।

তিন

লিখিত ভাষার জন্য পৃথিবীতে যে-কয়টি লিপি ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে রোমক লিপিই প্রধান। প্রাচ্য দেশের সংস্কৃত, পালি, ফারসী, চীনা, তিব্বতী, জাপানী, প্রভৃতি ভাষায় অনেক বই তাহারা রোমক লিপিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই লিপ্যন্তর প্রণালীর একটা সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা তাহারা করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় প্রধান লিপি বিজ্ঞানসম্মত অকারাদি হকার পর্য্যন্ত দেবাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কোনো ইংরাজী বা ফরাসী শব্দ ভারতীয় লিপিতে লিখিতে গেলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়; কারণ সুনির্দ্দিষ্ট লিপ্যন্তর প্রণালীর অভাব। লিপি রোমক

লিপিতে পরিবর্ত্তিত করিবার রীতি অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ভিতরই নানা স্থানে নানা জনে নানা রকমের প্রণালী ব্যবহার করিতেছে। এই ত দেখুন,—সদ্যপ্রকাশিত 'স্পিরিট অব বুদ্ধিজ্‌ম্‌'-এর গ্রন্থকার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্সেলর স্যর হরি সিং গৌড় মহাশয় আবার একটি অভিনব প্রণালীর উদ্ভব করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বুদ্ধ' কথাটি রোমক লিপিতে 'Buddh' হইবে (Buddha নহে); 'অশোক' শব্দটি তিনি লিখিবেন 'Ashoke' (Asoka নহে); এমন কি, 'জাতক' কথাটি তাহার মতে Jastak (Jataka নহে)—এই ভাবের লিপ্যন্তর প্রণালী তাঁহার ত্রিংশৎ শিলিং দামের প্রকাণ্ড পুস্তকে চালাইয়া নিজের লেখা স্থানে স্থানে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির যে প্রণালী, কাশ্মীর সংস্কৃত সীরিজে ঠিক সেইটি দেখিতে পাই না; ত্রিবন্দ্রম্‌ সীরিজ, নির্ণয়সাগর প্রেস বা পাণিনি আপিসের বই—এদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বৈষম্য রহিয়াছে। দেশে বিশিষ্ট পদ্ধতি আজিও গড়িয়া উঠে নাই, অথবা বিদ্বজ্জনসাধারণ গ্রহণ করে নাই। পালি ভাষার যাবতীয় পুস্তকাদি বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য দেশে রোমক লিপিতে ছাপা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে, যে, জার্ম্মানী হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সকল দেশে বিদ্বৎপরিষৎ সেই একই লিপ্যন্তর প্রণালী মানিয়া লইয়াছে।

চার

বইয়ের 'লেন-দেন' ব্যাপারে দেখুন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে। পুস্তক লইবার অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেলেও কোনো গ্রন্থাগারের পাঠককে স্বয়ং আসিয়া প্রতি 'লেন-দেন' কালে খাতায় সহি দিতে বাধ্য করে, যতগুলি বই লইবার অধিকার আছে, তার চেয়ে বেশী বই লইলেও অনেক সময় কোনো কোনো গ্রন্থাগার অসংস্কৃত নিয়মের ফলে ধরিতে পারে না। কোন্‌ কোন্‌ বই, এবং মোট ক-খানা বই এই মুহূর্ত্তে গ্রন্থাগারের বাহিরে রহিয়াছে, এবং তার ভিতরকার কোন্‌গুলি আজই ফেরৎ পাইবার আশা করা যায়, এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে ত একেবারে অসাধ্য-সাধন! ইউরোপ ও আমেরিকায় এ সব ব্যাপার নিতান্তই সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছে। যে-কয়টি চার্জিং সীষ্টেম রহিয়াছে (যথা একটির নাম নুআর্ক সীষ্টেম) তার প্রত্যেকটি কৌশলে ব্যাপারটি জলবৎ তরল করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও বরোদা, পাঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল কৌশল অবলম্বনে যথেষ্ট

ফল পাওয়া গিয়াছে। কার্ডের সাহায্যে, এই আপাতদুরূহ কার্য্য ঠিক যে তাস-খেলার মতন সহজ হইয়া গিয়াছে।

পাঁচ

ঐ সকল কলাকৌশল নিতান্ত সহজসাধ্য। অল্প চেষ্টাতেই অনুসৃত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত কষ্টকর বর্গীকরণ বিষয়ে, দেখিতে গেলে, আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়া আছি। কোন্ কোন্ এবং কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে পুস্তকগুলিকে ভাগ করিয়া রাখা হইবে, অর্থাৎ কি কি প্রধান বর্গ বা বিভাগ রাখা যায়, এবং তার অধীনে উপবর্গ অনুবর্গ প্রভৃতি কি হওয়া যুক্তিযুক্ত, এই বিষয় লইয়া আমাদের দেশের প্রত্যেক নব্য পুস্তকাধ্যক্ষকে এত মাথা ঘামাইতে হয়, যে, আরম্ভেই অনেকে রণে ভঙ্গ দেন। যাঁহারা সহজে ছাড়েন না, তাঁহারাও একাকী অন্ধকারে হাৎড়াইতে থাকেন এবং এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন যে, শেষে আর তাঁহাদের ধৈর্য্য থাকে না। দেশে এমন কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি আজিও গড়িয়া উঠে নাই যাহা অনেক গ্রন্থাগারে অনুসৃত হইতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে তিন চারিটি প্রধান পদ্ধতি রহিয়াছে তাহার সব ক'টিই অল্পবিস্তর বিজ্ঞান-সম্মত। উহার প্রত্যেকটি মূলতঃ ব্যক্তি-বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত হইলেও, বহু বিশেষজ্ঞের গবেষণার ফলে তাহার বর্ত্তমান আকার গঠিত হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিচালকগণকে সে সকল দেশে একটি মাত্র বর্গীকরণ পদ্ধতি বাছিয়া লইতে হয়, নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় না। আমাদের দেশেও এই সকল সুবিধা থাকা আবশ্যক।

ছয়

উপরে মাত্র চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১। নাম সূচী, (২) লিপ্যন্তর প্রণালী, (৩) পুস্তকাদি লেন-দেন ; (৪) বর্গীকরণ। মোটামুটি দেখিতে গেলে, ঐ সকল বিষয়েই আমাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, দেশের কর্ম্মিগণ আজিও সমবেত হইয়া ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন না। বিষয়গুলির গুরুত্ব কতখানি তাহা বিবেচনা করার সময় উপস্থিত। এই সকল কাজ সামান্য হইলেও বহুদিনের উপেক্ষার ফলে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট বাধার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

দেশের একটি নূতন পুস্তকাধ্যক্ষকে গ্রন্থকারাদির বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করিতেই যে কত রকমের সমস্যায় পড়িতে হয়, তাহার একটু বিশদ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোকমান্য তিলক মহারাজের "গীতা-রহস্য" 'তিলক' নামে রাখা হইবে, কি 'বালগঙ্গাধর' নামে রাখা হইবে, এই সামান্য কথার একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তর দেশের কোনো পুস্তকাধ্যক্ষ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না। অথচ উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নাম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত প্রথায় এদেশেও সকলেই পদবী ধরিয়া সূচি প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে কেহ বলিবে পদবী ধরিয়া সূচি কর, আবার অনেকে বলিবে নামের আদ্যাক্ষর ধরিয়া সূচি প্রস্তুত করাই নিরাপদ। পরিষদ গ্রন্থাগারে আদ্যাক্ষর ধরিয়াই করা হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলগুলি সাধারণ পদবী ধরিয়াই করা হয়, আবার দেশের ভিতরই অন্য কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আদ্যক্ষর দিয়া করে।

সাত

দেশীয় নামগুলির বিচিত্রতা অনেক। নিম্নে দশ রকমের উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতেছে।

(ক) সকল নামেই 'পদবী' অথবা 'বংশ-নাম' থাকে না। যথা,—(লালা) লজপৎ রায়, (বাবু) ভগবান দাস, (বাবু ৷ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (মৌলানা) মহম্মদ আলি। এই নামগুলির উভয়াংশ মিলিয়া এক একটি শব্দ হইয়াছে, শেষার্দ্ধগুলি বংশ-নাম বা উপাধি নহে। সুতরাং এমত অবস্থায় উভয়াংশ আলাদা করিয়া লিখিলে, মাঝে হাইফেন্ না রাখিলে বুঝিতে গোল হয়।

(খ) কতকগুলি পদবী সম্পূর্ণ নামটি হইতে বাছিয়া বাহির করা দুষ্কর। যথা ;—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত (গুপ্ত, না সেন-গুপ্ত ?), শ্রীজগদীশ দাস গুপ্ত (গুপ্ত, না দাস-গুপ্ত), শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (চৌধুরী, না রায় চৌধুরী ?), শ্রীভূদেব সিংহ রায় (রায়, না সিংহ-রায় ?), শ্রীরামভুজ দত্ত চৌধুরী (চৌধুরী, না দত্ত-চৌধুরী ?)।

(গ অনেক নিজ বংশ-নামের উৎপত্তিগত সংস্কৃত আকার ত্যাগ করিয়া অপভ্রংশের আশ্রয় লয়। যথা—মিশ্র, মিশির ; ত্রিবেদী, তিবারী : সিংহ, সিং ; মিত্র, মিত্তর (Mitter) ; চন্দ্র, চন্দর ; আবার,— উপাধ্যায়, ওঝা ; চট্টোপাধ্যায়, চাটুয্যে ; বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়ুজ্যে। এমন কি, পাল স্থলে পল (Paul),

মাইতি স্থলে মেজর (Major), লাহিড়ী স্থলে লউরী, সিংহ স্থলে সুইন্ হো। ব্যক্তিগত নামও এইরূপে নগেন্দ্র স্থলে লউগিন (Laugin) হইতেছে।

(ঘ) সম্মানসূচক উপাধি অর্জ্জন করিলে, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নাম হইতে বংশ-পদবী ছাড়িয়া দিয়া স্বোপার্জ্জিত উপাধিকেই বংশ-নাম রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য হইলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ হইলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত গীষ্পতি গুহ হইলেন গীষ্পতি কাব্যতীর্থ।

(ঙ) দক্ষিণ দেশে কেহ কেহ বংশ-নামের সঙ্গে নিজ নামের সংমিশ্রণে এক সংক্ষিপ্ত আকার এমনভাবে করিয়া লয় যে, তাহাই বংশ-নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। যথা—গ, অ, (=G. A.) নটেশ আয়ার হইলেন নটেশন ; বৈদ্যরাম আয়ার হইলেন বৈদ্যরমন ; স, (=S) গণেশ আয়ঙ্গার হইলেন গণেশন।

(চ) স্ত্রীলোকের নামের পদবী ত প্রায় সকল দেশেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র হইলেন বসু, শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত হইলেন মুখোপাধ্যায়।

(ছ) আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক ত বংশনামের ব্যবহার করিতেই চাহেন না। তাঁহারা মহিলাজনোচিত সাধারণ পদবী 'দেবী' 'বাঈ' প্রভৃতি শব্দকেই বংশ-নামের মতন ব্যবহার করেন। যথা, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ, শ্রীমতী সীতা দেবী। (বিবাহিত হইলেও ইঁহাদের বংশ-নাম পরিবর্ত্তিত হইল না)। সম্প্রতি অনেকে আবার বংশনাম রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতেছেন ; যথা, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

(জ) ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নামের আংশিক আমূল পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, অবশ্য ইদানীং দুই-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে দেখিতে পাই, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বেকার নাম পুরা বজায় থাকে ; যথা, মিঃ মার্মাডিউক পিকথল নাম আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, একটি বাঙালী ভদ্রলোক অবনীরঞ্জন ভট্টাচার্য নামের আংশিক পরিবর্ত্তন মানিয়া লইলেও পদবী ছাড়েন নাই। নূতন ধর্ম্মে তিনি আবদুল শোভান ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত।

(ঝ) আবার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ না করিয়াও যদি কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করেন, তবে প্রায়শ তাঁহার নাম বদলায়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ ;

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হইলেন বাবা প্রেমানন্দভারতী; (মহাত্মা) মুন্সীরাম হইলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। আবার প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিলেও যদি কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে তফাৎ হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করেন তবে সেক্ষেত্রেও কখন কখনও গুরুদত্ত নূতন নাম হয়। যথা, মিস্ মারগ্রেট নোবল হইলেন ভগিনী নিবেদিতা; শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ-রায় হইলেন কৃষ্ণদাস; মিস শ্লেড হইলেন মীরা বহিন।

(ঞ) ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে আবার এরূপও দেখা যায় যে, একই পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী পদবী গ্রহণ করেন। 'গুপ্ত' সাহেবের ভ্রাতা 'অগ্রবাল' সাহেব হইতে পারেন; শ্রীযুক্ত 'শর্ম্মার' পিতা ছিলেন হয়ত 'শ্রীযুক্ত চৌধারীজী।'

কেহ কেহ আবার পদবী একেবারেই ব্যবহার করেন না। একই পরিবারের ভিতরে কর্তার নাম বাবু ভগবান দাস (পদবী 'দাস' নহে); পুত্রেরা বাবু শ্রীপ্রকাশ, বাবু চন্দ্রভাল। কাহারই পদবীর বালাই নাই। আবার পুত্রদের পিতৃব্য বাবু সীতারাম অগ্রবাল। ইহারা অগ্রবাল সম্প্রদায়ভুক্ত বৈশ্য বলিয়া বৈশ্যবর্ণ জ্ঞাপক সাধারণ 'গুপ্ত' পদবী অথবা 'অগ্রবাল' শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

আবার এরূপ উদাহরণও আজকাল পাওয়া যায়, যাহাতে দেখিতে পাই, কেহ কেহ বৃত্তিবাচক বিদেশী (প্রায়ই ইংরেজী) শব্দ পদবীরূপে ব্যবহার করেন। যথা, শ্রীমণিলাল ডক্টর, শ্রীশঙ্কর লাল ব্যাঙ্কার, শ্রীফ্রামরজ মার্চেণ্ট, শ্রীতুগন লাল বকীল, ইত্যাদি।

দেখা গেল একমাত্র 'নাম' লইয়াই আমাদের এত গোল। এ ক্ষেত্রে সূচি-প্রস্তুতকারক কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিবে,—পদবী ধরিয়া সূচি হইবে, কি আদ্যক্ষর লইয়া বর্ণানুক্রম সাজানো হইবে—এ বিষয়ে একটা সাধারণ ব্যবস্থা থাকা চাই, বাংলা দেশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল একটা ব্যবস্থা দিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যবস্থা ভারতের সর্ব্বত্র, সকল প্রদেশ, মানিয়া লইবে কি না জানি না। অল-ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নামে যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা অদ্যাপি এবম্বিধ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই।

আট

'নাম-স্থচি' প্রস্তুত ব্যাপারে আমরা যতটুকু সমস্যার ভিতর পড়িয়া আছি, 'বর্গীকরণ' প্রথা লইয়া ত আমরা ততোধিক সমস্যার ভিতর রহিয়াছি।

পাশ্চাত্য প্রথাগুলির একটিকে বাছিয়া লইয়া এদেশে হুবহু চালাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, দেশের প্রধান প্রধান বিষয়গুলিকে বড়ই কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিতে হইতেছে। 'উপনিষৎ' 'বৌদ্ধ দর্শন' 'জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মমত' 'মুসলীম আইন-কাম্নন', 'বৈষ্ণব মতবাদ' প্রভৃতি আমাদের পক্ষে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিষয়গুলি পাশ্চাত্য কোনো বর্গীকরণ মহাক্রমেই কাণ্ড, শাখা, এমন কি, নিকট প্রশাখা অবলম্বন করিতে পারে নাই। অথচ, আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচ্য 'রোমান্ আইন-কাম্নন' খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ, বলিতে গেলে এক-একটি মূল শাখা দখল করিয়া রহিয়াছে।

আবার, যাঁহারা পাশ্চাত্য পদ্ধতিগুলি ধরিয়া এদেশে ব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা চালাইয়াছেন, তাঁহারাও কিছুদিন কাজ করার পরেই স্বীকার করিতেছেন যে, বিষয়টি তত সহজ নয়, যতটা বাহির হইতে প্রথম মনে হইয়াছিল। এইখানেই বিদ্বানদের সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা। এখানেও গবেষণার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ মিলিয়া ব্যবস্থা দিলে, তাহাতে বেশী খুঁৎ থাকিবার কথা নয়।

'বর্গীকরণ' কথাটাই হইতেছে বর্গ লইয়া, বর্গ চারিটি,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম (অথবা কলা) এবং মোক্ষ, যে-কোনো ভারতীয় পণ্ডিত সাধারণভাবে এই চারিটি ভাগে সব বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। যে বইগুলি কোনো-মাত্র একটি বিষয়ে আবদ্ধ নহে (যথা অভিধান, সাধারণ সাময়িক পত্র-পত্রিকা) সে-গুলিকে স্বতন্ত্র পঞ্চম (অস্পৃশ্য পঞ্চম নহে) বলা যাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই বর্গগুলিকে সহজেই দশমিক প্রণালী বদ্ধ করা যাইতে পারে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি এ বিষয়ে কিছু কিছু কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। চাতুর্ব্বর্গানুসারে দশমিক বর্গীকরণের যে ঘূর্ণায়মান্ চার্টটি সম্প্রতি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল, তাহাই আপনাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। ইহাতে বর্গীকরণের দশমিক প্রথার কাঠামটি মাত্র থাকিলেও, ইহা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার-প্রস্তাব অসম্ভব নহে।

এই বিষয়ে গবেষণা করিলে আমাদের দেশের বর্গীকরণ সমস্যার হয়ত একটি

মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য প্রথাগুলি হইতে আমরা যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিতে পারি। দেশের ভিতর নানা স্থানে যা-কিছু কাজ হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কর্ম একটি মাত্র ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারে না, করিলেও খুঁৎ অনেক থাকিয়া যাইবে। পণ্ডিতগণের সহকারিতা কার্য্যটিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহাদের সমালোচনা বিষয়টিকে নিখুঁৎ করিতে সহায়ক হইবে।

নয়

আমি, বলিতে গেলে, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সকল দিক দিয়া এগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির প্রায় প্রত্যেকটি আলাদা ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, একের সঙ্গে অপর কোনো গ্রন্থাগারের বড় একটা যোগাযোগ নাই। তাহারই ফলে আজিও এই কলাকৌশল সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অজ্ঞ রহিয়াছি। এই কূপমণ্ডুকতা বা একা থাকিবার প্রবৃত্তি স্বচ্ছন্দ জীবনের সহায়ক নহে। বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়ের ফললাভে আমরা বহু পরিমাণে বঞ্চিত থাকিব।

মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের স্থান

নক্ষত্রলাল সেন

আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার-আন্দোলন সবে মাত্র সুরু হইয়াছে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ইহা এখনও অতি নগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অতীব আশার কথা যে, আমরা জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগার-আন্দোলন কিরূপ সহায়তা করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও গ্রন্থাগারিকের আবশ্যকতা আমরা এখনও অনুভব করিতে পারি নাই; অথচ গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থাগার-আন্দোলন সফল করিতে হইলে এবং গ্রন্থাগারকে শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইলে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের উপর গ্রন্থাগারের ভার ন্যস্ত করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক শ্রেণীর এখনও সৃষ্টি হয় নাই। প্রকৃত গ্রন্থাগারিক আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক আছেন মাত্র। সার্ব্বজনিক গ্রন্থাগারের কথা দূরে থাকুক এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় না; অথচ গ্রন্থাগার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কলেজের গ্রন্থাগারিক, কলেজের অধ্যাপকের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এবং মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, মিউনিসিপালিটির অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সমশ্রেণীর বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহাদের সমান বেতন ও মর্য্যাদার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। উহা মোটেই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না যদি আমরা মনে রাখি যে বর্তমানে নবজাগরণের দিনে জনসাধারণকে একাধারে শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দ দান করিতে গ্রন্থাগারের মত উপযোগী আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই এবং বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও পরিচালনাপদ্ধতি জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডস্বরূপ।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের অবস্থা এইরূপ অবজ্ঞাত

হইলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাই যে, অতীতে উহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল না। আজ আর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু অতীত যুগের গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের কিরূপ স্থান ছিল, শিলালিপির সাহায্যে আজ তাহারই আলোচনা করিব। ইহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, আট শত বৎসরেরও পূর্ব্বে গ্রন্থাগারিক কিরূপ সম্মান ও মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং অতীতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিরূপ গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের রাজ্যে নাগই নামক স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি 'নাগইর শিলালেখ" নামে পরিচিত। স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল "নাগবাপী"। উহা কালক্রমে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া নাগবাবীতে পরিণত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে নাগবায়ী এবং সর্ব্বশেষে 'নাগই'তে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা নিজাম সরকারের গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ের চিতপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। পরবর্ত্তী চালুক্যদের সময় এই স্থানটি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; ইহার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্থানে একটি প্রাচীন নগরী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। ব্রাহ্মণ্য জৈন ও মুসলমান ধর্ম্মের অনেক প্রাচীন নিদর্শন এই স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতে এই স্থানের নাম 'নাগবাবী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, অধুনা বাই বাত্তলী' নামে খ্যাত এই স্থানের প্রস্তর-সোপানযুক্ত বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রাচীন নাগবাপী নামে পরিচিত ছিল এবং ইহা হইতেই স্থানীয় নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতা-অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন লিপিতেও দেখা যায় যে, এই স্থানের একটি দীর্ঘিকা রামতীর্থ নামে পরিচিত ছিল।

নাগইতে চারিটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটিতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় কতকগুলি কর আদায়ের অধিকার প্রদানের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে একই বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৃতীয় লিপিটি দ্বিতীয় লিপি হইতে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা যায়, কিন্তু মূল বিষয় একই। এই দুই লিপিতে দেবালয়-নির্ম্মাণ এবং একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। চতুর্থ

লিপিতে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য দানের উল্লেখ আছে। এই লিপিগুলি চালুক্য-নৃপতিদের সময় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে তিন জন চালুক্য নৃপতির রাজত্বকালের উল্লেখ আছে, যথা, ত্রৈলোক্যমল্ল, ত্রিভুবনমল্ল, এবং দ্বিতীয় জগদেকমল্ল। উক্ত লিপি-সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোক-পাত করে। এই লিপিদ্বয় বিশেষ মূল্যবান, কারণ ইহা হইতে আমরা সে-যুগের শিক্ষার ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই। ভারতের অতীত যুগের শিক্ষার ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এই লিপি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে একটি আবাসিক (রেসিডেন্-সিয়াল) বিদ্যালয়ে বা ঘটিকাশালা স্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। এই বিদ্যালয় হইতে আড়াই শতেরও অধিক ছাত্র ও শিক্ষকের অন্নবস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যতীত কয়েক জন সরস্বতী ভাণ্ডারিক বা গ্রন্থাগারিকও নিযুক্ত ছিল। প্রাচীন কানাড়ী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে এই লিপি রচিত।

এই স্থানটি ফ্লিট্‌শ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। মাদ্রাজের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত সি আর, কৃষ্ণমা চার্লু মহাশয় এই স্থান ও এই স্থানে আবিষ্কৃত শিলা-লেখ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় লিপিটি দ্বিতীয় লিপিরই অনুবৃত্তি এবং উহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লিপি লইয়াই আলোচনা করিব। লিপিটি অতি দীর্ঘ বিধায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম না। নিম্নে কেবল লিপির সারাংশ প্রদত্ত হইল।

এই লিপি নাগইর অরুবত্তু কম্বদগুদি নামক ষাট স্তম্ভযুক্ত মন্দিরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভে খোদিত হইয়াছিল। স্তম্ভটির এক পার্শ্বের উপরিভাগে সূর্য্য, ক্ষীণচন্দ্র, সবৎসা একটা গাভী ও একখানা ছুরিকার চিত্র উৎকীর্ণ আছে। লিপিটির মুখবন্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে আদি ব্রহ্ম ও স্বায়ম্ভুব মুনির স্মৃতি কীর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহার পর স্বায়ম্ভুব। মুনিব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চালুক্য-বংশের উৎপত্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তার পর চালুক্য-বংশের নৃপতিদের বংশাবলী ও তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইহার পর একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাহিনী উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই বংশের গোবিন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি ইচিকব্বের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কয়েকটি

পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কালিদাস কালক্রমে সেনাপতির পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনিই চালুক্য-বংশের শ্রীবৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া দেন। রাজা জয়সিংহকে হত্যা করিবার জন্য একবার যে ষড়্যন্ত্র হইয়াছিল, ইঁহারই তৎপরতায় সেই ষড়্যন্ত্র বিফল হয়। তিনি স্বধর্ম্মনিরত কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। ইহার পর তাঁহার পুত্রদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মধুসূদন সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ ছিলেন। তিনি কঙ্কণ, মালব ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার "দণ্ডনাথ ত্রিনেত্র" নামে একটি উপাধি ছিল। তিনি সন্ধি-বিগ্রহবিষয়ক মন্ত্রীও (সন্ধিবিগ্রহী) ছিলেন। তিনি সাতিশয় রাজানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার নানাবিধ গুণগ্রামের জন্য তিনি যুবরাজোচিত মর্য্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। রাজা তাঁহাকে তাম্রশাসন দ্বারা অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি তিনটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ঘটিকাশালা নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে দুই শত ছাত্রের বেদপাঠের এবং বাহান্ন জন শিক্ষার্থীর শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষায়তনের জন্য তিন জন বেদের অধ্যাপক, ন্যায়, প্রভাকর ও ভট্টাদর্শন অধ্যাপনার জন্য তিন জন অধ্যাপক এবং ছয় জন সরস্বতী-ভাণ্ডারিক বা গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত ছিল। মধুসূদন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত জমি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দান করিয়াছিলেন। এই শিলালিপির তারিখ ইংরেজী গণনা অনুসারে ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর।

এই শিলালিপি হইতে মধুসূদন কোন্ বিষয়ের অধ্যাপককে কি পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহারও হিসাব পাওয়া যায়। নিম্নলিখিতরূপে জমি বিভাগ করা হইয়াছিল :—

ভট্ট দর্শনের অধ্যাপক	৩৫	খণ্ড ভূমি
ন্যায় " "	৩০	" "
প্রভাকর " "	৪৫	" "
প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক	৩০	" " ইত্যাদি।

উপরিলিখিত বর্ণনা হইতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় :—(১) সেকালে আবাসিক বিদ্যালয়ের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল ; (২) বিদ্যা দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করা হইত ; (৩) গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল এবং গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। আলোচ্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থাগারটি বৃহদাকার ও অতিপ্রয়োজনীয় ছিল। নাগইতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অট্টালিকাতে একটি সুপরিসর কক্ষ ছিল এবং এই কক্ষে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত বেঞ্চ ও দেওয়ালে কতকগুলি পুস্তকাদি রাখিবার যোগ্য আধার ছিল। সম্ভবতঃ এই কক্ষই গ্রন্থাগার-রূপে ব্যবহৃত হইত; (৪) উক্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ অধ্যাপকদের সম-পদস্থ ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যাপকের সমপরিমাণ জমি ভোগ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত ধরণের অবৈতনিক আবাসিক বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার প্রাচীন্ যুগ হইতেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। নালন্দার বিদ্যাপীঠ ছিল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু অতীতের গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে নাগইর শিলালিপিতে যেরূপ সুস্পষ্ট চিত্র পাই অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগারের খ্যাতি ও আয়তন হইতে ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে তথায়ও গ্রন্থাগারিকের বিশিষ্ট স্থান ছিল। কালক্রমে হয়ত তাহাদের অজ্ঞাত কাহিনী আবিষ্কৃত হইবে।

রাস্কিন ও গ্রন্থাগার

অবনীনাথ রায়

ইংরাজী-সাহিত্যে জন রাস্কিনের নাম সর্ব্বজনবিদিত। আর্টের বিশিষ্ট সমালোচক-হিসাবে তাঁর মত সকলেই গ্রাহ্য করে। এই কড়া সমালোচক জীবনে কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়-প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এক টলষ্টয় ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক বিপন্নের জন্য এতটা সহানুভূতি পরায়ণ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সম্পত্তি এক লাখ, আশি হাজার পাউণ্ডের মধ্যে মানুষের বিপত্তি নিবারণের জন্য খরচা ক'রে মাত্র আঠারো হাজার পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। এই অর্থ তিনি লাইব্রেরি এবং আর্ট স্কুল স্থাপন ক'রে এবং দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়ে খরচ করেছিলেন। এই সব কাজ করতে গিয়ে তাঁকে তাঁর পিতামাতার অবাধ্য হতে হয়েছিল—যদিচ পিতামাতার একমাত্র সন্তান ব'লে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁর মনে আঘাত লেগেছিল যথেষ্ট। কিন্তু শুধু তাঁর পিতামাতা কেন, কোন বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকই রাস্কিনের আইডিয়াগুলিকে কার্য্যে পরিণত করতে চাইবেন না এবং তিনি করেছিলেন ব'লে তাঁকে পাগল বল্‌তেও অনেকে কুণ্ঠিত হ'ন নি। যাঁরা আর একটু উদার নীতিজ্ঞ, তাঁরা রাস্কিনের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক মতবাদগুলির তারিফ করেন কিন্তু সেগুলিকে কেউ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেন নি কিম্বা অপরকে করতেও পরামর্শ দেননি।

গ্রন্থাগার-সম্বন্ধে রাস্কিনের মত তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত ব'লে সকলেই তাকে মূল্যবান ব'লে মনে করেন, কেননা তিনি তরুণদের অনেকগুলি স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি এই বিষয় বক্তৃতাদিও দিয়ে বেড়াতেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে মানুষের জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—যত বই ছাপা হয়েচে বা হচ্চে তার সবগুলি কিছু পড়ে উঠা সম্ভবপর নয়। কাজেই মানুষকে বই নির্ব্বাচন করে পড়তে হয়। রাস্কিনের মতে সমগ্র পুস্তকরাশিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:—এক হচ্চে সেই শ্রেণীর বই যা কিনা প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজ কিন্তু বইয়ের আকারে সুন্দর ক'রে ছাপান হয়েচে। এই বইগুলি বাস্তবিক পক্ষে আমরা সকলের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বল্‌তে পারিনে বলেই আমরা লিখি—এগুলি আমাদের কথার বাহক মাত্র। এর মধ্যে যত রকমের ভ্রমণকাহিনী, সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা, [illegible]

প্রয়োজনীয় খবর্‌াখবরের তালিকা প্রভৃতি সবই পড়ে। এ সবগুলি books of the hour, এদের আয়ু পরিমিত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর বই আছে যা' হচ্চে books of all time. যখন কোন লেখক কোন সত্য কিম্বা সুন্দরকে উপলব্ধি করেন এবং নিজের উপলব্ধিগত সত্যকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে পারেন যা তাঁর জ্ঞানমতে আর কেউ আগে বলেন নি বা বলতে পারেন না তখন তাঁর লেখাকে আমরা শেষোক্ত শ্রেণীর কোঠায় ফেলতে পারি। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর বই সর্ব্বদেশের সাহিত্যেই স্বল্প পরিমাণে সৃষ্টি হয়েচে।

রাস্কিন বই-সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার নামকরণ করেছিলেন—"Of king's treasuries." তাঁহার মতে মানুষের সব চেয়ে বড় সঙ্গী হচ্চে এই পুস্তকাবলী—কেননা এই বইয়ের মধ্যে বড় বড় মনীষী, রাজনীতিজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ প্রভৃতি পাঠকদের সঙ্গে কথা বলার জন্তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েচেন। আর এ সত্য আমরা সকলেই জানি যে চিন্তার জগতে যিনি মহারাজা তিনি মানুষের স্মৃতিতে চিরজীবী কিন্তু ভূসাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজাকে তাঁর মৃত্যুর পর ভুলে যেতে আমাদের আদৌ দেরি লাগে না।

রাস্কিন এই ব'লে দুঃখ করেছিলেন যে তাঁদের দেশে বইয়ের পিছনে মানুষ যথেষ্ট অর্থব্যয় করে না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে কারুর লাইব্রেরিগৃহে যত বই আছে তা' বিক্রি ক'রে যা' পয়সা পাওয়া যাবে তার বাড়ীর মদের ঘরের (wine cellars) মদ বিক্রি করলে তার চেয়ে বেশি অর্থাগম হবে। রাস্কিনের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের দিকে তাকালে অবশ্য অবাক হ'য়ে যেতে হয়। ইংলণ্ডে শুনতে পাই প্রত্যেক সংস্কৃতিপরায়ণ ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতেই লাইব্রেরি ব'লে একটি বস্তু আছে এবং সেই গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি অবশ্য করণীয় কার্য্যের মত লাইব্রেরি ঘরে বসে দৈনিক কিছুক্ষণ পড়াশোনা করাও তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যবিধির অন্তর্গত। আমাদের দেশে অবশ্য বাড়ীতে লাইব্রেরি রাখা নেহাত একটা সৌখীনতার পরিচয় বলেই আমরা মনে করি। অতএব বই আমাদের বড় একটা কিনতে হয় না। যাঁদের পড়াশোনার কিছু অভ্যাস আছে তাঁরা অপরের বই চেয়ে নিয়ে এসে পড়েন এবং অনেক সময় তা' ফিরিয়ে দিতেও ভুলে যান। সাধারণ প্রতিষ্ঠান-হিসাবে আমাদের দেশে যা' দু'চারটি লাইব্রেরি আছে তাদের সভ্য-সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছেদের মত বই পড়া এবং জগতের চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচিত থাকাকে আমরা যে জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে মনে করিনে এর থেকে তাই প্রমাণ

হয়। পড়াশোনা আমাদের দেশে প্রকৃত পক্ষে কলেজ-জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ হয়, কেননা তারপর আমরা যে কোন একটা চাকরি জুটিয়ে নিই এবং যে বই অবলম্বন ক'রে আমরা জীবনের বড় জিনিষের স্বাদ পেয়েছিলুম সেই বইকে লাথি মেরে ফেলে দিই। বাকী জীবন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যা' পড়ে এসেচি তারই রোমন্থন চলে। ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েচেন এমন ঘটনা আমাদের দেশেও বিরল নয় কিন্তু বই কিনে সর্ব্বস্বান্ত হয়েচেন এমন ঘটনা আমার বিদিত নেই।

রাস্কিন বলেন যে বই-ই হচ্চে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ—তার অপরাংশটা সকল লোকের সঙ্গে সমান—যে অংশে সে খেয়েচে, ঘুমিয়েচে, ভালবেসেচে, ঘৃণা করেচে। এ অংশটা বাষ্পাকার কিন্তু যে অংশে সে কিছু দেখেচে এবং জেনেচে এবং তাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেচে সেই অংশই মানুষের স্মৃতির দ্বারে স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে।

আপনাদের দৃষ্টি মানুষের জীবনের এই শ্রেষ্ঠাংশের প্রতি আকৃষ্ট করি।

রবীন্দ্রনাথ ও লেনিনের চিন্তায় গ্রন্থাগার

প্রবীর রায়চৌধুরী

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশ্বের অনেক মনীষীই হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি ও শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং মহান বিপ্লবী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক লেনিন যে মননশীল ও প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন তা যে কোন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে পরিবর্তন। সুস্থ চেতনায় প্রদীপ্ত সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টির প্রয়াসে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে এই দুই মনীষীর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্যের তাৎপর্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, সংগঠক ও ব্যবহারকারী সবারই বিশেষভাবে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সংক্ষেপে এই দুই মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার সঞ্জীবনী স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে শুধু নূতন জীবনবোধেই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছি তাই নয়, মানবতাবিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণাও আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র সম্পদ ভাণ্ডার থেকে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানব-জ্ঞান ভাণ্ডারের সবদিকই রবীন্দ্র প্রতিভায় আলোকিত। স্বভাবতই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ ভাণ্ডার যে গ্রন্থাগার তাও তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারকে শুধু বুদ্ধিদীপ্ত মন দিয়েই বিশ্লেষণ করেন নি, গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শিক্ষাদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতীতে। সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হতে লাগল এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটিও। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরামর্শ। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের প্রতিটি সমস্যা তাঁর গোচরে ছিল, সমাধানের পথও তিনি বলে দিতেন। দেশ বিদেশ থেকে নানা মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেন। এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু গ্রন্থে কবিগুরু লিখিত বক্তব্য তাঁর গ্রন্থপাঠে একাগ্রতার সাক্ষ্য বহন করে। যতদূর জানা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে

প্রথম মুক্ত মঞ্চ প্রথা (Open Access System) প্রবর্তিত হয়। এটা অনুমের এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠনে উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয়।

অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি হন প্রথম সভাপতি। পরিষদের কর্মধারার তিনি নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের কার্যধারা রবীন্দ্র ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁর অভিভাষণ (লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য) পঠিত হয়। কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরির তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি। এই গ্রন্থা-গারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর আটটি মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয়। কলিকাতার রাম-মোহন লাইব্রেরির একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই লাইব্রেরির পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবং কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরির শিশু বিভাগ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কবি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। ১৯২৫ সালে বরোদা রাজ্যের প্রথম গ্রন্থাগার সম্মিলন উপলক্ষ্যে কবিতার মাধ্যমে যে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন তা Indian Library Journal-এর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এভাবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। প্রথমটি হল "লাইব্রেরি" নামক প্রবন্ধ যা "বালক" পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে "বিচিত্র প্রবন্ধ" এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হল ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে লিখিত তাঁর ভাষণ, যা পুস্তিকাকারে "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য" হিসাবে প্রকাশিত হয়। কবি নিজে সম্মিলনে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর পক্ষে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই অভিভাষণটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ দুটি একদিকে যেমন কবিগুরুর দরদী ও বিশ্লেষণাত্মক মনের নির্দেশক অপরদিকে ভাষার লালিত্যে প্রবন্ধ দুটি কাব্যরূপ ধারণ করেছে।

"লাইব্রেরি" প্রবন্ধটিতে কবি গ্রন্থের অপরিমেয় শক্তি এবং গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ ভাণ্ডার

হল গ্রন্থাগার। যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা ভাবনা, ধ্যান-ধারণার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি গ্রন্থাগার ধরে রাখে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। গ্রন্থাগারের এই সত্বাটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সে অতুলনীয় রূপ ধারণ করেছে তা আমাদের মোহিত করে। কবি কল্পনা করেছেন "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল" বা "মানব হৃদয়ের বন্যাকে" গ্রন্থাগার যেন বেঁধে রেখেছে। গ্রন্থাগার যেন "মানবাত্মার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা" পড়ে আছে। কবির ভাষায় লাইব্রেরিতে "মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে"……"এখানে আলোকের জন্ম-সংগীত গান হইতেছে।"

"লাইব্রেরি" প্রবন্ধটি একটি তত্ত্বমূলক রচনা। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য এখানে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোক উদ্ভাসিত। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে গ্রন্থাগারের দর্শন সম্পর্কে এই ধরণের একটি তত্ত্বমূলক রচনা এমন নিপুণ কাব্যময় ভাষায় কিভাবে কবি লিখলেন। সমগ্র রচনাটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও ভাষার মাধুর্য আমাদের অভিভূত করে।

"লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য' রচনাটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। এই প্রবন্ধে কবি যে সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তা হল: গ্রন্থাগার-পাঠক সম্পর্ক, লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ ও আতিথ্যপালনের যোগ্যতা কেন থাকা প্রয়োজন, পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টির কাজে লাইব্রেরিয়ানের ভূমিকা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য সব কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।– যথা, সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থ নির্বাচন, গ্রন্থাগারে সংযোজিত গ্রন্থের সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিচয় (সূচীকরণ ও বর্গীকরণের সাহায্যে) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সূচী, গ্রন্থাগারে সংযোজিত নূতন গ্রন্থের প্রচার ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থাগার চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক! প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে গ্রন্থ ব্যবহারের উপরেই গ্রন্থাগারের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কবির মতে গ্রন্থাগারের যে অংশ নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয় সেই অংশেই তার সার্থকতা। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নির্বাচন সম্পর্কে কবির অভিমত হল এখানে, সব মত ও পথের গ্রন্থ থাকবে যা পাঠ করে মানুষ সমৃদ্ধ হবে। কবির মতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বাদ ও প্রতিবাদ, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার একই সঙ্গে থাকবে। তৃতীয়ত, গ্রন্থাগার-পাঠকের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তায় "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।"

চতুর্থত, গ্রন্থাগারে সুষ্ঠু গ্রন্থ নির্বাচন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার সাজানো ও পরিচালনা এবং পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করার কাজে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না ···লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।" পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারকে শুধু চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে দেখেন নি, তিনি সংস্কৃতি সাধনার প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও গ্রন্থাগারকে বিবেচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবির অভিমত হল : "বাংলাদেশে গ্রামে নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টা যাতে কেলমাত্র চিত্ত বিনোদনের উপলক্ষ্য মাত্র না হয় এবং সংস্কৃতি সাধনাকে লোক সমাজে বিস্তারিত করতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেথার সময় এসেছে।"

মহান বিপ্লবী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের সারা জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানেই তিনি থাকতেন, প্রকাশ্য, আত্মগোপন, বন্দী জীবন বা নির্বাসনের দিনগুলিতে বই ও পত্র-পত্রিকা ছিল তাঁর প্রধান সঙ্গী। আর এই বই পড়ার মাধ্যমে রাশিয়া ও বিদেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর গড়ে ওঠে এক নিবিড় সম্পর্ক। তিনি বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে নিজেকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ রাখতেন অধ্যয়নের মাধ্যমে। লেনিন মনে করতেন যে বিপ্লবের কাজে সার্থক ও বুদ্ধিদীপ্ত অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক।

কেমন পাঠক ছিলেন লেনিন? ১৮৯৯ সালে লেনিনের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিকাশ" (The development of capitalism in Russia) যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ২৯। লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া উল্লেখ করেছেন যে এই বইটি লিখতে লেনিন ৫৮৩টি বই ব্যবহার করেছেন। এই বইগুলির অধিকাংশই তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে পাঠ করেছেন। সামারাতে বাস করার কালে স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে বহু বই তিনি ধার করে আনতেন। পিটার্সবার্গে যখন তিনি এলেন তখন অনেক সময় সারাদিনটাই লাইব্রেরিতে কাটাতেন। এমন কি জেলে থাকার সময়ও লেনিনের বোন তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বইগুলি পৌঁছে দিতেন। অনেকগুলি বিদেশী ভাষা লেনিন জানতেন। বিদেশে থাকার সময় তিনি আরো বেশী করে লাইব্রেরি ব্যবহার করতেন এবং ঐসব লাইব্রেরিতে বিদেশী ভাষায় লেখা প্রচুর বই তিনি পড়েন। ইউরোপে প্রধান প্রধান শহরগুলির যথা, বার্লিন, জেনেভা, জুরিখ, বার্ণ, প্যারিস, লণ্ডনের সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগারগুলি তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

ক্রুপস্কায়া উল্লেখ করেছেন যে লেনিন একটি দেশের সাংস্কৃতিক মান কি তা নির্ধারণ করতেন সেই দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি তা দিয়ে। লেনিন সুইজারল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মান নিয়ে খুবই প্রশংসা করতেন এবং চিন্তা করতেন যে বিপ্লবের পর রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডের মতো করে সাজাতে হবে। সুইজারল্যাণ্ডের আন্তঃ-গ্রন্থাগার লেনদেন ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রশংসা তিনি করেছেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (বর্তমান নাম 'দি ব্রিটিশ লাইব্রেরি') প্রশংসায় তিনি ছিলেন মুখর। ১৯০২-৩ সালে যখন তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য আবেদন করেন তখন জ্যাকব রিচতার এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ১৯০৮ সালে যখন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিয়ো-ক্রিটিসিজম" রচনা করেন তখন আবার ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে গিয়ে অনেক মূল্যবান বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করেন। প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারের (বিবলিওথেক ন্যাশনাল) আমলাতান্ত্রিকতা তাঁর বিশেষ পছন্দ হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি খোঁজ-খবর রাখতেন। নিউইয়র্ক পাব্‌লিক লাইব্রেরির ১৯১১ সালের রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে ঐ গ্রন্থাগারের কার্য্যধারার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এই প্রসঙ্গে তৎকালীন রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্পর্কেও মন্তব্য করেন।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গী লেনিনের মধ্যে গড়ে ওঠে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন তা প্রতিফলিত হয়েছে রাশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আনাতলি লুনাচারস্কিকে লেখা নিম্নলিখিত নির্দেশে: 'লাইব্রেরিগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে করি। এ সম্পর্কে তোমার নিজেকেই কাজ করে নিতে হবে। সব লাইব্রেরির বিশেষজ্ঞদের ডাকো, এই ব্যাপারে আমেরিকাতে বহু ভাল জিনিষ করা হচ্ছে। বই হচ্ছে একটি অসাধারণ শক্তি, আর বিপ্লবের ফলে তাদের চিত্তাকর্ষকতা আরো বেড়ে যাবে। পাঠকদের বড়ো বড়ো পড়বার ঘর দিতে হবে আর ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি করতে হবে, যেটা পাঠকদের কাছেই পৌঁছে যাবে। আর ঐ ধরণের ব্যবস্থা ছাড়া পোষ্টাল ব্যবস্থাকেও ব্যবহার করতে হবে। হয়তো আমাদের বৃহৎ জনসংখ্যার জন্য এখুনি যথেষ্ট সংখ্যায় বইয়ের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না, বিশেষ করে যারা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করবে তাদের সংখ্যা যখন বাড়তেই থাকবে। কাজেই বইগুলিকে ভ্রাম্যমাণ না করতে পারলে এবং তাদের সারকুলেশন না বাড়াতে পারলে বইয়ের দুর্ভিক্ষ হবে।"

লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে রাশিয়ার আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিপ্লবের ঠিক পরে যখন লেনিনকে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে হচ্ছে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য তখনও তিনি রাশিয়ার লাইব্রেরি, মহাফেজখানা (আর্কাইভ্‌স) এবং মিউজিয়ামগুলি সংরক্ষণ ও আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল: (ক) রাশিয়ার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলিকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা ও ঐসব গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা। (খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পিপলস্ কমিশারেট ফর এডুকেশনের অধীনে একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন; (গ) গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন প্রথা চালু করা এবং এই উদ্দেশ্যে বিনা ডাক খরচে গ্রন্থ লেনদেনের সুযোগ চালু করা; (ঘ) গ্রন্থাগারগুলিতে আধুনিক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ ব্যবস্থা এবং পরিসংখ্যা রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; (ঙ) অধিকতর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ-দানের জন্য সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা রাখা; (চ) রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনা অর্থাৎ গ্রন্থাগার-গুলির 'নেটওয়ার্ক' সৃষ্টি করে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীকরণের নীতি চালু করা ইত্যাদি।

লেনিনের গ্রন্থাগার চিন্তার কয়েকটি দিক আছে। প্রথমত তিনি মনে করতেন যে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। এই প্রসঙ্গে লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া লিখেছেন "It was his opinion that the library and reading room would, for a long time, be the main source of political education for the masses and almost their only school. সমাজ সচেতনার বিকাশে গ্রন্থাগার এই ভূমিকা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই বিপ্লবের পরে লেনিন গ্রন্থাগার উন্নয়নের দিকে এত নজর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ লেনিন মনে করতেন যে গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ নূতন নূতন পাঠক সৃষ্টি করা। ব্যবহার ছাড়া গ্রন্থাগারের সার্থকতা নেই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন "ওরা একটা পাবলিক লাইব্রেরীকে গর্ব ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাতে কত দুষ্প্রাপ্য বই আছে তা দেখে নয়, ষোড়শ শতাব্দীর সংস্করণ অথবা দশম শতাব্দীর

পাণ্ডুলিপি আছে তা দেখে নয়, পরন্তু কত ব্যাপকভাবে কোন্ কোন্ বই জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে, কত নতুন পাঠক লাইব্রেরিতে যোগ দিচ্ছে, কত তাড়াতাড়ি কোন বইয়ের চাহিদাকে কি করে মেটানো যায়, বাড়িতে পড়বার জন্য কত বই ধার দেওয়া হয়েছে, কত বেশি সংখ্যায় শিশু ও কিশোরদের পড়াশুনাতে আকৃষ্ট করা যায় এবং লাইব্রেরি কি রকম ব্যবহার হচ্ছে তার উপর।” তৃতীয়ত, লেনিন মনে করতেন যে শুধু নিরক্ষরতা দূর করলেই চলবে না। একদিকে যেমন অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার করতে শিখতে হবে, অপরদিকে অর্জিত শিক্ষার সাহায্যে সংস্কৃতির মানকে উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হবে। আর এই কাজে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও তার আধার গ্রন্থাগারকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

লেনিনের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগারও ছিল। এই গ্রন্থাগারটিতে মানব-জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের নির্বাচিত গ্রন্থ এবং চিরায়ত সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল। লেনিনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুসানিক্ মানুচারিয়ান্ত তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন তিনি এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে কত যত্নবান ছিলেন। অন্য যে সব গ্রন্থাগার তিনি ব্যবহার করতেন সে সব গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন মেনে চলার ব্যাপারেও সব সময়ে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

১৯২০ সালে রাষ্ট্রনায়ক লেনিন রুমান্‌ট্‌সেভ মিউজিয়াম লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিককে লিখলেন “যদি নিয়ম অনুসারে রেফারেন্স বইগুলি বাড়িতে ব্যবহার করা না যায় তাহলে একটা সন্ধ্যা ও রাত্রির জন্য কি পাওয়া যায় না, যখন লাইব্রেরিটি বন্ধ থাকে? সেগুলি আমি সকালেই ফেরত দিয়ে দেব।” একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক এই ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখেছেন “গ্রন্থাগারের নিয়মাবলীর প্রতি এই ধরণের গভীর শ্রদ্ধা একজন রাষ্ট্রের কর্ণধারের পক্ষে দুর্লভ ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিতে এই ধরণের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আগ্রহও একজন রাষ্ট্রপতির পক্ষে অতি দুর্লভ ঘটনা।”

পরিশেষে একটি কথা বলে এই আলোচনার ইতি টানছি। রবীন্দ্রনাথ ও লেনিনের গ্রন্থাগার চিন্তার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই মনে করেন যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের একটি অপরিসীম শক্তি আছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য এবং ব্যবহারের মাধ্যমেই গ্রন্থাগারের সার্থকতা এটা উভয়ের চিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও লেনিন উভয়েই মনে করতেন যে নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টি করা, পাঠকদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করা, পাঠকদের প্রতি আতিথেয়তা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রভৃতি কাজে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ ভূমিকা আছে।

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও বিদ্যাসাগর

অসিতাভ দাশ

পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলাদেশের পাঠক সমাজ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বাংলা সাহিত্যে তার অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য। বাংলাদেশের সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে বাংলা গদ্যের বুনিয়াদ নির্মাণ ও তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপার যে ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন তা অতি মূল্যবান। তিনি একাধারে ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্ অন্যদিকে গ্রন্থপ্রণেতা, গ্রন্থনির্মেতা এবং গ্রন্থাগারপ্রেমী।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগে বাংলা গদ্যের শৈশবকাল দূর হয়নি। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের দেহে কান্তি ও লাবণ্য এনেছিলেন। বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে ঐ গদ্য শুধু হাঁটতেই শিখল না, তার চলার গতিতে ছন্দের সঞ্চার হল। আজ আমরা গ্রন্থাগার পরিমণ্ডলে যে সুস্থ ও গ্রন্থমনস্ক পাঠক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, তার সবচেয়ে বড় অবদান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা নেই।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ভার নেবার পর পাঠ্যক্রমের সংস্কারকার্যে সম্পূর্ণ আধুনিক চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, পাঠ্যক্রম যদি ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার না করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে কোন পাঠক সমাজ গড়ে তোলা যাবে না। তাই ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রথমেই তিনি সংস্কৃত কলেজে দুরূহ "মুগ্ধবোধে"-এর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার রীতি পরিত্যক্ত করেন। তিনি বাংলায় সংস্কৃত আয়ত্ত করার সহজতর পন্থা হিসেবে স্বরচিত "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা" এবং "ব্যাকরণ কৌমুদী" ছাত্রদের মধ্যে প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়; সাহিত্য শ্রেণীতে ছাত্রগণ যাতে অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য অধিগত করতে পারে তার জন্য তিনি রামায়ণ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ থেকে গদ্য পদ্যের সঙ্কলন "ঋজুপাঠ" তিন খণ্ডে রচনা করেন। এছাড়া কলেজে সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরাজীতে গণিত শিক্ষা প্রবর্তন করে তিনি শুধু দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি, একই সঙ্গে ইংরাজী ও সংস্কৃতের দ্বারা ছাত্রদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যে যতি নির্দেশক কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রচলন ছিল না। বিদ্যাসাগর কমা, কোলন, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের অবতারণা করে বাংলা গদ্যবন্ধের এই এক সাত্যার্তিক ত্রুটি মোচন করলেন। এতে যে কেবল পাঠক্রিয়ার সুষ্ঠু অগ্রগতিই সাধিত হয়েছিল তা নয়, বাক্যের গঠনে এসেছিল সৌষম্য, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মনীষী স্মরণে" বইয়ে এটাকে ভাষার রাজ্যে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কারের তুল্য উদ্ভাবন বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই স্মরণীয় যতিস্থাপন বিন্যাস পাঠককুলের সামনে তিনি সহজেই নিজস্ব ছাপাখানার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষাপ্রসার ছাড়াও মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে সামাজিক কুসংস্কারও দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

যুগে যুগে শাসক যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল শিক্ষা সংকোচনের, নিরক্ষরতার পরিসংখ্যানে তাই ভারতবর্ষ সবসময় এগিয়ে। প্রাচীন যুগে কোন দেশের পণ্ডিত প্রবররা বা পুরোহিতরা মুদ্রণের প্রকাশ বা প্রচার কামনা করেনি। আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা বা কোন কোন ইংরেজ শাসনকর্তা এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিদ্যাসাগর মুদ্রণ ব্যবসায়ী বা সৌখিন প্রকাশক ছিলেন না। সমাজ সংস্কারকদের অন্যতম পুরোধা রাজা রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের বিরুদ্ধাচারণ অগ্রাহ্য করে মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের ঢেউ ও স্বাধীন চিন্তার স্পন্দন তুলেছিলেন। মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় তিনি "সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি" স্থাপন করেছিলেন। মুদ্রণ কার্য সহজসাধ্য ও দ্রুততর করার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করিতেন এবং তিনি এই ব্যাপারে অসাধারণ উদ্ভাবনীর পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিকে নিজেই সম্পাদিত ও মুদ্রিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি তাঁর মুদ্রণযন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছেন। ১৮৫৮ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা থেকেই "সোমপ্রকাশ" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে এরকম উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র বাংলাদেশে ছিল না। অল্প দিন পরেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হাতে তিনি "সোমপ্রকাশে"র সম্পাদনা ভার অর্পণ করেন। "বিদ্যাসাগর সার্ট" নামে অক্ষর সংযোজন ও সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন তা মুদ্রণের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়ে থাকে।

বিদ্যাসাগর বর্ণ পরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ, ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে বঙ্গবাসীর শৈশব শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনের সাথে সাথে নিজস্ব গ্রন্থভাণ্ডার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি জানতেন গ্রন্থাগার ব্যতীত কোন মানুষের মানসিক বিকাশ ও চেতনার পরিব্যাপ্তি ঘটতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিদ্যাসাগরের নিজস্ব অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহরাজী।

তিনি নিজস্ব গ্রন্থভাণ্ডারে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও অন্যান্য স্বদেশী এবং বিদেশী ভাষায় রচিত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে রাখতেন। যে সব প্রাচীন গ্রন্থ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ছিল সেগুলি পুনরায় মুদ্রণ করে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রাখতেন। তাঁর সংগ্রহে বহু প্রাচীন পুঁথিও ছিল, কেননা তিনি জানতেন আমাদের ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাস সম্বৃদ্ধ এই পুঁথিগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপ্রেমিকতা তাই জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি মনেপ্রাণে একজন যথার্থ গ্রন্থাগারিক ছিলেন। গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থাগারের দ্বার যে কোন বর্ণ, ধর্ম, জাতি, ধনী, দরিদ্র, মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এই দ্বার যখন কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়, তখন বিদ্যাসাগর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার রক্ষার্থে সিংহশিশুর ন্যায় গর্জে উঠতেন। জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত, প্রখর আত্মমর্যাদা ও মানবিক চেতনার অধিকারী বিদ্যাসাগরের একটা চিঠি থেকে আমরা তাঁর মনোভাব জানতে পারি। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় যাদুঘরের অছি কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক এইচ এফ ব্ল্যানফোর্ডকে একটি চিঠি লেখেন।

চিঠির ভাষাটি ছিল এরূপ: "গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' এর গ্রন্থাগারে আমার গমন করিতে হইয়াছিল। আমার পায়ে দেশীয় চটি জুতা ছিল বলিয়া আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই; বলা হইয়াছিল আমাকে চটি খুলিয়া রাখিতে হইবে। আমি এত বেশী অপমানিত বোধ করিলাম যে, প্রতিবাদ না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি "সোসাইটির" অঙ্গনে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, যে সকল দেশীয় পরিদর্শক দেশীয় চটি পরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের শুধু চটি খুলিতেই নয়, সেই চটি জুতা স্বহস্তে বহন করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করা হইল। অথচ বহিরাগত কিছু মানুষ জুতা পায়ে দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহা ছাড়া যদি ইংরাজি ধরণের জুতা পায়ে

থাকিলে, আগন্তুকদের জুতা পায়েই ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে একই ধরণের এবং একই মর্য্যাদাসম্পন্ন অন্যদের দেশীয় চটি পায়ে থাকার জন্যই ভিতরে যাইতে দেওয়া হয় না কেন, আমি বুঝিতে পারি নাই।" উল্লেখ করা যেতে পারে, এশিয়াটিক সোসাইটি তখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভবনের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

গ্রন্থাগারিকের অন্যতম দায়িত্ব জনগণকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। আপাদ-মস্তক সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার মুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার পর পঞ্জিকা মতে অষ্টমী ও প্রতিপদে ছুটির পরিবর্ত্তে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির প্রবর্ত্তন করেন। ছাত্রদের চিন্তা যাতে অসার না হয়ে পড়ে তার জন্য তিনি বেদান্ত বা সাংখ্যের সঙ্গে সঙ্গে মিল-এর লজিক জাতীয় পাশ্চাত্ত্য রচনা পঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই তেজস্বী পুরুষ সাংখ্য বেদান্তকে মিথ্যা দর্শন বলে ঘোষণা করতে সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর চেতনায় জনক-জননী শ্রেষ্ঠ দেবতা ও পরলোক শ্রেষ্ঠ পরিহাসের বিষয়।

বিদ্যাসাগর শুধু যে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্টা ছিলেন তা নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রন্থাগারও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে। শিক্ষা পরিষদকে লেখা বিদ্যাসাগরের একটা চিঠির উদ্ধৃতি দিলে এ বিষয়ে আমারা স্পষ্ট ধারণা পাব। চিঠিটি এরূপ ছিল "………………আমার মনে হয় উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমনি কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে। আরব সেনাপতি অমরু আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয়ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয়ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।" আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব-খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র সমূহ অভ্রান্ত।"

আবার, ঐ চিঠির আর এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন" ....মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই।"

বিদ্যাসাগরের সেই কুসংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব আজকের গ্রন্থাগারিকদের।

গ্রন্থাগারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগারিকের দক্ষতা বিচার করা হয় পুস্তক নির্বাচনের নিরিখে, পুস্তক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষা বিস্তার করা যায় না। তাই তিনি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষাই একমাত্র শিক্ষাদানের উপায় দেখিয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়নি. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

আদর্শ গ্রন্থাগারিকের মত যেখানে যে বিষয়ের ভাল বই-এর সন্ধান পাওয়া যেত, যে কোন মূল্যে তা তিনি সংগ্রহ করতেন। সঞ্চয়ের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে বা গ্রন্থাগারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য তিনি বইগুলো সংগ্রহ করতেন না। তাই যখনই কেউ কোন বই সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছেন, সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের মত সেই বইগুলো সম্বন্ধে সুন্দর মতামত দিয়েছেন। সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থের যে বিপুল ও দুর্লভ সমাবেশ তিনি গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করেছিলেন, তা সমকালীন গ্রন্থাগারে শুধু দুর্লভ ছিলনা, বর্তমান কালেও বিরল। ফলে তিনি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সুধী পাঠকসমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুস্তক নির্বাচন সংক্রান্ত এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আর একটা দিক উদ্ভাসিত করা যাবে। ১১ই জুলাই, ১৮৭৩ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্সন সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক নির্বাচন কমিটি সভ্য হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি ছিল এইরকম:—"দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায়

পক্ষ গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।”

গ্রন্থ নির্বাচনের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজিকে রাখা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম ও প্রধান কর্তব্য। গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রেমিক বিদ্যাসাগরও উপলব্ধি করেছিলেন গ্রন্থাগারের অন্যতম কার্য গ্রন্থের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ। তাই যে কোন মূল্যে তিনি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলোকে সুন্দর ও মজবুত করে বাঁধাতেন। প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করে গ্রন্থগুলো বাঁধিয়ে আনতেন।

উনবিংশ শতকে ভারতের বিরাট কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রাণপুরুষ, সাক্ষরতা আন্দোলনের জনক ও প্রথম নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্বের অবমাননায়, নির্যাতনে, সমাজের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মতন সারাজীবন গর্জে উঠেছেন। তিনি সারাজীবন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কোন বক্তৃতা দেননি, তাঁর চিন্তার আদর্শকে কোন রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখেননি অথচ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সঠিক পথে চলবার জন্য যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, তাকে বহন করার দায়িত্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি-গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের।

লেখক-প্রবন্ধ পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায়—একাডেমি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত। এই লেখকের ছদ্মনাম লীলাময় রায়। ১৬ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা তলস্তয়ের একটি গল্পের অনুবাদ। কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় সমান দক্ষ। শতাধিক গ্রন্থের লেখক। তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে স্বেচ্ছায় জুডিয়িসাল সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত হন। বিশ্বভারতী ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

"গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি ১৩৭৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অবনীনাথ রায়—কল্লোল পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও মীরাটে মিলিটারি একাউণ্টস্ এর কর্মী। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ ভোরের আলো (১৩৩৮) অপরূপ (১৩৩৯), অনুচ্চারিত (ছোট গল্প), প্রবাসী বাঙালী, বঙ্গ-প্রতিভা প্রভৃতি।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি মীরাট বীণা লাইব্রেরীর ৫০ বর্ষ অতিক্রম করা উপলক্ষে জুবিলী উৎসবে পঠিত। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে "উত্তরা" পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অসিতাভ দাশ—এই গ্রন্থের সম্পাদক ও সংকলক।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ষ্ট্যালিন আইনষ্টাইন শতবার্ষিকী স্মারক পাঠাগার, ডায়মণ্ডহারবার দ্বারা প্রকাশিত "প্রণিধি" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ সংখ্যায় "হে মহামানব' " প্রবন্ধটির পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ।

কাজী আবদুল ওদুদ—প্রাবন্ধিক ও কথা সাহিত্যিক হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে সুপরিচিত। সুবক্তা এই লেখক অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন ও কর্মজীবনে ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং পরে টেক্সট-বুক কমিটির সেক্রেটারী হন। তাঁর রচিত "কবিগুরু গ্যেটে" (দুই খণ্ড) বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হজরত মহম্মদের জীবনী, বাঙলার জাগরণ, Modernism of Poet Tagore প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলা অভিধানও রচনা করে তিনি সুধীমহলের কাছে সমাদর পেয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি ১৩৬৫ সনে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উত্তরা, ভারতবর্ষ ও মাসিক বসুমতী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অনাবিল কৌতুক রসের স্রষ্টা নন্দিশর্মা, দাদামশাই, শ্রীকেদার ছদ্মনামে লিখতেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে "বালক" মাসিক পত্রিকায় "শ্রীকেদার, দক্ষিণেশ্বর" স্বাক্ষরে পত্র লিখে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, রঙ্গকাব্য, ছোট গল্প ও নক্‌শাগুলি বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধটি "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৪২-এ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ—কলিকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র দানশীলতার জন্য 'দেশবন্ধু' আখ্যায় জনগণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ বিলাসবর্জিত জীবনযাপনকারী দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনীতির মধ্যে থেকেও সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত রেখেছিলেন। বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "নারায়ণ" পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর লেখা প্রকাশিত "মালঞ্চ", মালা, সাগর সঙ্গীত, অন্তর্যামী, কিশোর কিশোরী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও-এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাঁর বঙ্গানুবাদ। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণটির অনুবাদ করেছেন কিরণকুমার ভট্টাচার্য।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক, সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর গ্রন্থাগার উপদেষ্টা ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতিও ছিলেন।

ছদ্মনাম শীলভদ্র। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দূরের বই, সোনার আলপনা, বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি এবং সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

"পড়ার নেশা" প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলোনৎসবের (১৯৬৩) স্মারকগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

জ্ঞানপিপাসু—এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর লেখা প্রবন্ধটি "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনকড়ি দত্ত—বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি হিসেবে কুমার মনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সঙ্গে তিনকড়ি দত্তের নাম সকলে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রত্যেক সম্মেলনে পরিষদের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত গ্রন্থাগার আন্দোলনে সহায়তা করেছে। গ্রন্থাগারিকতা পেশা না হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সবশেষে সভাপতি রূপে নির্বাচন করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

তাঁর সম্মানার্থে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান করে থাকে।

এই গ্রন্থে নির্বাচিত প্রবন্ধটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দীপেন্দ্র সান্যাল—"অচলপত্রের" সম্পাদক ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। অকালপ্রয়াত এই সাহিত্যিকের ছদ্মনাম ছিল নীলকণ্ঠ, দী. কু. সা. ও নিবারণ চক্রবর্তী। ৩০টি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৪৮ খ্রী-এ প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাটি সে সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রস রচনায় তিনি নিজেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি "সুন্দরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নক্ষত্রলাল সেন—একজন প্রবন্ধকার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী'তে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশ হত।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের স্থান" প্রবন্ধটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নরেন্দ্র দেব—শিশু সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও মৌচাক, ভুবনেশ্বরী ও শিশিরকুমার পুরস্কার প্রাপ্ত। তিনি প্রথম সিনেমা পত্রিকা "সাপ্তাহিক বায়োস্কোপ", ও "সাপ্তাহিক নাচঘর" এর সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ১৩৪৩ সাল থেকে একাদিক্রমে দীর্ঘ ১৫ বৎসর তিনি ছোটদের মাসিক "পাঠশালা" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং শিশুসাহিত্য—সর্বক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ১৯২৬ সালে "ওমর খৈয়াম"-এর কাব্যানুবাদের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'কৃত্তিবাস'—বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সমান হৃদ্যতা ছিল। তিনি "মল্লিনাথ" "গোবর্ধন দে" ও "মানবেন্দ্র সুর" ছদ্মনাম সাহিত্যে ব্যবহার করতেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১৩৪১ সনে "বিচিত্রা" পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম প্রাণপুরুষ তিনকড়ি দত্তের ব্যবস্থাপনায় বাঁশবেড়িয়া রবিবাসরের অধিবেশনে পঠিত।

নারায়ণ চৌধুরী—ছদ্মনাম নারদ, সুদর্শন চৌধুরী, ভিন্‌দেশী ও জড় ভারত। বিদ্যাসাগর ও নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যসমালোচক ও প্রাবন্ধিক সমস্ত জীবন বাংলা সাহিত্যের জন্য ব্যয় করেছেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন তিনি। বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'সমকালীন' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৫০-৫১) এবং 'উত্তরসূরী' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই গ্রন্থে নির্বাচিত প্রবন্ধটি "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কর্মজীবনে প্রথমে সাংবাদিক, পরে ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা এবং সাঁচী স্তূপ ও বরোদা যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর লেখা ছোটগল্প, কবিতা, অনুবাদমূলক রচনা,

প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষাতত্ত্ব অর্থনীতি সমাজবিদ্যা বিষয়ক রচনা বহু প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি "উদয়ন" পত্রিকায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরায়চৌধুরী "উদয়ন" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁকে "আচার্য" উপাধি ভূষিত করেছিল। দেশী-বিদেশী চারটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিগ্রী দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন ও ব্রিটিশ সরকার সি. আই. ই. ও নাইট উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস সি. ডিগ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকা দান করেন। এছাড়াও দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করতেন। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের বিবিধ কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের "পালিত অধ্যাপক" হন। অধ্যাপনার গুণে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে তিনি একটি ভারতীয় রাসয়ানিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন এবং ভারতে রসায়নচর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। ইতিহাস, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত আত্মচরিত 'Life and experiences of a Bengali Chemist', বাংলায় রচিত "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার", 'অন্নসমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বহুবিধ প্রবন্ধাবলী তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দেয়।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধটি মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত "মাধবী" পত্রিকায় ১৩৩৬ সালে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা" কসবা (বালীগঞ্জ) লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ, যা "প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রবীর রায়চৌধুরী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের কৃতী ছাত্র, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে এই রাজ্যে ১৯৭৯ সালে "গ্রন্থাগার আইন" প্রণয়নে তাঁর নিরলস সাধনা ও প্রচেষ্টার কথা সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, কর্মসচিব, সুলেখক ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও কৃতী অধ্যাপক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৩৭৪ সালে "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁকে তিনকড়ি দত্ত পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধটি হাবড়া টাউন লাইব্রেরী স্মারক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। দেশিকোত্তম উপাধিপ্রাপ্ত সাহিত্যসাধক এই ব্যক্তিটির ছদ্মনাম ছিল মুসাফির। সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বহু গ্রন্থ রবীন্দ্র গবেষণার পথ সুগম করেছে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন তিনি। 'বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ' গ্রন্থটি তাঁর এইমনস্কতার পরিচয় দেয়।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি "প্রবর্তক" পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহু পঠনশীল সাহিত্যিক। কবি, প্রবন্ধকার ও গল্প লেখক ১৯১৪ সালে "সবুজপত্র" প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন সংযোজন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান—সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া। এপিগ্রাম—বহুল ভাষা ও ভাবাবেগবিহীন তির্যক ভঙ্গী গদ্য পদ্য সকল রচনারই বৈশিষ্ট্য। এই ভাষা ও রীতি বীরবলী ভাষা ও বীরবলী রীতি নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতা। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "জগত্তারিণী পদক" লাভ করেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "সবুজপত্র", "রূপ ও রীতি" ও "বিশ্বভারতী"।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রথম প্রবন্ধটি "গ্রন্থাগার" ১৯২৭-এর ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত সভাপতির ভাষণ। এই প্রবন্ধটি বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "বইপড়া" ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত ভাষণ। এই প্রবন্ধটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে ৫ বর্ষ সংখ্যায় ১৯৭ থেকে ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ফণিভূষণ রায়—সদ্য প্রয়াত শ্রী রায় সমস্ত জীবন গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করে গেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রবাদ পুরুষ এস. আর. রঙ্গনাথনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষৎ সদস্য থাকাকালীন তিনি সবসময় চিন্তা ভাবনা করতেন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনার রূপরেখা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে। তাঁর চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর লেখা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধসমূহে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু যোগাযোগ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর লেখা গ্রন্থ "শরৎ কণিকা" বিদ্বৎজন মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৩৮১ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিমল কর—খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। ছদ্মনাম বিদুর, অভিনন্দ ও হর্ষদেব। শৈশব ও কিশোর জব্বলপুর, হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আনন্দ পুরস্কার ও একাডেমি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত এই সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "পরাগ" পত্রিকার সহ-সম্পাদক, "পশ্চিমবঙ্গ" ও "সত্যযুগ" পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং পরবর্তী পর্যায়ে আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কিছুকাল "শিলাদিত্য" পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

"গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি ১৩৮২ সালের "ফাল্গুন" সংখ্যায় "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত।

ভি. আই. লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিন) জন্ম হয় ১৮৭০ সালে রাশিয়ার মহতী নদী ভোলগার তীরে অবস্থিত সিমবির্স্ক (বর্তমান নাম

উলিয়ানভস্ক) শহরে। তাঁর আসল নাম লেনিন নয়। 'লেনিন' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন সাইবেরিয়ার বিশাল নদী লেনার নামানুসারে—১৯০১ সালে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছদ্মনাম গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়তো এবং এর সংখ্যা ছিল ১৪০টির মতো। তিনি কেবল কৌশলী রাজনীতিবিদ্ বা দক্ষ প্রশাসকই ছিলেন না, শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও প্রয়োগ করতে হবে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। 'নিরক্ষরতাকে' তিনি জাতির দ্বিতীয় শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষার স্থায়ী বনিয়াদ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারও যে অত্যাবশ্যক সেকথা লেনিন বলেছেন বারবার। নবযুগের দিশারী, নতুন প্রেরণা, উন্মাদনা ও চেতনাদানকারী লেনিনের প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছিলেন—ভয়শূন্য চিত্ত, লৌহদৃঢ় মনোবল, অনমনীয় ধৈর্য্য ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করার শক্তি, দাসত্ব ও নিপীড়নের প্রতি জলন্ত ও অবিনশ্বর ঘৃণা, পর্বত টলাবার মত বিপ্লবী আবেগ, জনগণের সৃজনী শক্তিতে অসীম বিশ্বাস, বিরাট সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী—এটাই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ।

এই গ্রন্থে অনূদিত প্রবন্ধটি ১৯১৯ সালে মে মাসে All Russia Congress on Adult Education-এ প্রথম সভায় তিনি যে ভাষণ দেন সেটি 'লেনিন রচনা-বলী'র খণ্ড ২৯, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮ থেকে সংগৃহীত। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৯ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী ঘোষ।

মুনীন্দ্র দেব রায়—বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। সমাজসেবী এই ব্যক্তিটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। সমাজসেবার জন্য তিনি ব্রিটিশ সম্রাটের কাছ থেকে 'সিলভার জুবিলি মেডেল' ও 'করোনেশন মেডেল' লাভ করেছিলেন। সমস্ত জীবন তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিজের জীবন ব্যয় করেছেন। হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ও পাবলিক লাইব্রেরী এনকোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় আদর্শ গ্রন্থাগার বিল পেশ করেন। নবম নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভা-পতিত্ব করেন। তিনি দৈনিক 'দি ঈষ্টার্ন ভয়েস', সাপ্তাহিক 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল'

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল', 'কায়স্থ' পত্রিকা, 'পূর্ণিমা' পত্রিকা ও 'পাঠাগার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ "গ্রন্থাগার" পুস্তকের প্রবন্ধ সংকলন থেকে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "নবযুগের সাধনা" খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে কলিকাতার মেয়র সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রদত্ত বক্তৃতা। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৌমাছি—খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক। শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লেখকের আসল নাম বিমলকুমার ঘোষ। প্রায় ১৪০টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের লেখক আনন্দবাজার পত্রিকায় আনন্দমেলা নামে শিশুবিভাগের প্রবর্তন করেন। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর লেখা প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সংযুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৩৬৬ সনে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। অনুবাদ করেছেন রাধারমণ চক্রবর্ত্তী।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই শক্তিমান কবি 'ভারতী' 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ও পরবর্তী কালে 'পূর্বাচল' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীও হয়েছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অপরাজিতা', 'কাব্যমালঞ্চ', 'নাগকেশর', 'পথের সাথী', 'বন্ধুর দান' প্রভৃতি ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর কবিতা সঙ্কলন 'কাব্য মালঞ্চ' আজও পাঠকসমাজের কাছে সমানভাবে সমাদৃত।

"পাঠাগার" প্রবন্ধটি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ। এই অভিভাষণটি "অভ্যুদয়" পত্রিকার ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যোগেশচন্দ্র বাগল—সরোজিনী বোস স্মৃতি স্বর্ণপদক ও শিশিরকুমার প্রাপ্ত সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে গবেষণামূলক কার্যের জন্য সর্বজন

শ্রদ্ধেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সমাজের কাছে তিনি সুপরিচিত হন। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার' প্রদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "প্রবাসী ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিনের জন্য 'দেশ' পত্রিকায় যোগদান করলেও পরে "প্রবাসী"তে ফিরে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বাংলায় ২১ ও ইংরেজীতে ৪। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও অন্ধ অবস্থাতে তাঁর গবেষণার বিরাম ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লেখা বই দুইখানি বিশেষ তথ্যবহুল।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত তাঁর লেখা প্রবন্ধ "গ্রন্থাগার ও গবেষণা" ১৩৬২ সালে আশ্বিন সংখ্যায় "মন্দিরা" পত্রিকায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন করে পরিচয় দেওয়া পাঠকের কাছে নিষ্প্রয়োজন। কাব্য, ছোটগল্প উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অজস্র ও অনবদ্য অবদান। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক, স্বদেশ-প্রেমিক ও চিত্রকর ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "লাইব্রেরি" প্রবন্ধটি ১২৯২ বঙ্গাব্দে "বালক" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৪১৭-২০ তে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখের প্রথমেই শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর মাতা) সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কার্য্যধ্যক্ষতায় "বালক" পত্রিকা মাত্র এক বৎসরের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। "বালকের" বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল দুই টাকা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকায় রচনাগুলি নামবিহীন ভাবে বেরোত। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের তরুণ-যৌবনের বহু রচনা "বালকের" বক্ষ অলঙ্কৃত করেছিল। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের "লাইব্রেরি" সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা কত গভীর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ লাইব্রেরির মুখ্য কর্ত্তব্য ১৯২৮ সালে জানুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ উপলক্ষ্যে রচিত যা প্রথমে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের "প্রবাসীর" পৌষ মাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই অভিভাষণ সম্বন্ধে প্রবাসী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার ৬০৪ পৃষ্ঠায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল এরূপ "ভারতীয় লাইব্রেরী সমূহের কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। তজ্জন্য তিনি একটি ছোট অভিভাষণও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতা বশতঃ কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন। উহা পৌষের "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট-বড় সকল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষদের উহা পাঠ করিয়া তদনুসারে কাজ করা উচিত।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৩৩৫ সালের "বিচিত্রা"র মাঘ সংখ্যায় "সঙ্কলন" বিভাগে এই প্রবন্ধটি পুর্নমুদ্রিত হয়। পরে বিশ্বভারতী থেকে প্রবন্ধটি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—মননশীল সব্যসাচী লেখক, ব্যক্তিত্বশালী বীর যোদ্ধা, বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থের লেখক এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন। রায় বাহাদুর, সি. আই. ই, রাজা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অফ্ ল উপাধিতে ভূষিত এই মনীষী সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় বুৎপত্তি ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের গ্রন্থাগারিক, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও শেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতি রূপে আমৃত্যু এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় তিনি বঙ্গাক্ষরে প্রথম মানচিত্র প্রকাশ করেন। ১৬.৮. ১৯৪৩ তারিখে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উচ্চমানের এই পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে খ্যাতনামা বহু পণ্ডিতের সঙ্গে ভারততত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল তার সভ্য হন এবং সোসাইটির অর্থ সাহায্যে নিজ সম্পাদনায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে সচিত্র মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রী-এ 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ "গ্রাম্য গ্রন্থালয়" বিবিধার্থ সংগ্রহ-এ (সচিত্র মাসিক পত্রিকা) ১৭৭৩ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে (১৮৫১, অক্টোবর) পর্ব ১, খণ্ড ১, পৃঃ ৬-৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—ইনি নিরপেক্ষ নির্ভীক দৃঢ়চেতা সাংবাদিক ছিলেন। সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্নের অধিকারী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। শিশুদের মাসিক প্রতিষ্ঠা 'মুকুল' ও হিন্দি মাসিক 'বিশাল ভারত'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠা ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তিনি মাসিক পত্রিকা 'দাসী', 'ধর্মবন্ধু', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী, ও 'Modern Review'-এর সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনে 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের' শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধটি নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে চন্দননগর পুস্তকাগারের ৫৮তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতির অভিভাষণ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা অনুলিখিত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। ছদ্মনাম অনিলা দেবী, অনুপমা দেবী, অপরাজিতা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচট্টোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য সাধনায় নিরত। প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট বা সাহিত্যাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন। জনগণ কর্তৃক অপরাজেয় কথাশিল্পী, দরদী কথাশিল্পী, অদ্বিতীয় কথাশিল্পী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসাধক। কালজয়ী বহু গ্রন্থের লেখক তিনি। শুধু কথাশিল্পিরূপে নয়, প্রবন্ধকাররূপেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করতে পারেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি কোন্নগর পাঠচক্রে সভাপতির অভিভাষণ। 'বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী—প্রকৃত নাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা, সমাজ সংস্কারক, নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শিবনাথ শাস্ত্রী কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপেও দেশের মানুষের কাছে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা "আত্মচরিত" ও "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থ দুইটি আজও গবেষকদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। দ্বারকা-

-নাথ বিদ্যাভূষণের বিখ্যাত পত্রিকা "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে (১৮৭৩-৭৪ খ্রীঃ) তিনি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত "যুগান্তর" নামে সামাজিক উপন্যাস থেকেই "যুগান্তর" পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা "সখা" সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে তাঁরই উৎসাহে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "ইংলণ্ডের লাইব্রেরী" প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আত্ম-চরিত" থেকে সংগৃহীত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছয় মাসের জন্য বিলাত ভ্রমণে যান। তাঁর সেই সুমধুর অভিজ্ঞতার কথা এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিবশঙ্কর মিত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত 'সুন্দরবন' যথেষ্ট সাড়াজাগানো গ্রন্থ। সুন্দরবনের প্রতি মমত্ব তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন দুটি পুরস্কার। একটি ভারত সরকার প্রদত্ত। ইংরেজীতে লেখা একটি বইয়ের জন্য সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি "বিচিন্তা" পত্রিকায় (বর্ষ ২ সংখ্যা ১) ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন—ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভগীরথ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব্যসাচী এস. আর. রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক, পদ্মশ্রী দ্বারা সম্মানিত ও পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত এই ব্যক্তি তাঁর সমস্ত জীবন ও সঞ্চিত অর্থ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন, রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ব্যয় করেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও অজস্র প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত তাঁর প্রবন্ধটি ১৯৫৬ সালে জুলাই মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

সতীশচন্দ্র গুহ-ঠাকুর—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বদেশ-প্রেমিক ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী নেতৃবর্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত

ছিলেন। বিদ্যাচর্চা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁর জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনকালে শিক্ষকতা বৃত্তি ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল দ্বারভাঙ্গা ষ্টেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ ও শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের সংগ্রহ সচিবরূপে কাজ করেন। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য ও ধ্যানধারণার উপযোগিতা অনুসারে তিনিই প্রথম "ওরিয়েন্টাল ক্লাসিফিকেশন" বা "প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি" ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম বর্গীকরণ পদ্ধতি। তাঁর ছদ্মনাম সেহঙ্গল, স চ. ঠাকুর। "পুস্তকের জাত বিচার" তাঁর লেখা একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ ; গান্ধী কীর্তন, গ্রন্থাগমন ক্রমনিক (হিন্দী) ও Gandhi Mahatmya।

"গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কলাকৌশল" প্রবন্ধটি ১৩৩৫ সালে ১৪ই পৌষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা। এটি ১৩৩৮ সালে "প্রবাসী" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সহ-সভাপতি ও প্রখ্যাত লেখিকা সরলা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত "বালক" পত্রিকা "ভারতী" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৩০২ সালে হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী তৎকালীন প্রসিদ্ধ "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ভার গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া উর্দু পত্রিকা "হিন্দুস্থান"-এরও সম্পাদক ছিলেন ও এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত "শতগান", "নববর্ষের স্বপ্ন", "জীবনের ঝরাপাতা" প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সভানেত্রীর অভিভাষণ। "ভারতী" পত্রিকায় ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত।

সুকুমার রায়—প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা "মুকুল" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থায় তাঁর 'ননসেন্স ক্লাব' সৃষ্টি হয়। ক্লাবের মুখপত্র ছিল "সাড়ে বত্রিশ ভাজা"। ১৯১১ খ্রী-এ ফোটোগ্রাফী ও প্রিন্টিং টেকনোলজীতে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ" লাভ করে ইংলণ্ডে যান। তাঁর রচনাবলীকে কাব্য,

নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ বিভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি আবোল তাবোল, খাই খাই, পাগলা দাশু প্রভৃতি শিশু সাহিত্যকে নব রূপে সৃষ্টি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তি ও রসিক মনের অপরূপ ভাষায় লেখা রচনার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিগুলি অতুলনীয়। তিনি শিশুদের মাসিক পত্রিকা "সন্দেশ"-এর সম্পাদক ছিলেন।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধটি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে "সন্দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুশীলকুমার ঘোষ—বাংলাদেশে যে তিন মশালধারী সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথকে সর্বপ্রথম আলোকিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল সুশীলকুমার ঘোষ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব ছিলেন তিনি। যাঁদের সযত্ন সেবা ও নিরবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব বাংলাদেশের গ্রন্থাগার শ্রী ও শক্তি লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে সুশীলকুমার ঘোষ ছিল একজন। গ্রন্থাগার বিষয়ে বাংলায় তিনি প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জিত এই নিরভিমান ও নিরলস সমাজ কর্মীর আজীবন কালের একমাত্র স্বপ্ন ছিল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজবোধের বিস্তার। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবাণী' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে তিনি শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লেখা সংগৃহীত প্রবন্ধটি "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুশীলকুমার বসু—ব্যক্তিগত জীবনে লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। "সাপ্তাহিক প্রভাতি"র সম্পাদক প্রথম জীবনে অসহযোগ আন্দোলন ও যুগান্তর আন্দোলন এবং পরে যশোর জেলায় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "বিচিত্রা" পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগ "দেশের কথা"র লেখক ছিলেন তিনি।

১৩৩৯ সনে শ্রাবণ সংখ্যায় "বিচিত্রা" পত্রিকায় এই গ্রন্থে নির্বাচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সৈয়দ মুজতবা আলি—বাঙলা, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, আরবী প্রভৃতি ১৫টি ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ছদ্মনাম "সত্যপীর" ও "টেকচাঁদ",। বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা, সরস, মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার অধিকারী এই লেখক চাকুরি ও লেখাপড়ার সূত্রে পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। পঞ্চতন্ত্র "দেশ" পত্রিকায় পঞ্চাশের দশকে প্রথম প্রকাশিত ও পরে গ্রন্থাকারে পাঠক সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ।

স্বপনবুড়ো—শিশু সাহিত্যিক স্বপনবুড়োর আসল নাম অখিলবন্ধু নিয়োগী। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বপনবুড়ো ছিলেন সব্যসাচী লেখক। ছোটদের জন্য তিনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, হাসির কবিতা ও ছড়া, নাটিকা, গান, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। ১৯৪৫ সালে দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এ 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগের পরিচালক রূপে যোগদান করেছিলেন "স্বপনবুড়ো" নামে। সেই থেকেই এই নামেই ছোটদের কাছে তিনি পরিচিত। যদিও গ্রামাফোন রেকর্ডে গান রচনা করতে গিয়ে রেকর্ডেই তিনি সর্বপ্রথম "স্বপনবুড়ো" নামটি ব্যবহার করেন। শিশু সাহিত্য পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিকের আর একটি অনবদ্য অবদান 'সব পেয়েছির আসর'।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৩৬৮ সালে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাগারপ্রেমী স্বপন-বুড়ো হাওড়ার বাঁ্যাটরায় অনুষ্ঠিত ১৯৭৯ সালে ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে "শিশু গ্রন্থাগার" অধিবেশনের পরিচালক ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বলে তিনি পূজিত হয়। তিনি সংস্কার ও আচারের বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে নতুন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্য-ভাষার তিনি অন্যতম প্রধান প্রচারক। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণের শিক্ষা প্রচারের জন্য বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি।

এই প্রবন্ধটি 'ভক্তি রহস্য, প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

হরিহর শেঠ—একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক, ইতিহাসবেত্তা ও গ্রন্থাগার প্রেমিক রূপে তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী সমাজসেবামূলক কাজ ও 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'ভারতী', 'বিচিত্রা, 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। ফরাসী সরকার বিভিন্ন সময়ে উচ্চ উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। ফরাসী সরকার প্রবর্তিত স্বাধীন শহর চন্দননগরে তিনিই ছিলেন প্রথম সভাপতি। তাঁর রচিত 'মুক্তি সংগ্রামে চন্দননগর', 'প্রতিভা', 'স্রোতের ঢেউ', 'অমৃতে গরল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যমনস্কতার পরিচয় দেয়। তাঁর রচিত 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' নামে গ্রন্থটি মহানগরী কলিকাতার ইতিহাস রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ বলে গণ্য হয়। 'চন্দননগর পরিচয়' গ্রন্থটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর ব্যক্তিগত অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহরাজী তিনি চন্দননগর পুস্তকাগার ও চন্দননগর সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারে দান করে গেছেন। শিক্ষাজগতে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা আজও হুগলী জেলার লোক সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত "গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৪১ সালে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এইটি ১৯৩৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধু হাইস্কুল, চুঁচুড়া বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।